পুরোহিত দর্পণ

শংকর

ক্লাসিক প্রেস

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক

নারায়ণ সেনগুপ্ত,

৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ

গণেশ বসু

মুদ্রাকর

শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার,

শ্রীগোপাল প্রেস,

১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৪

উৎসর্গ

আমার পাঁচ ভ্রাতৃবধূ
ও দুই ভগ্নীর জন্যে
এই সাতটি গল্প
উপহার দেওয়া গেল :
রমা মুখোপাধ্যায়
আর্যশ্রী মুখোপাধ্যায়
রেশমী মুখোপাধ্যায়
চন্দনা মুখোপাধ্যায়
নূপুর মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়
ও
প্রয়াতা বাসন্তী চক্রবর্তী

শংকর

লেখকের নিবেদন

সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে লিখতে লিখতে অনেক গল্পই তো লেখা হয়ে গেল। বাংলার গল্প যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরা বলেন, বাঙালি লেখকের কলমে গল্পটা সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। যাঁরা নিন্দে করেন, তাঁদের মতামত, বাঙালি লেখকদের দম কম, উপন্যাস-রচনার ম্যারাথন দৌড় তাঁদের তেমন সহ্য হয় না।

গল্পের প্রাচুর্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বিশ্বশ্রেণীর গল্পও অনেকসময় বাঙালি পাঠকের নজর এড়িয়ে গিয়েছে, এমন দুঃখ প্রয়াত কয়েকজন লেখকের মুখেও শুনেছি।

এক এক সময় মনে হয়, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ—একই ভাষায় একই সময়ে এতগুলি সার্থক স্রষ্টাকে কথাসাহিত্যের আঙিনায় একত্র পাওয়া যেকোনো ভাষার পক্ষে এক দুর্লভ ঘটনা। সমসাময়িককালে ব্যাপারটা বহুজনের নজরে না পড়লেও এখন যে গৌরবটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার প্রমাণ, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা গল্পের সাম্প্রতিক পুনর্মূল্যায়ন ও ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা।

এতদিন নিজের গল্প নিজে নির্বাচন করার দুঃসাহস হয়নি, ভেবেছি নিজের ব্যালট বক্সে নিজে ভোট দেওয়াটা ভাল নয়। কিন্তু সম্প্রতি অনেকের অভিযোগ, বাঁশবনে কোনো ডোম আজকাল কানা হতে চাইছেন না! এই সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান খুঁজে বার করতে অক্ষম হয়ে নতুন যুগের পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে নিজের সাতটা গল্পকে নিজেই ভোট দিতে বাধ্য হলাম।

এই নির্বাচন নতুন পাঠকদের সময় বাঁচালে এবং তাঁদের প্রশ্রয় পেলে, আরও কয়েকটা গল্পকে পরের বারের নির্বাচনে দাঁড় করানো যাবে।

শংকর

সূচিপত্র

পুরোহিত দর্পণ	১১
বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত	৪১
বাল্মীকি কেন মহাভারত লিখতে রাজি হলেন না	৭১
আজব আবিষ্কার	৯৫
আজব স্টেথো	১৫৩
আজব আপ্যায়ন	২০৯
আজব টিকিট	২৫৩

পুরোহিত দর্

পুরোহিত দর্পণ

যেন শেয়ালদা স্টেশনের ফুটপাথে কোলে-বাজারের বাসি শুকনো বেগুন। হরকিঙ্কর ভটচায্যির চেহারাটা দেখলে সপ্তাহখানেকের শুকনো বেগুনের কথাই মনে পড়ে। বাইরের চামড়াটা কুঁকড়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে ভেতরের মাংসও যেন রোদে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে রয়েছে। সরু লম্বা নাকটা যেন একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন! রঙটা এককালে বেশ ফর্সা ছিল, দেখলেই বোঝা যায়—এখনও খানিকটা আছে। চোখ দুটোও বেশ বড়ো বড়ো কিন্তু এখন ঝিমিয়ে পড়েছে—যেন একশো পাওয়ারের লাইট থেকে পঁচিশ পাওয়ারের আলো বেরোচ্ছে।

খালি গায়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে হরকিঙ্কর নিজের পৈতেটা দুহাতে ধরে পিঠ চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় ডাকপিওনকে দেখে বললেন, 'হরকিঙ্কর ভটচায্যির নামে কিছু আছে নাকি?'

পিয়ন বললে, 'কোনো চিঠি নেই।'

'হরকিঙ্কর দেবশর্মাও লেখা থাকতে পারে।'

'চিঠি থাকলে কেন দেব না বলুন?'

'ওইরকম তো তোমরা বলো বাপু, অথচ লোকের চিঠি তো হারাচ্ছেও। সেবার আমার যজমানের চিঠি তোমরাই তো দেরি করে দিলে। চিঠি যখন এসে পৌঁছল তখন রমেশ ঘোষালের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে যে ব্রাহ্মণের কী ক্ষতি হয়, তা তোমরা বুঝবে কী

করে?'

পিওন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের বিশ্বাস না হয়, পি-এম-জিকে কমপ্লেন করুন।'

কথা আরও বাড়তো। কিন্তু দূর থেকে হরকিঙ্করের মেয়ে সুব্রতাকে দেখা গেল। সুব্রতা সকালে সরকারি দুধের দোকানে কাজ করে। সেখান থেকেই ফিরছিল। পিওনকে সে-ই সরিয়ে দিল। তারপর বাবাকে বললে, 'আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।'

হরকিঙ্কর গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, 'শুধু শুধু কি আর ব্যস্ত হচ্ছি মা। নাকতলার সুদর্শন রায় কি সত্যিই এবার দুর্গা পুজো করবে না? কিন্তু কী করে তা হয়? সুদর্শনদের পুজো কি আজকের? আমার ঠাকুর্দা ওদের বাড়িতে মায়ের অর্চনা করেছেন, আমার বাবা করেছেন, আমিও করে আসছি এই এত বছর। পাকিস্তান হবার পরও তো ওদের কাজ বন্ধ হয়নি। মাকে ওরা যশোর থেকে সোজা নাকতলায় এনেছে! ঈশ্বরের আশীর্বাদে সর্বস্ব যায়নি ওদের। এখানেও তো ক'বছর পুজো করলাম আমি। এবারই বা পুজো হবে না কেন? নিশ্চয় চিঠি হারিয়েছে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'স্বীকার করলাম, প্রথম চিঠিটা না হয় গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি যে জোড়া পোস্টকার্ড ছাড়লাম, তার উত্তর?'

সুব্রতার মুখটা এবার সত্যিই মলিন হয়ে উঠলো। 'কেন বাবা, সে-উত্তর তো কালই এসে গিয়েছে।'

'কালই এসেছে? আর আমি পিওনের সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি!'—হরকিঙ্কর রেগে উঠলেন।

'আপনি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন,' সুব্রতা উত্তর

দিলে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হরকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইলেন। সুদর্শন রায়রা এবার থেকে পুজো বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পুজোটাকে বাজে খরচ মনে করছে। হরকিঙ্কর মুখ বিকৃতি করে বললেন, 'সনাতন ধর্মের কিছুই আর থাকবে না।'

সুব্রতা বললে, 'বাবা, চা খাবেন তো? জল চাপাই?'

হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ভালই হয়েছে—আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওদের বড়ো ছেলেটা কোথাকার এক বদ্যির মেয়ে বিয়ে করেছে। বাউনের ঘরে যত অনাসৃষ্টি। সে-বাড়িতে পুজো করে নিজের অমঙ্গল ডেকে না আনাই ভাল।'

সুব্রতা চা নিয়ে এলো। হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ওদের কর্তা কিন্তু জানতো কেমন করে দেব-দ্বিজের সেবা করতে হয়। ওদের দেওয়া গামছাগুলোর সাইজ দেখেছিস! অন্য লোকেরা আজকাল যে গামছা দেয়, তা দিয়ে রুমালের কাজও হয় না। নামই হয়ে গিয়েছে—পুজোর গামছা!'

মেয়ে বললে, 'বাবা, চা খান।'

বাবা বললেন, 'এ-যুগে আর পুরোহিতের কাজ চলবে বলে মনে হয় না। লোকে ভাবে আমরা একটা নুইসেন্স। আমরা কিছু না করেই পয়সা আদায় করি, ভিখিরীর ভদ্র-সংস্করণ।'

মেয়ে বললে, 'বাবা, নবারুণ স্পোর্টিং খুব জাঁকিয়ে পুজো করছে এবার। ওদের সেক্রেটারি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। আজও বলছিলেন আপনার কথা।'

'কী বললি?' হরকিঙ্কর এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যেন কেউ ভারী বুটজুতোসমেত পা তাঁর পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

'বারোয়ারি পুজো করতে হবে আমাকে এই বয়সে? কোনোদিন হয়তো কেউ বলবে...' পরের কথাগুলো হরকিঙ্কর মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হয়তো কোনোদিন আমাকে বেশ্যাবাড়িতে শীতলা পুজো করে আসবার কথাও বলবে।'

মেয়ে বললে, 'সেক্রেটারি বলছিলেন, নবারুণ স্পোর্টিং-এর পুজো করবার জন্যে পুরুতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।'

'ভাগাড়ের মড়ার জন্যেও কাড়াকাড়ি হয়। বারওয়ারি পুজোর পত্তন করেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। ও-সব জায়গায় পুরুত না এলেও কেউ খোঁজ করে না ; একটা পুরুতই তিনটে বারোয়ারি পুজো সারে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'মা মহামায়ার পুজো বলে কথা। তাঁকে তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন। দেবী দশভুজা মহিষাসুর নিধন করে দেবগণকে স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুজোর ত্রুটি হলে তাঁর রোষ থেকে কে আমাকে রক্ষে করবে?'

মেয়ে আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। হরকিঙ্কর বললেন, 'একবার মোড়ের বাসনের দোকানে যাবো। যদি কয়েকটা দানের সামগ্রী বিক্রি করতে পারি। বেটা দিনদুপুরে চৌরাস্তার মোড়ে বসে গলা কাটে। অমন সুন্দর পিতলের চাদরের ঘড়া, ছাঁকা কাঁসার থালা বলে কিনা আড়াই টাকার বেশি দেবে না। কিছুদিন ধরে রাখলে দাম উঠতো। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়?'

সুব্রতা বললে, 'দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবেন না বাবা। জানেনই তো ওরা চোর।'

হরকিঙ্কর ভাবলেন, 'সবই ভাগ্য। মায়ের ইচ্ছা—না হলে সনাতন ধর্মের এমন সর্বনাশ হবে কেন? কেন আমাদের নিজের দেশঘর ছেড়ে এই বিদেশের বস্তিতে এসে উঠতে হবে?'

হরকিঙ্কর বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা গেল, 'সুব্রতা ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা?'

সুব্রতা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। 'আরে শুভ্রাদি! আপনি? এখানে?'

'কেন, আসতে নেই?' শুভ্রাদি হেসে বললেন।

শুভ্রাদিকে বাবার কাছে নিয়ে এসে সুব্রতা পরিচয় করিয়ে দিলে, 'বাবা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপিকা শুভ্রা রায়। ইনিই আমাকে কলেজে ফ্রীশিপ পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'ও!' নমস্কার করলেন হরকিঙ্কর। মেয়ে ততক্ষণ অতিথির দিকে একটা আসন এগিয়ে দিয়েছে। শুভ্রাদির বয়স বেশি নয়। খোঁজ করলে ওই বয়সের মেয়ে কলেজেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুভ্রাদির মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে যে, মনে হয় আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। ওঁর মুখের সঙ্গে হরকিঙ্কর নিজের মেয়ের মুখটাও মিলিয়ে নিলেন। অভাবে অযত্নে থাকলেও তাঁর মেয়ের রঙটা অনেক ফর্সা, দৈর্ঘ্যেও কয়েক ইঞ্চি বেশি হবে। এত অনটনের মধ্যে বাড়ন্ত গড়ন—দেখে কে বলবে এখনও সতেরো পুরো হয়নি!

বেশ বিব্রত হয়েই হরকিঙ্কর সুবেশা শুভ্রাদিকে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটু বসতে দেবার জায়গাও নেই।'

'কী ব্যাপার, শুভ্রাদি?'

'ব্যাপার তোমার বাবার সঙ্গে। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকি তাই প্রিন্সিপ্যাল বললেন তুমি নিজেই দেখা করে এসো।'

'কেন বলুন তো?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কলেজে এবার আমরা দুর্গাপুজো করবো ঠিক করেছে।'—শুভ্রাদি জানালেন।

'কলেজে দুর্গাপুজো, তাও কিনা মেয়ে কলেজে!' হরকিঙ্কর তাঁর বিস্ময় চেপে রাখবার কোনো চেষ্টা করলেন না।

শুভ্রা রায় স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। সুব্রতা লক্ষ্য করছিল, কি সুন্দর ব্যবহার শুভ্রাদির। শুনেছে খুব বড়োলোকের মেয়ে, অথচ কেমন ভাবে কথা বলেন। শুভ্রাদি বললেন, 'অনেকেই কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন। পরিকল্পনাটা আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সুভদ্রা হালদারের। ওঁর ধারণা দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের শক্তিপুজোর দরকার হয়ে পড়েছে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা!'

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের মধ্যে যারা একটু তথাকথিত মডার্ন তারা খুব আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে মেয়েরা পুজো-মাইন্ডেড হোক—তারা পুজোর কাজকর্ম শিখুক। শেলি বায়রন কীটস পড়ে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না।'

হরকিঙ্কর জানতে চাইলেন, 'আগে কখনও এমন পুজো হয়েছে?'

শুভ্রাদি জানালেন, 'সুভদ্রা হালদার বলেছেন, আগে কী হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। জিনিসটা যখন ভাল, তখন করতে বাধা কোথায়? মহিষমর্দিনী পুরুষমানুষ ছিলেন না। সুতরাং মেয়েরা ইচ্ছে করলেই নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'পুজোর তো আর দেরি নেই!'

শুভ্রাদি বললেন, 'ঠিক বলেছেন, মোটেই সময় নেই। অনেকে

ভয় পাচ্ছিল, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব হয়ে উঠবে না। কিন্তু মিসেস হালদার বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে তাঁর নিজেরই বিয়ে হয়েছিল!'

সুব্রতা যা ভয় পাচ্ছিল এবার তাই হলো। হরকিঙ্কর দ্বিধা না করে শুভ্রাদির মুখের উপরই বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বারোয়ারি পুজোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। হাজারজন যেখানে মাতব্বর—পুজোর নাম করে যেখানে কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা আর বেলেল্লাপনা হয়—না খেয়ে মারা গেলেও আমি সেখানে পুজো করবো না।'

সুব্রতা বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহস করলে না।

শুভ্রাদি কিন্তু মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, 'মিসেস হালদার আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। উনিও চান শুদ্ধ পূজা—যেখানে ধর্মীয় ভাবটা বজায় থাকবে। মাইক, আলোকসজ্জা, প্যাণ্ডাল, প্রসেশন এসব আমরা কিছুই করবো না। আমাদের প্রতিমাও শাস্ত্রসম্মত।'

'ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মুখের আদলওয়ালা আলট্রামডার্ন ফিগার চাইছেন না আপনারা?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

চিত্রতারকার কথা উঠতেই সুব্রতা কেমন চমকে উঠেছিল। কিন্তু এঁদের দুজনের কেউই তা লক্ষ্য করলেন না।

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে, সনাতন আদর্শে পুজো হোক—তবেই তো মেয়েদের মঙ্গল হবে। আমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছি। মেয়েরাই সব কিছু করছি। আমাদের সকলের অনুরোধ, পুজোটা করুন। মিসেস হালদার আপনার কথা

শুনেছেন কোথাও। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে একবার সময়মতো দেখা করেন।'

হরকিঙ্কর নিজের মনকে বোঝালেন, কলেজের মেয়েদের পুজোকে বারোয়ারি পুজো বলা চলে না। শুভ্রাদিকে বললেন, 'আপনি আমার মেয়েটাকে সাহায্য করছেন অনেক, কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিন-পুরুষ ধরে আমরা রায়েদের বাড়িতেই পুজো করে এসেছি। আর কোথাও কখনও বোধন করিনি। এবার করে দেখি, মা কী বলেন। আমি আজই কলেজ যাবো'খন!'

হরকিঙ্কর শুভ্রাদিকে বসিয়ে এবার উঠে পড়লেন, বাসনওয়ালার সঙ্গে এখনই দেখা করা প্রয়োজন। বেরোবার আগে মেয়েকে বললেন, 'দিদিমণি তোমার বাড়িতে এসেছেন, একটু চা অন্তত করে দাও।'

শুভ্রাদি এবার হতশ্রী ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। 'ছাদটা ফেটে রয়েছে দেখছি। জল পড়ে?'

'জলে ভেসে যায়।' সুব্রতা উত্তর দিলে।

'কলেজ যাও না কেন?'

'অনেক দিন যাচ্ছি না। কাউকে যেন বলবেন না, শুভ্রাদি। তাহলে সকালে দুধের চাকরিটাও যাবে। স্টুডেন্ট ছাড়া গভর্নমেন্ট কাউকে রাখে না।'

ঘরের অবস্থা এবং সুব্রতার মুখ চোখ দেখে শুভ্রাদি যেন সব বুঝতে পারছেন।

লজ্জা পেয়েছে সুব্রতা। বললে, 'বাবার কথায় রাগ করবেন না, শুভ্রাদি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ওঁকে একগুঁয়ে বলতে পারেন। ওখানে কোনোরকম শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। তাই কষ্টও পাচ্ছেন।'

'কেন?'

'অনাচার হলে যজমানের মুখের উপর যা-তা বলেন। তাতে যজমান সন্তুষ্ট থাকবে কেন? পাড়ার কিছু পুরুতের অভাব নেই। তাছাড়া আমরা বাইরের লোক, পাকিস্তানে ভিটেমাটি হারিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়েছি। স্থানীয় যজমানরা নিজেদের লোক ছেড়ে কেনই বা বাবাকে ডাকবে?'

শুভ্রাদি চুপ করে ওর কথা শুনে যেতে লাগলেন। 'বাবাকে বলি, আপনি তো লেখাপড়া জানতেন, কেন এই বাজে লাইনে এলেন। বাবা বলেন, ওঁদের পরিবারের অন্তত একটি ছেলেকে এই লাইনে আসতে হবে এই নিয়ম ছিল। তাছাড়া ওঁদের যৌবনকালে পুরোহিতের সম্মানও ছিল।'

'তোমার কে কে আছেন?' শুভ্রাদি প্রশ্ন করলেন।

'এক দাদা, বাইরে চাকরি করেন। মা নেই। এখন আমিই সংসার দেখছি।'

'তুমি কলেজ বন্ধ করলে কেন? বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি?'

সুব্রতা কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাসলো।

'আচ্ছা, এবার আসি। পুজোর ক'দিন কলেজে যেও,' বলে শুভ্রাদি বিদায় নিলেন।

সুব্রতার হাসি থেকে শুভ্রাদি কী বুঝলেন কে জানে। সুব্রতা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকলো! বিয়ে! বিয়েই বটে! ধানবাদে চাকুরে দাদা। তাই বটে গতমাস থেকে টাকা আসছে না। দাদা নাকি ওখানে কি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে রেল কলোনির কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে, ধন্য পুরুষ জাত। কি দায়িত্ববোধ! একশ টাকা মাইনের রেলবাবুর আবার প্রেম।

বাবা যতই গলা ফাটিয়ে ধর্মের জয়গান করুন, টাকা—টাকাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। বেঁচে থাকতে গেলে টাকা চাই-ই।

ড্যাল্টন কোম্পানি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি মিস্টার চ্যাটার্জি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। তিনিই সেবারে বলেছিলেন—'আপনার গলার স্বরটা খুব সুইট।'

বিরক্ত কণ্ঠে সুব্রতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক মোটেই বিব্রত না হয়ে বলেছিলেন, 'অভিনয়ের লাইনে এলে উন্নতি করতে পারতেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় অফিসে অফিসে খুব চাহিদা। আমরা হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের পার্ট করছিল কমলিনী। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে অথচ অভিনয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, স্টেজের জন্যে বুকিংও করা রয়েছে। এখন পেছোবার উপায় নেই। আসুন না। টাকা পাবেন। মেডেলও পেতে পারেন। একবার নাম হলে তখন দেখবেন বাড়িতে লোক এসে সাধাসাধি করছে।'

সুব্রতা রাজি হয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে কয়েকদিন রিহার্সাল দিয়ে এসেছে। তারপর অভিনয়ও। মেডেল পায়নি, কিন্তু টাকা পেয়েছে ষাটটা। কাজে লেগে গিয়েছে টাকাগুলো। সুব্রতা প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের অফিসে একটা চাকরি পাওয়া যায় না?'

'মেমসাহেব ছাড়া এরা রাখে না। তাছাড়া, কোন্ দুঃখে আপনি চাকরি করতে যাবেন? এ লাইনে চাকরির দশগুণ রোজগার করবেন। আর যদি একবার কোনো সিনেমা প্রোডিউসারের নজরে পড়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই!'

কথাটা মন্দ বলেননি ভদ্রলোক। একবার নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মিস্টার চ্যাটার্জির এক বন্ধু স্টুডিওর অ্যাসিস্ট্যান্ট

ক্যামেরাম্যান। তার সঙ্গে দেখাও করেছে সুব্রতা।

সে বলেছে, 'ফিগার খুব শার্প, ক্যামেরায় খুব ভাল আসবে। নায়িকা হবার সমস্ত গুণই রয়েছে আপনার। এ-লাইনে কোনো চাঁইকে ধরবার চেষ্টা করুন। ওই প্রথমবারই যা একটু ধরা-করা প্রয়োজন। তারপর যদি তেমন লাক ফেবার করে, সেই একই লোক আবার বাড়িতে গিয়ে শুটিং ডেটের জন্যে কান্নাকাটি করবে।'

লোকে হয়তো যা-তা বলতে চাইবে। কিন্তু কিছু তোয়াক্কা করে না সুব্রতা। নিজের ভবিষ্যতের জন্যে তার যা খুশি সে করবে। টাকা যখন কেউ দেবে না, তখন কারুর কথাতেই সে কান দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিতান্তই ভাল মানুষ, একমাত্র বাবাকে নিয়েই চিন্তা। এত শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নিয়েও অন্নের সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। বাবা না বুঝেই বাধা দেবেন। ওঁকে এখন কিছু না-বলাই ভাল। তবে যখন সুব্রতার অনেক টাকা হবে, সে তখন বাবাকে একটা সুন্দর মন্দির করে দেবে। সেখানে নিজের মনে নিজের ঠাকুরকে পুজো করবেন। যজমানদের দরজায় দরজায় তখন তাঁকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

ভেবেছিল, শুভ্রাদিকে সে সব বলবে। কিন্তু বলা হয়নি কিছুই। বোধহয় ভালই হয়েছে। এখন নয়। যখন সুব্রতা ভট্টাচার্য দেশজোড়া সুনাম পাবে, সবার মুখে মুখে যখন তার নাম ফিরবে, তখন সব প্রকাশ করবে। কাগজের প্রতিনিধিরা যখন তার জীবনী লিখতে আসবে, সুব্রতা তখন শুভ্রাদির মহৎ হৃদয়ের কথাও বলবে। তাঁর জন্যেই যে বিনা মাইনেতে কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সে কথা গোপন করবে না।

তাকের ওপর টাইমপীসটার দিকে এবার নজর পড়ে গেল। বসে

বসে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই একবার বেরনো প্রয়োজন।

আর তো ভাবা চলবে না। এখনই সুযোগের সন্ধানে বেরোতে হবে।

বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে পুজোর আয়োজন চলেছে।

হরকিঙ্কর গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রমতো সব যোগাড়-যন্তর না করলে, শুধু আপনাদের নয় আমারও অমঙ্গ ল। দুর্গাপুজো বলে কথা। অনেক জিনিস লাগে—সিঁদুর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাঠা, তীর, পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, ডালিম ডাল, অশোক ডাল...'

তালিকা আরও দীর্ঘ হতো. কিন্তু শুভ্রা বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা সব গুছিয়ে যোগাড় করে রাখবো। আপনি শুধু পুরো ফর্দটা আমাকে দিয়ে যান।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'তুমি মা বোধহয় কখনও পুজোর যোগাড় করোনি।'

শুভ্রা সলজ্জ ভাবে বললেন, 'শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বাড়িতে পুজো হতো। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। এবার কিন্তু আপনার কাছে সব শিখে নেবো।'

হরকিঙ্কর অনেকদিন এমন মধুর ব্যবহার পাননি। অন্তত পাঁচভূতের রাজত্বে এমন নিষ্ঠাবতীর সন্ধান পাবেন আশাই করেননি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই মা, এবার আমি সব শিখিয়ে দেবো। আমাদের মায়েদের জন্যই তো সনাতন ধর্ম আজও

কোনোরকমে টিকে আছে। লেখাপড়া জানা মায়েরা যদি আবার আগ্রহ নিয়ে সব শিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কীসের ভয়?'

শুভ্রা নম্রভাবে বললেন, 'নিজের দেশের নিজের ধর্মের নিয়মকানুন জানবো না, এটা তো গর্বের কথা নয়। এর মধ্যেই তো আমাদের দেশের সভ্যতার এবং সমাজের যুগ-যুগান্তের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।'

'কিন্তু সে কথা কে বোঝে মা? বারোয়ারি পুজো আমি করি না; লোকে বলে গোঁড়া পুরুত ; কেউ কেউ পাগলও বলে। কিন্তু মা ওখানে পুজোর প-ও থাকে না। কেউ জিজ্ঞেস করে না পুজোর সব উপকরণ ফর্দ অনুযায়ী এলো কি না। যদি কোনো কিছু না থাকে, বলবে যা এসেছে তাই দিয়ে সেরে নাও। কিন্তু মা, সেরে নেবার মালিক কি পুরোহিত? তার পিতৃপুরুষেরও জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে এ-সব কাগজে-কলমে লেখা হয়ে গিয়েছে।'

শুভ্রা বললেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, যদি পুজো করতে হয় ভালভাবে করো, না হলে কোরো না।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'ফর্দ আমার মুখস্থ। বলে যাচ্ছি, টপাটপ লিখে নিন। প্রথমে নবপত্রিকার দ্রব্যাদি, নিয়ম হচ্ছে প্রতিপদ থেকে দেওয়া। প্রথম দিন—মাথাঘসা, ফুলের তেল, আতর, চিরুনি, গোলাপজল। দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধবার পটি, তৃতীয়াতে তর্পণ, সিঁদুর আলতা। চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাঁসার বাটি, তিল, চন্দন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার।'

হরকিঙ্কর একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'বরং পুজোর ফর্দটাই আগে লিখুন—বোধনের দ্রব্যাদি...'

আমন্ত্রণের জিনিস, অধিবাসের ডালার তালিকা শেষ করে হরকিঙ্কর সপ্তমী পুজোর ফর্দ শুরু করলেন—'নারায়ণবরণ, গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, ব্রহ্মাবরণ, সদস্যবরণ, হোতৃবরণ আচার্যবরণ, বরণাঙ্গুরীয়, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা...'

ছাত্রীজীবনে শুভ্রা অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। কিন্তু পুরুতমশায়ের গতির কাছে তাঁকে হার মানতে হলো।

হরকিঙ্কর হেসে ফেললেন। বললেন, 'দরকার নেই ; আমিই লিখে দিচ্ছি মা। অনেকে লিস্টিও নেয় না, দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে সোজা গিয়ে সাপ ব্যাঙ যা পায় তাই কিনে নিয়ে আসে। আগেকার সে সব দশকর্মা ভাণ্ডারও নেই—বেশির ভাগই জোচ্চোর। যা-তা জিনিস দিয়ে দেয়।'

শুভ্রা এবার হরকিঙ্করের দিকে কাগজ এগিয়ে দিলেন। ফর্দ লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'যে কোনো ফর্দের প্রথমে লিখতে হয়—সিদ্ধি ; সিদ্ধিদাতা গণেশ তবেই তো সিদ্ধি দেবেন।'

শুভ্রা পণ্ডিতমশায়ের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মহাস্নানের জিনিসগুলো একটু সাবধানে যোগাড় করতে বলবেন মা। দোকানে যা দেয় তা প্রায়ই ভেজাল।'

'শুভ্রা, কাজ কেমন এগোচ্ছে?' সুভদ্রা হালদার প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভাল। পুরুতমশাইটি চমৎকার—একটু রাগী বটে, কিন্তু নিষ্ঠাবান।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আজকাল খুবই অভাব। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমাদের কাছে আজকাল

পুরুতঠাকুরও যা, রাঁধুনীঠাকুরও তাই।'

কলেজের সর্বত্র এখন পুজো পুজো ভাব। বেশ হৈ চৈ চলেছে। কাজের বাড়ির চাপে প্রিন্সিপ্যালও তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যের মুখোশটা খুলে রেখেছেন। সেই সুযোগ নিয়েই টিচারস্-রুমে অর্থনীতির অধ্যাপিকা শিপ্রা মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'একথা বলছেন কেন মিসেস হালদার?'

'জানি বলেই বলছি। আমাদেরও বলতে গেলে পুরোহিতের বংশ। কিন্তু আয় নেই বলে কেউ আর ও লাইনে যায়নি। আজকাল যার লেখাপড়া হয় না সে-ই যাজক হচ্ছে—কিন্তু শিক্ষিত না হলে, সে কী করে শাস্ত্র পাঠ করবে?'

প্রিন্সিপ্যালের কথায় অনেক অধ্যাপিকা সায় দিলেন। মিসেস হালদার বললেন, 'এ যুগে মুড়ি মিছরির একদর—একটাই দুঃখ। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একখানা সুরেন ভট্‌চায্যির পুরোহিত দর্পণ ছিল। তাতে দেখেছি তিনি দুঃখ করছেন, সূপকার ষষ্ঠীপুজো করলে যা পাবে, একজন জ্ঞানী পুরুষও সেই পাবে। এই জন্যেই ভাল লোক ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে।'

'সূপকার মানে কি, দিদিমণি?' স্বেচ্ছাসেবিকাদের লিডার ও ছাত্রী ইউনিয়নের সেক্রেটারি রমলা প্রশ্ন করলো।

সুভদ্রাদি বললেন, 'শুভ্রা, আজকাল তোমরা কি যে বাংলা শেখাচ্ছো। আমাদের সময় বাংলার কোশ্চেনও ইংরিজিতে হতো—তবু আমরা অনেক কথা জানতাম। এখন তোমরা শুধু নাটক নভেল পড়াচ্ছ—তাও আধুনিক। তাই ছাত্রীরা সূপকার মানে জানে না।'

দিদিমণির কথায় রমলা লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রা হালদার

বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই। না-জেনে পণ্ডিত সেজে থাকার চেয়ে, বোকার মতো প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অনেক ভাল। সূপকার মানে রাঁধুনি—আজকাল নভেলে যাদের বাবুর্চি বলে!'

অধ্যাপিকাদের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা হালদার বললেন, 'আপনারা অনেকে হয়তো এইভাবে পুজোর ব্যবস্থা করায় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন—ভাবছেন আমি সময় এবং অর্থ অপব্যয় করেছি। কিন্তু একটা দুর্গাপুজো হাতে কলমে করলে, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মেয়েরা যে জ্ঞান লাভ করবে, তা দেড় ডজন টেক্‌স্টবুক থেকেও পাবে না।'

একবার ঢোক গিলে তিনি বললেন. 'কত অদ্ভুত সব জিনিস লাগে, আমি পুরুত-বাড়ির মেয়ে হয়েও খোঁজ রাখতাম না। যদি চোখ কান খুলে রেখে, ওগুলোর মধ্যে একটু ঢোকা যায়, তাহলে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের জীবন-যাপন সম্বন্ধে আমরা কত কি জানতে পারি।'

সুভদ্রাদি বললেন, 'এই মহাস্নানের কথাই ধরুন না কেন। সপ্তমীর দিনে দর্পণ স্নান—শুভ্রা, তোমার হাতেই তো লিস্ট রয়েছে, পড়ো না।'

শুভ্রা পড়তে লাগলেন, 'শোধিত পঞ্চগব্য—অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। শিশির, আখের রস, সাগরোদক, গজদন্ত মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা,—' এবার হঠাৎ শুভ্রা থমকে দাঁড়ালেন।

'কী, থামলে কেন? পড়ে যাও,' সুভদ্রাদি বললেন।

কিন্তু শুভ্রা আর পড়তে পারছেন না। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

'কী হলো?' বলে শিপ্রা মিত্র এবার একটু সরে এসে তালিকার দিকে তাকালেন। তাঁরও মুখটা যেন কেমন অপ্রস্তুত দেখালো। 'কী আছে, শিপ্রাদি?' দু'জন ছাত্রী একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

'না, কিছু নয়, ও-নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' শিপ্রাদি উত্তর দিলেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে, প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'হাতে অনেক কাজ রয়েছে—এখন এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। পড়ে যাও।' শিপ্রা বললেন, 'ওটা বাদ দিয়েই না হয় পড়ে যা।'

বাদ দেবার কথা উঠতেই সবার কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা এবার শুভ্রার কাছে উঠে এসে ফর্দর দিকে তাকালেন। তাঁদের মুখের অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে শুরু করলো।

একজন বললেন, 'সত্যি নাকি? ও-সব লাগে, তা কখনও শুনিনি, এতো পুজোয় গিয়েছি!'

আর একজন বললেন, 'লাগে নিশ্চয়, না হলে পুরুতমশায় লিখে দেবেন কেন?'

ছাত্রীরা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বললে 'কী দিদিমণি? পুজোতে কী লাগে?'

অধ্যাপিকারা এবার সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। শুভ্রাদি কোনোরকমে বললেন, 'না কিছু নয়।' তিনি এবার সেই বিশেষ জিনিসটি বাদ দিয়ে পড়া শুরু করবার চেষ্টা করলেন—'মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম...' কিন্তু বাদ দেওয়া চললো না। সবার দৃষ্টি যেন বাদ দেওয়া জায়গাতেই আটকে গিয়েছে। সুভদ্রা হালদার বললেন, 'কী ব্যাপার?'

শুভ্রা অগত্যা এবার নিজের চেয়ার থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে উঠে এসে তালিকাটি দেখালো। এবার তাঁর চোখেও বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে ক'জন ছাত্রী আছে তিনি দেখে নিলেন। মাত্র দু'জন। তাদের বললেন, 'তোমরা এবার ফল-টলের ব্যবস্থাগুলো দেখো। আর তো সময় নেই।'

মেয়েরা বুঝলে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তারা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল এবার বললেন, 'হুঁ—জানতাম না।'

শিপ্রা মিত্র বললেন, 'মোস্ট এমব্যারাসিং। কম বয়সের কুমারী মেয়েরা রয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে পুজোতে কিনা বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা লাগে!'

'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দিয়ে কী হবে?' আর একজন অধ্যাপিকা প্রশ্ন করলেন।

'হরকিঙ্করবাবুর তালিকা অনুযায়ী ওই দিয়ে সপ্তমীর দিনে মহাস্নান হবে,' শুভ্রা বললেন।

ইতিমধ্যে আর সবাই লজ্জায় এমনই লাল হয়ে উঠেছেন যে, কথা বলতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বীকার করছি জিনিসটা এমব্যারাসিং—বিশেষ করে আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে যা হয়ে আসছে তার উপায় কী?'

'ওইটুকু বাদ দিলেই হয়', একজন প্রস্তাব করলেন।

সুভদ্রাদি বললেন, 'তার উপায় কোথায়? বাদ দিলে সমস্ত পুজোটাই বাদ দিতে হয়।'

সুভদ্রাদি এবার সমাজনীতির অধ্যাপিকা তন্দ্রা রায়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? শুভকাজে এই সব নোংরামি কী করে ঢুকতে দেওয়া হলো?'

অধ্যাপিকা রায় সদ্য ডক্টরেট প্রাপ্তা। বললেন, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকসটা খুঁজে দেখলে হয়। কিছু পাওয়া যেতেও পারে। তবে আমার মনে হয়, দুটো কারণ হতে পারে।'

'কী কারণ?'

তন্দ্রা রায় বললেন, 'আমাদের দেশের বিশ্বাস পতিতাগৃহে প্রবেশের পূর্বে পুরুষ তার সমস্ত সদ্‌গুণ দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায়। হয়তো সেইজন্যেই এই মৃত্তিকা বিশেষভাবে গুণান্বিত।'

কারুর মুখেই তখন কথা নেই। সবাই, এমন কি শিপ্রা মিত্রও, তন্দ্রা রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা রায় বললেন, 'আর একটা হতে পারে, হিন্দু ঋষিরা দুর্গোৎসবে উচ্চনীচ সবার সহযোগিতা কামনা করতেন। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে বলতে পারেন।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। তবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে এ-সব আলোচনা না করাই ভাল। আপনারা এখন যে-যার কাজগুলো সেরে ফেলুন।'

হরকিঙ্কর সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা কিলবিল করছে। ছেলেটা মনের মতো হয়নি। অমানুষ জানোয়ারও বলা চলতে পারে। না হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শূদ্রা রমণীর অঙ্কশায়িনী হয়ে, ধানবাদে সে কী করে পড়ে রয়েছে? কেন এমন হয়? ছেলেটা জন্মাবার আগে তিনি তো কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় আচরণের ত্রুটি করেননি। যথাসময়ে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন,

সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠী, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন—শাস্ত্রীয় কোনো পুজোতেই কোনো অনাচার হয়নি। তবুও ছেলেটা শেষ পর্যন্ত কেন এমন হলো স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। এবার মহাশক্তির বোধনের সময় মার কাছে তিনি সব দুঃখের কথা নিবেদন করবেন।

কারা যেন কড়া নাড়ছে। কারা আবার এই সময় জ্বালাতন আরম্ভ করলে? বাড়িটা সত্যিই যেন ভূতের হাট হয়ে উঠেছে। ওরা কারা কে জানে? মেয়েটা ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মনে হচ্ছে। বলছে, 'শোভনবাবু, আসুন আসুন। কতদিন খবর পাই না। শেষ পর্যন্ত মনে পড়লো তাহলে?'

লোকটা যেন অভিনয় সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে। সুব্রতাকে বলছে, 'তুমি চিন্তা করছো কেন, তোমাকে একটা ভাল রোল দেবই।'

'সে তো কতদিন হয়ে গেল, শোভনবাবু। এই অ্যামেচার থিয়েটারি অসহ্য হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের দিনটা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই রিহার্সেলটাই আর পারি না। আগে তবু দু'তিনদিন রিহার্সেল হলেই চলতো। এখন চৌদ্দদিন হলে বাবুরা খুশি হন। তাও ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান না।

হরকিঙ্করের কানে শব্দগুলো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা লাঠি নিয়ে তিনি দরজার দিকে তেড়ে যান। কিন্তু যেন পক্ষাঘাতের রোগী তিনি। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাঁর।

হরকিঙ্কর শুনলেন, মেয়ে চলচ্চিত্রে নামবার জন্যে পাগল। লোকটা বলছে, 'সাইড পার্ট থেকে শুরু করো। তারপর আস্তে আস্তে উঠবে।'

মেয়ে বলছে, 'শোভনবাবু, তা হয় না। আপনি তো এ লাইনে

অনেকদিন রয়েছেন। যে হিরোইন হয়, সে প্রথম দিন থেকেই হয়। সাইডগার্ল যে, সে চিরকাল সাইডগার্লই থেকে যায়।'

মেয়ে যেন শোভনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। বলছে, 'না শোভনবাবু, আপনার 'একস্ট্রা' যোগাড় করবার কনট্রাক্ট—আপনি যোগাড় করুন, সাপ্লাই করুন। কিন্তু আমাকে ভাল একটা প্রোডিউসার ধরিয়ে দিন। সুযোগ যদি পাই, দেখিয়ে দেবো কোথায় লাগে আপনাদের...'

শোভনবাবুর গলা যেন এবারে নীচু খাদে নেমে এল। ফিসফিস করে কি বলছে মেয়েটাকে। বাড়িটা হলো কি? এতো বড়ো আস্পর্ধা, বাড়ির কর্তা কি মারা গিয়েছে? কিন্তু প্যারালিসিসটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে—আঙুল নাড়াবার শক্তিও নেই হরকিঙ্করের।

হরকিঙ্করের মনে পড়লো বাড়িভাড়া বাকি। মালিক উকিলের চিঠি দিয়েছে, ছাড়তেই হবে বাড়ি। ওরা বলেছে বাড়ি ভেঙে ফেলবে! কিচ্ছু নেই বাড়িটার। অন্য বাড়ি দেখেছেন হরকিঙ্কর। অনেক ভাড়া চায়। তিন মাসের আগাম। এখানেও সাত মাস বাকি। টাকা চাই—অনেক টাকা। তবে যদি বাঁচা সম্ভব হয়। টাকাটাই যেন বিষ হয়ে গলে গলে দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—যেন তারই ক্রিয়ায় স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে প্যারালিসিসের সূচনা করেছে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। হরকিঙ্কর চোখ বুজে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন—ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি।...

আবার যেন বল ফিরে পাচ্ছেন হরকিঙ্কর। তিনি এবার আসন থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলছে, 'আচ্ছা, তাই ঠিক রইল। কোনো অসুবিধে হবে না।'

ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন হরকিঙ্কর। যেন তাঁর চোখ কান সব বিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট পেট নিয়ে এক সর্বভুক হরকিঙ্কর যেন শুধু বেঁচে রয়েছেন।

মেয়ে এবার বাবার দিকে তাকাল। 'বেরোচ্ছিস নাকি তুই?'

'হ্যাঁ বাবা, একটু কাজ আছে।'

বাবা চুপ করে রইলেন, মেয়ে বললে, 'একটা বাড়ির খবরও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবো।'

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। মেয়ে বললে, 'বাবা, কী এতো ভাবেন বলুন তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হরকিঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশকর্মা ভাণ্ডারে গিয়েছেন। পুজোর জিনিসগুলো কেনবার দায়িত্ব শুভ্রা শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপিয়েছেন। পৃথিবীর যত উদ্ভট জিনিস সব ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ফর্দ মিলিয়ে কিনতে শুরু করেছেন হরকিঙ্কর। 'আপনারা সব আসল জিনিস দেন তো? না পুজোর জিনিসেও ভেজাল ঢুকেছে আজকাল?'

দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলেছে : 'কেন বলুন তো?'

হরকিঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মায়ের পুজোয় আজকাল তেমন ফল হয় না কেন? হয়তো ভেজালের জন্যেই।'

দোকানদার গুম হয়ে থেকেছে। 'ভরসন্ধেবেলায় এমন কথা শুনিয়ে গেলেন?'

জিনিস মেলাতে মেলাতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মৃত্তিকা কই? বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথায়?'

'নেই।'

'রাখেন না?'

'ভেজাল। এমনি মাটি তুলে পুরিয়া করে বিক্রি করি আমরা', দোকানদার উত্তর দিয়েছে।

'তাহলে চাইনে।' মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে হরকিঙ্কর সোজা কলেজে চলে এসেছেন। সেখানে তখন পুরোদস্তুর হৈ-চৈ চলছে। রাত পেরোলেই পুজো। ঢাকি আসবে এখনই। আর ঢাকের বাদ্যি শুরু হলেই তো পুজো আরম্ভ হয়ে গেল।

হরকিঙ্কর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মা মহাশক্তির পুজো করবে? করুক না, করতে আপত্তি কি, তিনি নিজের মনেই বললেন।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জিনিস পেয়েছেন তো হরকিঙ্করবাবু?'

'একটা বাকি আছে, এখনই আনছি', হরকিঙ্কর উত্তর দিলেন।

আবার পথে বেরিয়েছেন হরকিঙ্কর। কী যেন খুঁজছেন তিনি। জায়গাটা কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও পল্লীটা আছে। ছোটবেলায় ওঁদের দেশের পল্লীটা চিনতেন। গ্রামের এককোণে, কয়েকখানা মেটে বাড়ি। আমোদিনী দাসী বলে একটা বুড়ি ও-লাইন ছেড়ে দুধের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার তার বাড়িতেও গিয়েছিলেন হরকিঙ্কর।

কিন্তু এখানে পাড়াটা কোথায়? খবর রাখেন না কোনো কিছুরই তিনি। রাস্তার মোড়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি বে-আইনি হয়ে গিয়েছে। সত্যি যদি কোনোদিন পতিতাবৃত্তি উঠে যায়, তাহলে পুজোর সময় বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু কাগজেই তিনি পড়েছেন, আইন করে কিছুই হয়নি—ব্যবসা

পুরোদস্তুর চলেছে। সুতরাং এখন থেকে সুদূর ভা াতের কথা ভেবে কী লাভ?

পানের দোকানে খোঁজ নেওয়াই বোধ হয় ভাল. ওরা নিশ্চয় খবর রাখে। সোজা গিয়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করেছিলেন। ওরা ফিকফিক করে হেসেছে। 'এই বয়সেও! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে, এখনও!'

একজন বললে, 'তোর অত গার্জেনগিরিতে দরকার কী? জিজ্ঞেস করছেন রাস্তাটা বলে দে।'

পানে চুল লাগাতে লাগাতে দোকানদার বলেছে. 'জরুর। বহুত আদমীই খবর নেয়। কিন্তু ঠিক এই সময় নয়, আর কিছুক্ষণ পরে।'

তারপর হরকিঙ্করকে আর একবার ভালভাবে দেখে. মুখ-টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নতুন শখ হয়েছে বুঝি? বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। মিনিট পাঁচেক পরে ডানদিকের পাকা রাস্তাটা ধরবেন। ওইখানেই সিনেমা হল। হলের পিছন দিকেই গোটা কয়েক গলি—ওইখানেই যা চাইছেন, তা পাবেন!'

আর সময় নষ্ট না করে হরকিঙ্কর এগোতে শুরু করেছেন। সিনেমা হলের কাছে আরেকটা দোকানে জিজ্ঞেস করতে হলো। তারাও মুচকি হাসলে। বললে, 'শরাব চাই নাকি বাবু? ভাল জিনিস পাবেন।'

দাঁতে দাঁত চেপে হরকিঙ্কর গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েকটা দরজার কাছে কারা যেন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরকিঙ্কর একবার থমকে দাঁড়ালেন। গ্যাসপোস্টের আলোয় মেয়েগুলোও তাঁকে ভাল করে দেখে নিলে। এমন নামাবলী গায়ে সদ্‌ব্রাহ্মণ অতিথি তারা বড়ো একটা পায় না। তাই আহ্বান জানালে, 'আসবেন

নাকি ঠাকুর?'

হরকিঙ্কর ওদের দরজার দিকে তাকালেন। লাল সিঁদুরে কি যেন লেখা—শ্রীশ্রীদুর্গামা সহায়। পাশের দরজায় তাই লেখা। ব্যাপার কী?

এগিয়ে গেলেন হরকিঙ্কর। এখানে লেখা—'ভদ্রলোকের বাড়ি।' হরকিঙ্করের দেহটা যেন ঘুলিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হবে।

এইখানটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। দরজার মাথায় মায়ের নামও রয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা এখনও বেরিয়ে আসেনি। হয়তো এখনও সাজপোশাক করছে, কিংবা ওদের হয়তো বাইরে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। এইখানকার মৃত্তিকাতেই কাজ চলে যাবে। উবু হয়ে বসে মাটি সংগ্রহ করতে বসলেন হরকিঙ্কর। এমন সময় কে যেন নারীকণ্ঠে বললে 'ও-মাগো, লোকটা ওখানে বসে কী করছে?'

হৈ হৈ করে ভিতর থেকে আরও দুটো-তিনটে মেয়ে এসে হরকিঙ্করের হাত চেপে ধরলো। 'এই মিন্‌সে, এখানে কী করছিস্?'

হরকিঙ্কর ঘাবড়ে গিয়েছেন। 'না মা, কিছু করছি না।'

'মুয়ে আগুন মিন্‌সের, ঢঙ দেখলে মরে যাই। উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!'

'সত্যি বলছি মা', হরকিঙ্কর কাতর আবেদন করলেন।

'ওর হাতে কী রয়েছে, দেখ তো?' একজন বললে, আর একজন জোর করে হরকিঙ্করের মুঠোটা খুলে ফেললো। 'এক মুঠো ধুলো নিয়ে বুড়ো কী করছিল গা?'

আর একজন মেয়ে প্রসাধন অর্ধসমাপ্ত রেখেই বোধ হয় ছুটে

বেরিয়ে এসেছিল। গা দিয়ে সস্তা স্নো-এর গন্ধ বেরোচ্ছে! সে এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। 'সর্বনাশ করেছে, কাপালিক নিশ্চয়, তুক করছিল।'

'না না, আমি পুরুত মানুষ, তুক করবো কেন?' হরকিঙ্কর একটু ভয় পেয়েই বললেন।

মেয়েদের গলার স্বরে একটা মোটকা লোকও কোথা থেকে হাজির হয়েছে। 'ঘেঁটুবাবু, দেখুন না, লোকটা এখানে বসে মাটি তুলছিল। কী তুক-তাক করে গেল কে জানে।'

ঘেঁটুবাবু এবার হরকিঙ্করের গলার চাদরটাকে টেনে ধরলো, অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, 'তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কেবল এখানকার মৃত্তিকা নিতে এসেছি দুর্গাপুজোর জন্যে।'

ঘেঁটুবাবু হরকিঙ্করের হাতে আচমকা একটা থাপ্পড় দিলে। সমস্ত মাটিটা ঝরে পড়ে গেল। মেয়েরা বললে, 'কী সর্বনাশ গা, এত বাড়ি থাকতে আমাদের দরজা থেকে মাটি তোলা। মরণ আর কি! গতর বেচে করে খাচ্ছি, তাও সহ্য হচ্ছে না মিন্‌সের।'

ঘেঁটুবাবু বললে, 'যা শ্লা! আর খবরদার মাটি নিতে আসিস না এখানে। তাহলে জান লিয়ে লেবো।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছেন হরকিঙ্কর। উত্তেজনায় দেহটা কাঁপছে! সামান্য মৃত্তিকা সংগ্রহ্ করতে এসে এ কি বিপত্তি! কেন বাপু, সামান্য একটু মাটি নিলে কী তোমাদের ক্ষতি হতো?

হরকিঙ্করের দেহটা ঘিনঘিন করছে। যেন কয়েকটা নর্দমার ধেড়ে ইঁদুর তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। স্নান করতে হবে তাঁকে। গঙ্গাজলে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

কিন্তু মাকে কী দিয়ে স্নান করাবেন তিনি? মহাস্নানের সময় এই মৃত্তিকা আসবে কোথা থেকে? পাগল নাকি তিনি? এত ভাববার কী আছে? হাজার হাজার পুজো তো দশকর্মা-ভাণ্ডারের ভেজাল মাটি দিয়েই হচ্ছে। আরেকটা হবে।

একটা রিকশা ডাকবেন নাকি হরকিঙ্কর? কিন্তু এই অবস্থায় রিকশায় চড়লে লোকে মাতাল ভাববে। হাঁটছেন হরকিঙ্কর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন হরকিঙ্কর। ক্যাঁচ করে একটা মোটর এসে প্রায় ঘাড়ের কাছে থামল।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পেটটা বেশ মোটা, গলায় হার ঝুলছে। 'সুব্রতা দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? ক্লাবে ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়?'

হরকিঙ্কর বিরক্তভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। 'সুব্রতা দেবীর বাড়িতে এত রাত্রে দেখা হয় না।'

লোকটা এবার নেশার ঘোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'মাইরি আর কি? গোঁসাই বাড়ির মেয়ে বুঝি।'

'যা বলছি, তাই শুনুন। সুব্রতা এমন সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না।'

'আহা-হা, চু চু! তাহলে সব বলবো নাকি? কিন্তু কে হে তুমি বাবার ঠাকুর?'

'মুখ সামলে কথা বলুন বলছি।'

'ওরে বাপরে, মানে মানে কেটে পড় বাছাধন, নইলে, স্রেফ ট্রেনে কাটা পড়বে।'

'এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, যদি বেশি কিছু করেন।'— হরকিঙ্করের দেহে শক্তি থাকলে লোকটার গালে একটা থাপ্পড় মারতেন।

'ও বাবা! সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, কবে থেকে উনি ভদ্দরলোকদের পাড়ায় উঠে এসেছেন!'

দু'জনেই এবার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছেন।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হরকিঙ্কর! হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির উপরের দিকটা ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটার সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে। এক ঝটকায় সে হরকিঙ্করকে মাটিতে ফেলে দিলে। 'শালা, আমি ভাবছিলাম আমিই শুধু মাতাল হয়েছি। দেখছি তুমিও মাল টেনেছো।'

লোকটা হয়তো এবার হরকিঙ্করের বুকের উপর চেপে বসতো। হরকিঙ্করও গড়াতে গড়াতে লোকটার পা ধরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো সর্বনাশ কিছু একটা ঘটতো। কিন্তু গোলমাল শুনে সুব্রতা এসে দরজা খুলে থমকে দাঁড়াল।

'এই যে সুব্রতা দেবী। একটু আগে আপনি বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন। কিন্তু আপনি চলে আসবার পর দেখলাম হাতে কাজ নেই। আপনাকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন হুহু করতে লাগল।'

হরকিঙ্কর মাটি থেকে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মা, তুই ভিতরে চলে যা। কোথাকার মাতাল এসে পাড়ায় ঢুকেছে। কোত্থেকে তোর নাম জেনেছে। আমি ওর দেখাচ্ছি মজা।'

কিন্তু এ কি হলো? এখনও মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

লোকটা বললে, 'কোথাকার এই বুড়োটাকে আপনার বাড়ির খোঁজ জিজ্ঞেস করে ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

সুব্রতা তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে

বললে, 'আপনি এখন যান। আমি যাবো না।'

'কেন, কী হলো আপনার? এই তো কিছুক্ষণ আগে হোটেল থেকে এলেন। ডার্করুমে টেস্ট দিলেন। এর মধ্যেই ক্যারাকটার পাল্টিয়ে গেল? বইতে নাবার ইচ্ছে নেই বুঝি!'

'কী?' হরকিঙ্কর আবার লোকটার দিকে তেড়ে গেলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ সার, যা-বলছি ঠিক তাই।' লোকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

সুব্রতা এবার চিৎকার করে উঠলো, 'যান বলছি। না হলে এখনই লোক ডাকবো। চাই না আপনার বইতে পার্ট নিতে।' সুব্রতা এবার ঠকঠক করে কাঁপছে।

লোকটা বুঝলো কোথাও আজ একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বললে, 'ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি।' তারপর হরকিঙ্করকে শুনিয়েই যেন বললে, 'অন্য কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নিশ্চয়।'

দরজা বন্ধ করে দিলেন হরকিঙ্কর। ঘামে নেয়ে উঠেছে তাঁর দেহটা। সুব্রতা হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে। কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন হরকিঙ্কর। মেয়ে বললে, 'বাবা!'

বাবা চুপ করে রইলেন।

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বাবা, লোকটা সপ্তমীর দিনে আমার সঙ্গে ফিল্মের কন্ট্রাক্ট সই করবে বলেছিল। এই একবারই—ঢোকবার সময় কেবল ওদের কাছে ছোট হতে হয়। তারপর নাম হয়—সব ঠিক হয়ে যায়।'

বাবা পাথরের মতো চুপ করে রইলেন।

মেয়ে ডাকল, 'বাবা!'

বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

এখন রাত অনেক। ওরা শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুব্রতার ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা যেন খোলা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো, খোলাই রয়েছে। বাবার বিছানাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুব্রতা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, বিছানায় তো কেউ নেই।

তড়াং করে সভয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রতা। 'বাবা বাবা, আপনি কোথায় গেলেন?'

বাবা দরজার বাইরে রয়েছে। 'বাবা, এখনও জেগে রয়েছেন আপনি? কাল ভোরবেলাতেই না পুজো।'

দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হরকিঙ্কর কী যেন করছিলেন। হরকিঙ্কর এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো রাত্রের অন্ধকারে কাপালিকের চোখের মতো জ্বলছে।

'ওখান থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন বাবা?'

হরকিঙ্করের চোখ দুটো থেকে এবার যেন সত্যিই আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মাটি।'

সুব্রতা বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবু কাছে গিয়ে পরম স্নেহে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাটি কী করবেন বাবা?'

বাবা প্রথমে নির্বাক রইলেন। মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর ঠোঁট দুটো এবার কাঁপতে শুরু করলো। 'পুজোয় লাগবে', এই বলে রাত্রের অন্ধকারে পুরোহিত হরকিঙ্কর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত

হরিহরের জীবনে এখন প্রচণ্ড ক্রাইসিস। যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও অঘটন ঘটতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্মহনন, খুন জখম কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু নাটকীয় এই দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছতে গেলে প্রথম পর্বটাও জানা প্রয়োজন।

একেবারে আদি থেকেই শুরু করা যাক। হরিহর ও শকুন্তলার জীবনকাহিনীর প্রথম পর্বটা অনেকটা রূপকথার মতোই মধুর। আমাদের এই অর্ডিনারি লাইফে একজন পুরুষ ও একজন আধুনিকা মহিলার এর থেকে মিলনাত্মক পরিণতির কথা সিনেমার ডাকসাইটে চিত্রনাট্যকারও ভাবতে পারবেন না। ইন ফ্যাক্ট, হরিহরের বন্ধু তরুণ চলচ্চিত্রকার দিগন্ত সিনহা বলেছিল, "তোদের দু'জনের লাইফকে একটু এদিক-ওদিক করে নিয়ে কর্মজীবনের ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা ছবি করলে বক্স অফিস হিট হতে বাধ্য।

"মফস্বলে ছবিটা ফ্লপ হবে, ওখানে কেউ অফিস-টফিস নিয়ে মাথা ঘামায় না", উত্তর দিয়েছিল হরিহর হালদার।

"একদম ভুল ধারণা। এখন অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েরাও ওয়ার্কিং গার্লদের চোখের সামনে দেখতে চাইছে—স্রেফ বেডরুম, রান্নাঘর এবং ঠাকুরঘরের সীন দেখে-দেখে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে", বলেছিল দূরদর্শী দিগন্ত সিন্‌হা।

"মফস্বলের মেয়েরা কী চাইছে তা তোমরা জানতে পারো কী

করে?" ইয়ং এবং অনুসন্ধিৎসু হরিহর প্রশ্ন করেছিল।

দিগন্ত সিন্‌হাও একসময় বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিল। তার ঝটপট উত্তর: "যেভাবে তোমরা কোম্পানিতে খরিদ্দারের মন জানতে পারো নিজের চেয়ারে বসে থেকেও। বাজার সংক্রান্ত গবেষণা বা মার্কেট রিসার্চ—অকুস্থলে দূত পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে খোঁজখবর নেওয়া।"

এই মার্কেট গবেষণার জোরেই দিগন্ত সিন্‌হা বলতে পারছে, "হরিহরের মতো একজন তরুণ এম-বি-এ এবং শকুন্তলার মতো একজন মহিলাকর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের গল্পটা সিনেমায় জমে উঠবে এবং মফস্বলের মহিলাদেরও হৃদয়হরণ করবে।"

"বহু ইংরিজি ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বইপড়া হরিহরের প্রশ্ন : "কিন্তু আইডেনটিটি? গ্রামের বধূ অথবা মফস্বলের মহিলা কী করে শকুন্তলার মতো মেয়ের সঙ্গে অফিস পরিবেশে একাত্মতা অনুভব করবেন?"

দিগন্ত সিন্‌হা বলেছিল, "রূপকথার মানসিকতায়—অচিন দেশের রাজকুমারীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁরা যেভাবে নিজেদের জড়িয়ে নেন। আরও একটা সুবিধে আছে তোমাদের গল্পে—শকুন্তলার শিকড়টা আমাদের খুব কাজে দেবে।"

"তুমি ওর বাঁশবেড়িয়া ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছো? বাঁশবেড়িয়ার মেয়ে কলকাতায় এল, হোস্টেলে থাকল, টাইপিং-স্টেনোগ্রাফি আয়ত্ত করল, তারপর হইচই করে একদিন আমাদের এই হাইটেক কোম্পানিতে জয়েন করে ঝড় তুলল এসবই তুমি গাঁয়ের মেয়ের গল্প বলে চালিয়ে দিতে পারবে বলছ?"

দিগন্ত সিন্‌হা বলেছিল, "চিত্রনাট্য করাটা খুবই সহজ হবে। প্রথম

দৃশ্যে লেডিজ সীটে বসে তুমি পরমসুখে ম্যানেজমেন্ট ম্যাগাজিন পড়ছ। একটি মেয়ে বিরক্তভাবেই বলল উঠুন উঠুন। তোমাকে উঠিয়ে সে লেডিজ সীটে বসে পড়ে একটা মেয়েলি ম্যাগাজিন পড়া শুরু করল। এই দৃশ্যে আমি নারী স্বাধীনতার প্রতি আমাদের চাপা অনুরাগ প্রকাশ করলাম—মেয়েরা খুশি হল্।

"তারপরের দৃশ্যেই দেখাচ্ছি, তুমি অফিস ঘরে বিপুল-বিক্রমে রাজত্ব করছ, আর সেই মেয়েটিকেই তোমার পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠিয়েছে তোমার সেক্রেটারির কাজ করার জন্যে। জমে যাবে। বুঝলে হরিহর। তুমি যেভাবে সেদিনের বর্ণনা দিয়েছিলে সেভাবেই দৃশ্যটা টেক করব। শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে তুমিও অবাক এবং সেও অপ্রস্তুত। তুমি এবার একটু মজা পাচ্ছো মনে-মনে, কিন্তু এই অনুভূতিটা খুব প্রকট হবে না, কারণ শহরের প্রগতিবাদিনীরা ভাববে তুমি পুরুষমানুষের সুপিরিয়রিটি দেখাচ্ছ—সুযোগ সুবিধে পেলে ওই শকুন্তলাও তোমার পোস্টে বসতে পারত।"

"সুপিরিয়রিটি দেখালে কই? যিনি নায়ক তিনিও তো ট্রামের সাধারণ যাত্রী, মার্সেডিজ গাড়ি চড়ে তিনি তো নায়িকাকে রাস্তায় অবজ্ঞা করে অফিসে চলে আসেননি, যেমন দেখানো হয় বম্বের রঙিন ছবিতে।"

"এটা তো গেল ব্যাখ্যার ব্যাপার। বাংলা সিনেমায় ওই সুযোগ তুমি পাবে কোথায়? মেয়েরা হল্-এ বসে প্রথম দফায় যা ভেবে নিল তাই তোমার কাছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। আমাকে তাই দেখাতে হবে, ওই লেডিজ সীট থেকে তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা যেন তোমার মনেই নেই, অথচ শকুন্তলা ভাবছে তুমি হয়তো প্রতিহিংসা দেখাবে।

ইংরিজি ছবি হলে, ওই পয়েন্টে ছোটখাট একটা আলোচনা হয়ে ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেত, কিন্তু এ-দেশে কোনও সন্দেহের নিরসন হোক এটা মানুষ চায় না, তুমিই তো বলে থাকো।"

হয়তো এদেশের সব মেয়েই এই দৃশ্যে শকুন্তলার পক্ষে। লেডিজ সীটে হরিহরের ঐভাবে বসবার কী দরকার ছিল? চলন্ত ট্রাম ম্যাগাজিন পড়বার শ্রেষ্ঠস্থান নয়। আর ম্যাগাজিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে লেডিজ সীটের আসন অধিকারিণীদের দেখতে না-পাওয়াটা একটা পুরনো পুরুষালী কায়দা, যা মেয়েদের এখন জানা হয়ে গিয়েছে। ফলে তাদের ঝাঁঝালো গলা শুনতে হয়। অনিচ্ছুক পুরুষদের গদিচ্যুত হতে দেখলে আধুনিকারা স্যাটিসফ্যাকশন পায়—পরিতৃপ্তির রসায়ন বড় জটিল।

কিন্তু দিগন্ত সিন্‌হা জানে না, হরিহরের দিদিমা ব্যাপারটায় মোটেই খুশি হননি। নাতির কাছে মন্তব্য করেছিলেন, "কোমর বেঁধে, পায়ে পা দিয়ে যে-মেয়ে ট্রামে-বাসে পুরুষমানুষের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে অফিসে দয়া দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই।"

হরিহর তখন অবশ্যই আজকের, অর্থাৎ আমাদের এই গল্পের দ্বিতীয় পর্বের মানসিকতায় ছিল না। সে বলেছিল, "মাই ডার্লিং দিদু, মেয়েটা কোমর বাঁধবার এবং পায়ে পা দেবার চান্স পাবে কী করে? তবে কটমট করে তাকিয়েছিল।"

দিদুকে সেদিন হরিহর আরও যা বোঝাতে চেয়েছিল—"অফিসে কোনও মেয়ের প্রতি দয়া দেখাবার বিন্দুমাত্র স্কোপ নেই। নিজের জোরে পার্সোনেল বিভাগের পরীক্ষার হার্ডল-রেসে জিতে শকুন্তলা এসেছে আমার ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং-এর জন্যে।" একখানা চিঠি

ডিকটেশন দিয়েছে হরিহর। তড়িৎগতিতে সুন্দর সাজিয়ে নির্ভুলভাবে টাইপ করেছে শকুন্তলা সান্যাল।

হরিহর হালদার তখনকার মতো ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখতে পারত—ছুতোও ছিল, হরিহর তখনই চেম্বারের মিটিং-এ যাচ্ছিল। কিন্তু কুইক ডিসিশন নেবার অনিচ্ছাই এই জাতটাকে একশো বছর পিছিয়ে রেখেছে। হরিহর মানসনেত্রে ডিসিশন তালিকাটি দেখতে পেল—তার সামনে দুটি পথ। একনম্বর : শকুন্তলা সান্যালকে অমনোনীত করা। দু'নম্বর : শকুন্তলাকে জানানো তিনি এইখানেই কাজ করবেন। পথেঘাটে সামান্য কী ঘটে গিয়েছে তার জন্যে অফিসের সিদ্ধান্ত নড়চড় হয় না।

এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা শকুন্তলা নিজেও শুনেছিল। এবং কুইক সিদ্ধান্ত নেবার এই প্রবল ইচ্ছার জন্যে নাম দিয়েছিল হরিহর সিদ্ধান্তবাগীশ। ব্যাপারটা অবশ্য তখন হরিহরের কানে আসেনি। এলে হয়তো পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিত। ব্যাপারটা শকুন্তলা অন্যত্র প্রকাশ করেছিল, এবং রত্না দত্ত সেবার মরিয়া হয়ে হরিহরকে বলেছিল, "আপনি জানেন আপনাকে কী নাম দিয়েছিল? আপনি যে-কোনও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন না, কোনও সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রাখেন না, সুতরাং অ্যাডমায়ার করে আপনার নাম দিতে পারত মিস্টার কুইক ডিসিশন অথবা মিস্টার ডিসিশন মেকার। তা নয় কি না বাংলায় সিদ্ধান্তবাগীশ!"

রত্না দত্ত যা বোঝাতে চেয়েছিল, এর মধ্যে চাপা ব্যঙ্গ রয়েছে। শকুন্তলা সান্যালের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে হরিহর যেভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তা তার সেক্রেটারি পছন্দ করে না।

রত্না দত্ত মেয়েটিকেও খুব ভাল লাগত হরিহরের। দু'জনে

কয়েকবার একই ট্রামে ডালহৌসি থেকে পার্কসার্কাস গিয়েছে। একবার সিনেমা হল্-এও দু'জনের দেখা হয়েছে। মডার্ন বাঙালি মেয়ে বলতে যা বোঝায়—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সুখপ্রদ সমন্বয়, নিজের অধিকার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ব্যগ্রতা নেই, অথচ নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সারাক্ষণ সজাগ। কিন্তু একটু বোকামি করে বসে আছে, বাড়িতে রেকর্ড করা নিজের কয়েকটা গানের একটা ক্যাসেট হরিহরকে উপহার দিয়েছে। গানগুলো রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু মানেগুলো যেন কেমন! দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ধরনে এক অর্থ, দেবতার জায়গায় অন্য কাউকে বসালে অন্য মানে। সাধে কি আর বাঘা-বাঘা সায়েবরা বিরূপ হয়ে বলেছেন, এ-দেশের মানুষদের বোঝা শক্ত, এদের সবকথার একাধিক অর্থ!

রত্না দত্তর মন্তব্যের আলোকে হরিহর তখনই শকুন্তলা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছে। রত্না দত্তর মন্তব্যে কি ঈর্ষা রয়েছে? সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেণীর রমণীর উল্লেখ রয়েছে যারা অপ্রিয়ভাষণের মাধ্যমে প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। তাছাড়া সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দটি বংশবাটী অঞ্চলে এখনও হয়তো শ্রদ্ধাবাচক।

হরিহর-শকুন্তলা কাহিনীর প্রথম পর্বের সবক'টি ঘটনাই দিগন্ত সিন্হার ভালভাবে জানা। দিগন্ত বলেছিল, "ব্যাপারটা সব মিলিয়ে খুবই সুইট। বাঙালি মেয়েরা ঠিক যেমনটি চায়। একটু মডার্ন বোতল, কিন্তু ভিতরের তরল পদার্থটি চিরন্তন। অফিসের তরুণ সায়েব এবং তাঁর একান্ত সহকারিণীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান। অথচ সর্বত্র আধুনিকতার ছোঁয়াচ। সেই সঙ্গে একটু নারী স্বাধীনতার নমুনা। মেয়েরা হাজার-হাজার বছরের পরনির্ভরতা বিসর্জন দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—নতুন পরিবেশে তারা মন্দ

করছে না। তারা ভাল রোজগার করছে।"

হরিহরের মনে পড়ছে, পরের দিনের কথা। দিদিমাকে সে বলেছিল, "তুমি কিছু ভেবো না। যদি দেখি ট্রামের সেই স্বভাব বদলায়নি তা হলে আবার একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলব। শকুন্তলা সান্যালকে ফেরত পাঠিয়ে দেবো—ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। জানো দিদিমা, ড্রকার সায়েব বলেছেন, জীবনটা হচ্ছে একের পর এক সিদ্ধান্তের মালা।"

দিদিমা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। "ও মা! এতো ম্লেচ্ছদের কথা হল! জীবনের সবটাই তো ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র।"

"মাই ডিয়ার দিদিমা, ওপরওয়ালার ঘাড়ে সব সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই তো আমাদের এই সর্বনাশ হয়েছে। আমরা বাড়িতে হিন্দু, অফিসে ম্লেচ্ছ।"

হরিহরের আরও মনে পড়েছে, দিদিমা বিশ্বাস করেননি নাতিকে। তবে আদর করে চুমু খেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "হালদার বংশের ছেলে তুমি, সময় হলেই সব বুঝবে!"

সেবার বিকেলে অফিসে ফিরে এসে হরিহর অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার ঘরের এবং টেবিলের অবস্থা পাল্টে গিয়েছে। ছোট্ট অফিসটা ঝকঝক করছে। মাথার ওপর টাঙানো বাঁকা ছবিটা সোজা হয়েছে। অফিসের রঙিন ক্যালেন্ডারটা যথাস্থানে শোভা পাচ্ছে। টেবিলের বাড়তি কাগজপত্র সব ফাইলস্থ হয়েছে। সমস্তদিন অনুপস্থিতির সময় কে কে কখন কোথা থেকে কী কারণে টেলিফোন করেছিল তার তালিকা চমৎকার হস্তাক্ষরে একটি কাগজে লেখা রয়েছে। এই অফিসে এতদিন নিপুণতা ছিল, কিন্তু

গৃহিণীপনা ছিল না। শকুন্তলা সান্যাল বসন্তের হাওয়ার মতো তা এই অফিসে নিয়ে এসেছে।

এই সব শিক্ষা কোথায় পেল শকুন্তলা? পুরনো অফিসে। মিস্টার ভট্টাচার্য অত্যন্ত সাজানো-গোছানো লোক ছিলেন। সব কিছু যত্ন করে শিখিয়েছেন শকুন্তলাকে। অফিসটা নাম-করা। মাইনে ভাল, মিস্টার ভট্টাচার্য এত যত্ন নিয়েছেন, তবু চাকরি পরিবর্তন কেন?

হরিহর সঙ্গে-সঙ্গে হিসেব করে নিয়েছে, কোন-কোন কারণে মেয়েরা ভাল অফিসে চাকরি ছাড়বার সিদ্ধান্ত নেয়? মিস্টার ভট্টাচার্যের বয়স কত? তাঁর বৈবাহিক স্ট্যাটাস কী? যদি মিস্টার ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কোনও খারাপ ধারণা থাকত তা হলে শকুন্তলা নিশ্চয় এইভাবে তাঁর প্রশংসা করত না।

এর বেশি জানবার ইচ্ছে হলেও সব সময় জানতে চাওয়া যায় না। পরে অবশ্য শকুন্তলাই একদিন বলল। ভদ্রলোক কোরাপসান চার্জে পড়ে গেলেন। অমন সুন্দর লোক যে অমনভাবে ঘুষ নিতে পারেন তা শকুন্তলা জানবে কী করে? বড়সায়েবের পাতা ফাঁদে মিস্টার ভট্টাচার্য ধরা পড়লেন, অফিসে বসে টাকার বান্ডিল ব্যাগে পুরতে গিয়ে। তারপর কত ধরনের এনকোয়ারি, সমস্ত ফাইল নিয়ে কতবার টানাটানি। ব্যাপারটা ভাল লাগল না, শকুন্তলা পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

শকুন্তলার মুখে গল্পটা শুনতে-শুনতে হরিহর বলেছিল, "নেগেটিভ ভাবে দেখছেন কেন? বলুন, আপনি অন্যত্র চাকরি খোঁজবার সিদ্ধান্ত নিলেন।"

দিগন্ত সিন্‌হা পরে রসিকতা করেছিল, "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তই বলতে হবে! না-হলে হরিহর ও শকুন্তলার পরিচয় ঘটবে কী করে?"

হরিহরের উত্তর : "তুমি বোঝাতে চাইছ আমরা সবাই ভবিতব্যের দাস! কিন্তু আসলে, বিশ্বসংসারটা চলছে অসংখ্য ডিসিশনের চেইন রিঅ্যাকশনে সিদ্ধান্তের উৎপত্তি অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এইভাবেই তুমি ঘটনাপ্রবাহকে নিজের পরিকল্পনা মতো পরিবর্তিত করতে পারো, না-হলে নিজেই তুমি পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাবে।"

চমৎকার কয়েকটি মাস গায়ে বসন্তের হাওয়া লাগিয়ে এইভাবে কেটে গিয়েছে। হরিহর আবিষ্কার করেছে, আগে মাঝে-মাঝে অফিসে ডুব দেবার সিদ্ধান্ত নিতে লোভ হত, শকুন্তলা সান্যাল আসবার পরে তার আর হয় না। শকুন্তলা সান্যাল দু'দিনের জন্যে অফিস কামাই করেছিল, তখন হরিহরের কাজকর্ম শ্লথগতি হয়েছিল। যদিও রত্না দত্ত সেই সময়ে খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছে। বলেছে, খুব আর্জেন্ট কিছু থাকলে বলবেন, করে দেব। মিস্টার স্যামুয়েলকে না-জানিয়ে তার সেক্রেটারিকে কাজ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু রত্না দত্ত বুঝিয়ে দিয়েছে, হরিহর ইজ এ স্পেশাল পার্সন। এর সঙ্গে অফিসি কানুনের কোনও সম্পর্ক নেই।

শকুন্তলা সান্যাল দু'দিন পরে অফিসে ফিরে এসে যখন শুনল তার অনুপস্থিতিতে ইয়ং হরিহরের 'ভীষণ' অসুবিধা হয়নি তখন মেজাজটা একটু খারাপ হল। অভিমানে তার মন ভরে উঠল। তার ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, হরিহর বলে বসল, "আরও একদিন ছুটি নিয়ে শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ করে এলেন না কেন?"

সরল মনেই বলেছে হরিহর, কিন্তু সন্দেহবিষে জর্জরিত শকুন্তলা অন্য অর্থ করে বসে আছে। 'তাহলে রত্না দত্তকে এই ডিপার্টমেন্টে পাকাপাকি বদলি করার মতলবটা হাসিল করা যায়!' তা হচ্ছে না কিছুতেই, দরকার হলে হাসপাতাল থেকে রিস্ক বন্ডে রিলিজ নিয়ে

শকুন্তলা অফিসে চলে আসত।

এদিকে তরুণ ও এলিজেব্‌ল ব্যাচেলর হরিহর নিজের ঘরে বসে পরবর্তী রণকৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। কিন্তু তার আগে সে ভাবছে, ইংরিজি এলিজেব্‌ল ব্যাচেলর কথাটার বাংলা তর্জমা কী হতে পারে? একটা ভদ্রস্থ টার্ম মনে আসছে না। দিদিমা যা বলেছিলেন—'সমর্থ আইবুড়ো' হয়ে আর কতদিন ঘুরবি?—মনে পড়ছে। মানে হয়তো এক কিন্তু ঠিক পাতে দেওয়া যায় না। কাগজে একবার লিখেছিল, 'বিবাহযোগ্য যুবকবৃন্দ মেলামেশার সুযোগের অভাবে যোগ্যাপাত্রী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই পণপ্রথার বন্ধন শিথিল হচ্ছে না।' কিন্তু এটাও ঠিক হরিহর হালদারের মতো ইয়ংম্যানকে মানায় না—আসলে সর্ববিষয়ে সুযোগ্য যুবক, যে বিবাহেরও উপযুক্ত।

কিন্তু শকুন্তলা এসব ভাবনার অংশীদার হোক তা এই মুহূর্তে মোটেই কাম্য নয়। অনুপস্থিতির দু'দিন কাজের স্রোত বন্ধ না-হলেও, হরিহরের মন অকারণ শূন্যতায় ভরে উঠেছে। কিন্তু এ-খবর কোনওরকমেই ফাঁস না-করার ম্যানেজমেন্ট-সিদ্ধান্ত নিয়েছে হরিহর। ম্যানেজমেন্ট চায়, কারুর যেন এই ধারণা না-হয় যে সে এই প্রতিষ্ঠানে অপরিহার্য। কর্মীরা হচ্ছে কোম্পানিবৃক্ষের পাতার মতো, সম্মিলিতভাবে যার মূল্য আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ মহামূল্যবান নয়।

শকুন্তলা-হরিহর সাক্ষাৎকারের সময় দুই পক্ষ দুই বিষয়ে সংবাদসংগ্রহে আগ্রহী। হরিহর দু'দিনের শূন্যতার কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গলা ব্যথা, জ্বর—টনসিলের প্রবলেম নেই তো?" বন্ধু দিগন্ত সিন্‌হার মুখে-সে শুনছে, অনেক মিষ্টিমেয়ের

এই টনসিল প্রবলেম থাকে। কুমারী পর্যায়ে শুনতে রোমান্টিক, কিন্তু গার্হস্থ পর্বে প্রায়ই শয্যাশায়িনী। দিগন্ত নিজেই তার জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে এই সমস্যায় ভুগছে, বন্ধুমহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোক তা সে চায় না।

টনসিলের প্রসঙ্গে সরল মনে হেসে উঠলো শকুন্তলা, "আমার বড় মামা ই-এন-টির মস্ত ডাক্তার!" "আর বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি।" বিখ্যাত ই-এন-টি মামারা ভাগ্নীদের গলায় এইসব সমস্যা পরিণত বয়স পর্যন্ত পুষে রাখেন না।

কিন্তু যা ভীষণভাবে আঘাত দিয়েছে শকুন্তলাকে তা হল মিস্টার হালদার একবারও তার অনুপস্থিতি ফীল করেননি।

এর পরেই আবার অসাবধানতাবশত রত্না দত্তর গানের টেপের কথা উঠেছে। টেপ করলেই যে গাইয়ে হওয়া যায় না, এই নির্মল সত্যটুকু শকুন্তলা বাধ্য হয়েই শুনিয়ে দিয়েছে হরিহর হালদারকে। সেই সঙ্গে হরিহরও শুনেছে, একটু-আধটু গান শকুন্তলাও গাইতে জানে। দু'একটা মেডেল এখনও তার কাছে আছে। তবে নিজেকে টেপে বন্দী করার স্টাইল শকুন্তলা দেখাতে রাজি নয়।

অর্থাৎ...হরিহর যথাসময়ে রত্না দত্ত ও শকুন্তলা সান্যালের মূল্যায়ন শুরু করেছে একটি কার্ডের দুইটি স্তম্ভে :

	রত্না	শকুন্তলা
বয়স	২২	২৩
উচ্চতা	৫´ ৩´´	৫´ ৪´´
শিক্ষা	কনভেন্ট শিক্ষিতা	বিএ
গাত্রবর্ণ	উজ্জ্বল শ্যাম	একটু ফর্সার দিকে
ব্যক্তিত্ব	বন্ধুত্বপূর্ণ	লাজুক, কখনও মেঘ, কখনও রোদ

সঙ্গীত	টেপ	নো টেপ
স্বাস্থ্য	একদিনও কামাই নেই	দু'দিন অনুপস্থিত

আরও অনেক পয়েন্ট ক্রমশ লিখে যেতে হবে, তাই কার্ডখানা সযত্নে নিজের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে হরিহর, এইভাবে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বিশ্লেষণ না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে চায় না সে। সেই শিক্ষাই সে পেয়েছে ইনস্টিটিউটে।

তারপর ব্যাপারটা কিছু দ্রুত ঘটে গিয়েছে। বন্ধু দিগন্ত সিন্‌হা বলে, "এই মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা অনেক ডিরেক্টর দীর্ঘসময় ধরে ঝুলিয়ে রাখেন। প্রথমে চাপা অনুরাগ, তারপর মাঝে-মাঝে ঝকঝকে প্রকাশ, তারপর একটি মাত্র পুরস্কারের জন্যে দুই নারীর টাগ-অফ-ওয়ার, ইতিমধ্যে খল নায়কের আবির্ভাব, নানা বিপদের উৎপত্তি, সাময়িক বিচ্ছেদ, সাময়িক দুঃখ এবং অবশেষে শেষদৃশ্যে পুনর্মিলন।"

হরিহরকে দিগন্ত বলেছে, "তোমার ব্যাপারটা খুব সহজ—একটা মিষ্টি ছোটগল্পের মতন। তুমি রত্না দত্ত অথবা শকুন্তলা সান্যাল এই সিদ্ধান্তটা কোল্ডস্টোরেজে ঠেলে দিয়ে আরও একটু সময় নিতে চাইছিলে। রত্নার ওই গানের টেপটাই ওর বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। গানগুলো বাড়িতে নিজের যন্ত্রে শুনে তুমি সুখ পাচ্ছিলে না, মাঝে-মাঝে বেসুরো ঠেকলেই বন্ধ করে দিচ্ছিলে। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছিলে এইভাবে যখন-তখন টেপ বন্ধ করে দেবার স্বাধীনতা তোমার চিরদিন থাকবে কি? তুমি আর টেপ করবে না, এই শর্তে কোনও মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না।"

দিগন্ত সত্যিই যে-কোনও ঘটনার সুন্দর সামারি করে। সে বলেছে, "তোমার টেলিফোনটাই তোমাকে বিপদে ফেলে দিল।

প্রায়ই অজিত ঘোষ বলে একটি যুবকের টেলিফোন আসতে লাগল শকুন্তলার জন্যে। অজিত ঘোষ এবং শকুন্তলাকে একদিন তুমি স্কুটারে যেতে দেখেছ। তাতেও তুমি দমতে না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে—তোমার প্রদর্শিত পথে শকুন্তলা একখানা কার্ড তৈরি করেছে। তাতে তোমার ও অজিত ঘোষের তুলনামূলক বিবরণ লেখা হয়েছে। সেই কার্ড দেখে তোমার মাথায় হাত দেওয়ার অবস্থা! তোমার ভয় হচ্ছে, প্রায় সব পয়েন্টেই তুমি ওই অজিত ঘোষের থেকে কম নম্বর পেতে চলেছ!"

"কিছু আসে যায় না তাতে। তোমার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন এম-বি-এ ব্যাচেলরকে জামাই করবার জন্যে অনেক বাড়িতে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। কিন্তু তুমি জিনিসটাকে অন্যভাবে নিলে। তুমি জীবনের কোনও প্রতিযোগিতায় হার মানতে রাজি নও। অজিত ঘোষ বলে কোথাকার কে একটা লোক তোমাকে হারিয়ে দেবে তা ভাবা যায় না। অতএব তুমি আচমকা প্রস্তাবের ক্যাচ তুলেছো এবং সজাগ শকুন্তলাও সে ক্যাচ সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিয়েছে। অজিত ঘোষ কোনও আঘাত হানবার আগেই তড়িৎগতিতে ডিসিশন নিয়ে ফেলেছ হরিহর।"

এর জন্য অবশ্য শকুন্তলাকে মূল্যও দিতে হয়েছে। চাকরিটা! অফিসে কারও সঙ্গে প্রণয় ভাল চোখে দেখা হয় না। তাই জলঘোলা হবার আগেই শকুন্তলা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, এবং আরও কয়েকমাস পরে বিয়ের কার্ড ছাপার পর ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে। অফিসের মেজকর্তা যথাসময়ে হরিহরকে ডেকে বলেছেন, "তুমি ব্যাপারটা মর্যাদার সঙ্গে ভালভাবেই ম্যানেজ করেছ—আমার কোনও সমস্যা বাড়াওনি।"

দেখা হল ; মন নিয়ে একটু পিংপং খেলা হল ; বিয়ে হয়ে গেল—চমৎকার মিষ্টি একটা গল্প। কিন্তু বিয়েতেই স্টোরিটা শেষ করতে চায় না দিগন্ত সিন্‌হা। বিয়ের তিন মাস পরেই—নিজের স্বামীকে শকুন্তলা নমিনেট করল হাজবেন্ড অফ দ্য ইয়ার প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় সব সাবজেক্টে নম্বর বসায় স্ত্রীরা। বিপুলবিক্রমে প্রথম হবার বিরল সম্মান লাভ করল হরিহর। হরিহরের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং শকুন্তলা তা সগর্বে দেখছে এই খানেই ফেড আউট করবে দিগন্ত সিন্‌হা। হাজার হোক আধুনিকা মেয়ের গল্প তো।

এই খানেই গল্প শেষ হতে পারত। যদিও হরিহরের দিদিমার ইচ্ছা আরও একটা পর্ব যোগ হোক। নাতবউয়ের কোলে একটি শিশুকে উপস্থাপিত না দেখে তিনি এই মরদেহ ত্যাগে উৎসাহী নন। কিন্তু এই 'ওষুধপালার' যুগে কে তাঁর মতো বৃদ্ধার ইচ্ছাপূরণ করবার জন্য উদ্যমী হবে?

দিগন্ত সিন্‌হা তার চলচ্চিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে যাই বলুক, আমাদের এই ছোটগল্প হরিহর-শকুন্তলার জীবনপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে।

হরিহর এখনও অফিসের কেষ্টবিষ্টু হয়নি। গাড়ি কেনার কথাই ওঠে না। স্কুটার কেনার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতেই শকুন্তলা সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল। সে এখন স্বামীর দৈহিক নিরাপত্তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। অজিত ঘোষের স্কুটারে পিলিয়ন রাইডার শকুন্তলার দৃশ্যটি হরিহর বিস্মৃত হয়নি, কিন্তু মধুযামিনীর রাত্রে এইসব বিষয় অবশ্যই আলোচনাযোগ্য নয়। তাছাড়া রত্না দত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যাঘাত আসতে কতক্ষণ? একটি মাত্র সুখবর, অফিসে জোর গুজব রত্না দত্ত ওই অজিত

ঘোষকেই বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাল ডিসিশন, হরিহর মনেপ্রাণে সমর্থন জানাচ্ছে। অজিত ঘোষ স্কুটারে চড়ে যতখুশি রত্না দত্তর বেসুরো গানের ক্যাসেট শুনুক, যা আনন্দের, শকুন্তলা এখন তার নিজস্ব। হরিহরের আশা, অফিসে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে শকুন্তলা তার মনোহরণ করেছিল, সেই একই নৈপুণ্যে হরিহরের ছোট্ট ফ্ল্যাট বিকশিত হয়ে উঠবে।

না, শকুন্তলার আর চাকরিতে মন নেই। মন দিয়ে ঘর-সংসার করার সুযোগ পেলে মেয়েরা এক কথায় মহামূল্য কেরিয়ারকে গঙ্গায় বিসর্জন দেয়।

তবে হরিহর বলে, অফিসের ফিলজফিগুলো বাড়িতে নিয়ে আসব আমরা। দু'জনেই আমরা মনে রাখব, আমাদের এই জীবন একের পর এক ডিসিশনের মালা ছাড়া কিছুই নয়। ম্যানেজমেন্টের নীতিগুলো মানলে, সংসারের এফিসিয়েন্সি বাড়বে, উৎপাদকতা বাড়বে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনার আগেই আমাদের আপতকালীন প্ল্যান তৈরি থাকবে। সেক্রেটারি হিসেবে যে-মেয়ে সব কথা মন দিয়ে শুনত, এবং নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলত সে ক্রমশই সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। সে মুচকি-মুচকি হাসে, কিন্তু পতিদেবতার কথার গুরুত্ব দেয় না। নির্দেশ না-মানলে অফিসে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, কিন্তু বউ তো ওয়ার্কম্যান নয়—চার্জশিট ওখানে অচল।

হরিহরের বক্তব্য : প্রত্যেক ফ্যামিলির একটা বাৎসরিক পরিকল্পনা থাকা চাই। এই বছরে আমরা কীভাবে কোথায় পৌঁছতে চাই? লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে আমাদের রণকৌশল কী? এবং যেসব সমস্যা আসবে তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত।

কোনও কথায় কান দেয় না শকুন্তলা। "ঈশ্বর যেমন চাইবেন

তেমন হবে"—দিদিমা কখন যে মেয়েটার মগজ ধোলাই করল।

হরিহর বলে, "ডিসিশন নেবার ব্যর্থতার জন্যেই যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে গেল। কে কোন কাজের জন্যে রেসপনসিবল তা কেউ জানে না, ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং ব্যর্থতার জন্যে তিরস্কার নেই। সামান্য একটু ম্যানেজমেন্ট রি-অরগানাইজেশনের অভাবে অমন চমৎকার একটা সামাজিক ব্যবস্থা দেশ থেকে দূর হয়ে গেল।"

শকুন্তলা বলেছে, "যারা সংসার চালায় তারা অফিস-চালকদের থেকে বোকা একথা ভেবো না। প্রত্যেক সংসারেই একটা পলিসি আছে। সেটা হল নিরাপত্তা। এবং সামর্থ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুখে থাকা।"

"চমৎকার!" শকুন্তলার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে খুব খুশি হয়েছে হরিহর। "কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর রণকৌশল কী?"

"সংসারটা অফিসের মতো যুদ্ধক্ষেত্র নয়। সুতরাং রণকৌশল নয়, এখানে কলাকৌশল। আগে লক্ষ্য সম্বন্ধে ডিসিশন দাও, তারপর কৌশল ঠিক করা যাবে।"

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝে, নতুন বউয়ের মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হয়ে হরিহর তার সবুজ সংকেত দিয়েছে। তারপরেই এসেছে বিপদ। সেই সংকট এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে শকুন্তলার নতুন রূপ দেখেছে হরিহর। এই শকুন্তলা একগুঁয়ে, রাগী এবং কোনওরকম আলাপ-আলোচনায় অনাগ্রহী।

সমস্যাটা শুরু হয়েছিল ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে আলোচনা থেকে। শকুন্তলা একদিন বলেছে ব্যয় সংকোচ এবং নিরাপত্তা দুই একই সঙ্গে পাওয়া সম্ভব।

শকুন্তলা কোথায় কোন ম্যাগাজিনে কী পড়েছে কে জানে? সে আবদার করে বলেছে, "তুমি আমার একটা কথা রাখবে বল?"

"সম্ভব হলে অবশ্যই রাখব," এছাড়া আর কী উত্তর হতে পারে?

"আমার গা ছুঁয়ে বল!"

"এ আবার কী ধরনের কথা! তুমি তো অফিসে ছিলে। আমার প্রতিশ্রুতি দিই, কিন্তু কখনও কারও গা ছুঁই না।"

শকুন্তলা এমনভাবে তাকাল যে হরিহর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। প্রেমের শেষ পর্বে, শকুন্তলা ছুটিতে যাবার আগের দিনে সে শকুন্তলার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়েছিল—শকুন্তলা তখনও একজন এমপ্লয়ি, রেজিগনেশন দেয়নি।

এক মুহূর্তের জন্যে গভীর দুঃখ হল হরিহরের। কেন সে অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে প্রেম করতে গেল, বাইরে তো কত বান্ধবী সন্ধানের সুযোগ ছিল।

যে-শরীর সম্বন্ধে এত আগ্রহ ছিল তা এখন স্পর্শ করতে ভয়! দিদিমা প্রায়ই বলতেন, শরীর ছুঁয়ে কোনও প্রতিজ্ঞা করার পরে তা না মানলে সে-শরীর নষ্ট হয়ে যায়।

শকুন্তলার মাথায় সর্বনাশা মতলব ঢুকিয়েছে এক জীবনবিমার দালাল। ইনসিওর বাড়াও এই প্রস্তাবে শকুন্তলা বলেছিল তাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়, এখন নতুন বিমা করার উপায় নেই। সেই শুনে ইনসিওর মামা বলেছেন, সম্পূর্ণ ভুল। যে টাকা সিগারেটে খরচ হয় তা দিয়েই মোটা টাকার বিমা হয়ে যায়।"

কথাটা শকুন্তলার সিরিয়াসলি নিয়েছে।

"সিগারেটে তোমার শরীর স্বাস্থ্যর ক্ষতি হচ্ছে। রাত্রে এক-একদিন তুমি কাশো।"

"সামান্য টনসিলের ধাত আছে।"

"ও মা! অফিসে তুমিই তো আমার টনসিল সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলে! নিজেরটা তো একবারও বলোনি।"

"তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি। করলে নিশ্চয় চেপে রাখতাম না। তোমারটা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই জন্যে যে বাবা-মায়ের দু'জনের টনসিল থাকলে ছেলেমেয়েদের টনসিল অবধারিত।"

"ও মা! তখন তো আমি সবে ঢুকেছি! কোথায় তখন জানাশোনা? মেয়ে দেখলেই কি ছেলেদের মাথায় বিয়ের মতলব জাগে?"

অপমানটা হজম করতে গিয়ে মেজাজটা আরও গরম হয়ে উঠেছে হরিহরের। নতুন ইনসিওর সে করবে, কিন্তু সামনের বছরে, মাইনে বাড়ার পর। নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ সিগারেট। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়েছে। বউয়ের চাপে পড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে রাজি নয় হরিহর। দিগন্ত সিন্‌হা বলেছে, "ছেলেদের ব্যক্তিত্ব দুমড়ে ফেলবার জন্যে বিয়ের প্রথম পর্বে এরকম চাপ আসে। ফাঁদে পা দিয়েছ তো মরেছ। আমার বউও সিগারেট ছাড়ার জন্যে চাপ দিয়েছিল, মান অভিমানও করেছিল—এখন মেনে নিয়েছে। নিজেই মাসকাবারী সিগারেটের ঠোঙা কিনে আনে।"

হরিহর এই হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে নতুন সমাধানের সন্ধান করেছে। তার সামনে তিনটি পথ :

১। কারও কথায় কান না দিয়ে ধূমপান চালিয়ে যাওয়া।

২। স্ত্রীর প্রতি কিছুটা সম্মান দেখানোর জন্যে স্মোকিং-এর মাত্রা কমিয়ে দেওয়া।

৩। স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সিগারেট বন্ধ করা।

মধ্যপন্থা সম্পর্কে শকুন্তলার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। "আমার বাবা বলতেন, সিগারেট ছাড়া যায়, কিন্তু কমানো যায় না! হয় এসপার না-হয় ওসপার।"

ব্যাপারটা যে সত্যি তা হরিহর নিজেও জানে। কিন্তু চাপে পড়ে সে সিগারেট ছাড়বে না। ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা উচিত শকুন্তলার। পুরুষমানুষের ব্যক্তিত্বে ছায়া পড়লে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মেজাজ সপ্তমে উঠেছে। শকুন্তলা চাপ দিয়েছে, "তোমার মুখের কথায় আমি অমন চাকরি ছেড়ে গৃহবন্দী গৃহবধূ হলাম, আর তুমি সামান্য সিগারেট ছাড়তে পারছ না?"

এবার ত্রিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে শকুন্তলা—ওর জীবনবিমা মামার সামনেই তর্ক হোক, উনি সব শুনে যা সিদ্ধান্ত দেবেন...আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল হরিহর, অফিসে যাবার আগে বলেছিল, "এ-বাড়ির যা-কিছু ডিসিশন তা আমি নেব, নট এনি তৃতীয় পক্ষ।"

আরও কিছু অপ্রিয় কথা শুনিয়েছিল হরিহর। তারপর অফিসে এসে ব্যাপারটা পর্যালোচনা করেছে হরিহর। সিগারেট নিয়ে বউয়ের সঙ্গে এই টানাপোড়েন, অথচ দিদিমার ধারণা ছিল, "অফিসের মেয়েরা সবাই সিগারেট খায়। হ্যাঁরে, বউ তোর সামনে ভঁস ভঁস করে ধোঁয়া ছাড়বে, তা তুই দেখতে পারবি?"

এরপরে বিকেলে দুঃসংবাদ এসেছে।

সেক্রেটারি বলল, "মিসেস সান্যাল-হালদার ফোন করেছিলেন।"

ওহো ওই ব্যাপারটা বলা হয়নি। কুমারী বয়সের টাইটেলটা সম্পূর্ণ বিসর্জন না-দিতে হরিহরই উৎসাহ দিয়েছিল শকুন্তলাকে।

"তোমার আত্মীয়স্বজনরা কিছু ভাববে না তো?" এই প্রশ্নের উত্তরে তাদের সামলাবার দায়িত্ব হরিহর নিজেই নিয়েছিল।

নতুন সেক্রেটারি মিসেস বিশ্বাস একজন ডাইভোর্সি। বেশ ফলাও করে বললেন, "মিসেস সান্যাল-হালদার মেসেজ দিয়েছেন তিনি দুপুরেই বংশবাটীতে বাপের বাড়ি যাচ্ছেন। নিজের ইচ্ছেতেই তিনি যাচ্ছেন।"

শরীরটা শির-শির করে উঠল হরিহরের। ঝগড়াটা একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছিল।

কিন্তু তাই বলে এইভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া! হরিহর জানে আমেরিকান উপন্যাসে, অফিস কর্মীদের এই আড়াইটে থেকে তিনটে সময়টা খুবই বিপজ্জনক। এই সময়েই সুন্দরী বউদের কাছ থেকে অফিসে টেলিফোন আসে—"জন, আমি বোরড ফীল করছি, আমি একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমি চললাম। তোমার ঘরের চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রইল।" দেখে-দেখে বারবেলাটা মেয়েরা কেন ঘর ভাঙবার জন্যে নির্বাচন করে তা কেউ জানে না।

"আর কিছু? কবে ফিরছেন?"

না তেমন কিছু ইঙ্গিত মিসেস বিশ্বাসের কাছে নেই। মিসেস বিশ্বাসের মুখে যেন স্যাটিসফ্যাকশনের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

ফ্ল্যাটের একটা চাবি হরিহরের কাছে থাকে। কিন্তু যা ভয় পেয়েছে তাই। দ্বিতীয় চাবিটা শকুন্তলা পাশের ফ্ল্যাটেই রেখে গিয়েছে।

যে-রিপোর্টে আরও রাগ হল—ওই হারামজাদা ইনসিওর মামাটাই দুপুরবেলায় এসে ট্যাক্সিতে শকুন্তলার ব্যাগ তুলেছে।

না, ফোঁস আছে শকুন্তলার। জামাকাপড় নিলেও, গহনাগাঁটি

কিছুই নেয়নি সঙ্গে। কোনও চিঠিপত্রও নেই টেবিলে। আমেরিকান মেয়েরা এই সময় একটা লম্বা ডেজারসন লেটার লেখে—কেন সে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। কাকে ভালবাসছে তারও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সন্ধেবেলায় দিগন্ত সিন্‌হা বিনা নোটিসে বাড়িতে উপস্থিত। তাকে ব্লাফ দিতে হল। "ও একটু বাপের বাড়ি গিয়েছে।"

দেহের ভাষা বুঝতে পারে বোধ হয় দিগন্ত। "এখনও তো চব্বিশ ঘণ্টা হয়নি। এরই মধ্যে বিরহবেদনার কালো ছায়া পড়ছে মুখে!" দিগন্ত বলেছে, "প্রধান-প্রধান সিদ্ধান্তগুলো কে নেবে এইটাই পৃথিবীর সমস্ত সংঘাতের মূলে রয়েছে। সংসারেও তাই। আমি এখন সহজ পথ বের করেছি—সমস্ত সিদ্ধান্তশক্তি আমার গৃহিণীকে দিয়েছি, আমি হুকুমের চাকরমাত্র। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকরী হতে দিই না, শেষ মুহূর্তে স্যাবোটেজ করি। যেমন ধরো গৃহিণীর সিদ্ধান্ত : সিগারেট বন্ধ করো। আমি প্রথমে মেনে নিলাম, তা ওকে একটু-আধটু সিগারেটের সুখ নিতে উৎসাহ দিলাম। এখন অসুবিধে নেই। রাত্রে শোবার আগে আমরা দু'জনে দুটো শ্বেত-কাঠিকা উপভোগ করি।" না, এসব কল্পনাও করতে পারবে না, হরিহর ভেবেছিল। নিজের স্ত্রীও সিগারেট ধরবে, মদ ধরবে ভাবা যায় না। দিদিমা, মা, কাকীমা, দিদি, মাসিমা অনেকগুলো পবিত্র মুখ দেখতে পেল হরিহর।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। পরের দিন অফিসে এসে একটা মাঝারি সাইজের চিঠি হাতে লিখে ডাকে ফেলেছে হরিহর। যেন দু'জনের মধ্যে কিছুই হয়নি।

দু'দিন কোনও সংবাদ নেই। মিসেস বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করেছে,

"আমার জন্যে কোনও মেসেজ?"

"কোনও মেসেজ আমি ফেলে রাখি না, মিস্টার হালদার। হাউ ক্যান আই?"

দুপুরে অনেক কথা ভেবেছে হরিহর।

কাছাকাছি বাপের বাড়ি এমন মেয়ে বিয়ে করা খুব বোকামি। আরও ভুল হয়েছে, ওয়াকিং গার্ল বিয়ে করা। চাকরি ছাড়লেও ওদের ফোঁস যায় না। কিন্তু এই অবস্থায় কী কী হতে পারে?

হরিহর নিজের কায়দায় শকুন্তলার সিদ্ধান্ত তালিকার কার্ডটা মানসচক্ষে দেখতে লাগল :

১। স্বামীর কাছে চুপি-চুপি ফিরে যাওয়া। স্বামী তো একটা চিঠি লিখেইছে।

২। কোথাও আবার চাকরি জোগাড় করা।

৩। কোনও পুরনো পুরুষবন্ধুকে খুঁজে বের করা। দুপুরে তো অঢেল সময়।

৪। আত্মহত্যার চেষ্টা করা, যাবার আগে লিখে যাওয়া স্বামীর নির্দয় ব্যবহারেই...

না, আর ভাবতে পারছে না হরিহর। তিন এবং চার নম্বর সম্ভাবনা তাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কী করে ডিসিশন নিতে হয় তা তো স্বামীর কাছ থেকে ভালভাবেই শিখে নিয়েছে শকুন্তলা। আমেরিকান মেয়েরা চার নম্বরের কথা ভাববেই না—তারা স্বামীকে কলা দেখিয়ে তিন নম্বরটাই উপভোগ করবে। এ-দেশের মেয়েরাও এই সব ট্রিক শিখছে, কিন্তু খবরের কাগজের পাবলিসিটির দয়ায় ওই চতুর্থ সিদ্ধান্তটাই মেয়েদের মাথায় এসে যায়। কিন্তু হরিহরেরও আত্মসম্মান আছে। সে তো বলেছে, বছরখানেকের মধ্যেই নতুন

বিমা করার মতো টাকা সে পাবে।

মিসেস বিশ্বাস, খবর এনেছেন। আঃ কী অপয়া এই বিচ্ছিন্ন-মহিলা! শকুন্তলা যখনই ফোন করেছিল তখনই হরিহর ঘরে থাকে না। পাল্টা ফোন করারও উপায় নেই, ওদের বাড়িতে ফোন নেই। পোস্টাপিসে এসে ওরা যাকে খুশি ফোন করতে পারে, কিন্তু অন্যপক্ষের সে সুবিধে নেই।

না, মিসেস সান্যাল-হালদার আর ফোন করবেন না, কিন্তু তিনি তাঁর মেসেজ দিয়েছেন। মেসেজটা দেখে মাথাটা ঘুরে উঠল হরিহরের। দু'তিনবার মেসেজটা পড়ল সে, এবং মাথাটা আরও ঘুরতে লাগল।

এমন তাজ্জব রিকোয়েস্ট আগে কখনও স্ত্রীর কাছ থেকে পায়নি হরিহর। "আমার জন্যে অবশ্যই এক প্যাকেট সুরসুন্দরী মার্কা বিড়ি যতীনবাবুর হাতে পাঠাবে।" যতীনবাবু এই অফিসেই কাজ করেন—বংশবাটী থেকে নিত্যযাত্রী।

শাড়ি না, ব্লাউজ না, গয়না না, স্নো-সাবান-পাউডার নয়—স্রেফ বিড়ি। তাও স্ত্রী চেয়ে পাঠাচ্ছেন, এর থেকে লজ্জার কী থাকতে পারে?

সমস্ত ব্যাপারটা না বলে দিগন্ত সিন্‌হার সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করল হরিহর। "কোন অবস্থায় একটি মেয়ে স্বামীর কাছে বিড়ি চাইতে পারে?"

"হয়তো স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে। তুমি সিগারেট ছাড়লে না, আমি বিড়ি ধরছি। স্বামীর উচিত ছিল স্ত্রীকেও সিগারেট ধরতে উৎসাহ দেওয়া।"

সিকিউরিটি অফিসার, রিটায়ার্ড এ-সি মিস্টার চোংদারকে

ফোন করল হরিহর। তিনি বললেন, "হয়তো দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস আছে মহিলার।"

"কিন্তু তাহলে স্বামীর কাছে চেয়ে পাঠাবেন কেন? বিড়ি তো সর্বত্রই পাওয়া যায়।"

"হয়তো পার্টিকুলার ব্র্যান্ড অফ বিড়ি, যা সর্বত্র পাওয়া যায় না।"

সন্তুষ্ট হতে পারল না হরিহর। অফিস আর্কিটেক্ট দেবনাথকে জিজ্ঞেস করল।

"মেয়েরা আজকাল সিগারেট ছেড়ে বিড়ি খাচ্ছে, মিস্টার হালদার। অ্যাজ এ প্রোটেস্ট। যা পুরুষরা পছন্দ করে না তাই মেয়েরা করবে—তবেই না প্রতিবাদ।"

ল' অফিসার মিস্টার সাহাকে জিজ্ঞেস করল হরিহর।

"ইন্টারেস্টিং লিগ্যাল পয়েন্ট, মিস্টার হালদার। স্বামী যদি ননস্মোকার হন এবং স্ত্রী যদি রেগুলার বিড়ি খান তাহলে বোধহয় নিষ্ঠুরতার অভিযোগ ডাইভোর্স মামলা আনা যেতে পারে। ভোপাল হাইকোর্টের একটা ডিসিশন ওই ধরনের বোধ হয় আছে।"

"যদি স্বামী সিগারেট স্মোকার হন?"

"তাহলে একটু অরডিগনামের মিস্টার ডি কে বাসুকে পরামর্শ করে দেখতে হয়।"

না, আর ভাবতে পারছে না হরিহর। এদিকে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেই বিড়ি কিনতে বেরুল হরিহর। "সুরসুন্দরী মার্কা বিড়ি পাঁচ ছ' প্যাকেট কিনে নিন", পরামর্শ দিল বিড়িওয়ালা। "পরে আফসোস করবেন। সাপ্লাই পাবেন না।" লোকটি পরামর্শ দিল। কিন্তু ওসব কথা কানে তুলল না হরিহর। লোকটা কি হরিহরের জামাকাপড় দেখে বুঝতে পারছে না, সে রেগুলার বিড়ির খরিদ্দার

নয়? নেহাত বউয়ের হুকুম তাই এই পথে নামতে হচ্ছে হরিহরকে, সামস্ত জীবনের সে কখনও বিড়ি কেনেনি। হা ঈশ্বর, কেন এই অফিসের ওয়ার্কিং গার্ল বিয়ে করার দুর্মতি হল?

লজ্জা এড়াবার জন্যে বিড়িটা স্পেশ্যালভাবে প্যাক করেছে হরিহর। চিঠি লেখেনি, কিন্তু একখানা ছাপানো স্লিপ জড়িয়ে দিয়েছে—উইথ দ্য কমপ্লিমেন্টস্ অফ হরিহর হালদার। বংশবাটী ডেলিপ্যাসেঞ্জার যতীনবাবু যথাসময়ে প্যাকেট সংগ্রহ করে বিদায় নিয়েছেন।

সমস্ত রাত সুরসুন্দরী বিড়ির স্বপ্ন দেখেছে হরিহর। হিন্দী সিনেমার কু-রমণীর মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে শকুন্তলা। বিছানায় বসে একের পর এক বিড়ি খেয়ে চলেছে সে।

ভোরবেলার দৃশ্যটা আরও ভয়াবহ। হরিহর সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিচ্ছে শকুন্তলার দিকে, আর বিড়ির ধোঁয়া স্প্রে করে প্রতিশোধ নিচ্ছে শকুন্তলা।

সমস্ত রাতের ক্লান্তি সঙ্গে নিয়ে হরিহর আবার অফিস গিয়েছে। ডেসপ্যাচ সেকশনের কান্তিবাবু ধার্মিক লোক। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছে হরিহর যদিও ব্যাপারটা যে তারই, জানিয়ে। কান্তিবাবু বললেন, "দেখুন হয়তো পিতৃভক্ত কন্যা, বাবা হয়তো বিড়ি খেতে ভালবাসেন।"

সে চান্স নেই, শ্বশুর আগেই গত হয়েছেন। শাশুড়ী বিড়ি ধরেছেন, ভাবতেই পারা যায় না। মার্কেটিং-এর মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছে হরিহর। "আমিও শুনছি বটে, বিড়িটা মেয়েমহলে প্রিয় হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে আমেরিকান মার্কেটটা আমাদের ক্যাপচার করতে হবে—যেসব ইন্ডিয়ান মহিলা বিড়ি

ধরেছেন প্রমোশনের কাজে তাঁরা লেগে যাবেন।"

বিকেলবেলায় আবার মেসেজ সংগ্রহ করেছেন মিসেস বিশ্বাস ফ্রম মিসেস সান্যাল-হালদার। হরিহরের সন্দেহ হচ্ছে শকুন্তলা ইচ্ছে করেই স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না, শুধু মেসেজ রেখে দেয়।

মেসেজটা মোটেই সুবিধের নয়। আজ দু'প্যাকেট সুরসুন্দরী বিড়ি আর্জেন্টলি পাঠাতেই হবে।

সমস্ত শরীরটা জ্বলছে হরিহরের। একটা প্যাকেটে অন্তত গোটা চল্লিশেক বিড়ি থাকে—কয়েক ঘণ্টায় তা উড়িয়ে দেওয়া! কিন্তু তর্কের সময় কোথায়? আবার বিড়ি কিনে আনল হরিহর নিজেই। আজও লোকটা বলল, পরে আফসোস করবেন, আরও কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে যান। লোকটাকে দোষ দেওয়া যায় না, পরপর দু'দিন হরিহরকে বিড়ি কিনতে দেখা গিয়েছে।

পার্টটাইম মেডিক্যাল অফিসার ডঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলেছে হরিহর। "একজন মানুষের পক্ষে প্রতিদিন ক'টা বিড়ি খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত?"

"মেয়েদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক—বিশেষ করে প্রেগন্যান্সির সময় তো..."

ফোন নামিয়ে রাখল হরিহর। আবার প্যাক করল বিড়ি, সঙ্গে কমপ্লিমেন্ট স্লিপ। একবার ভাবল লেখে, দয়া করে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনো না।

কিন্তু মনে পড়ে গেল সাহিত্যিক নগেন পালের বিখ্যাত কথা—"মেয়েরা যখন প্রতিশোধ নিতে চায় তখন তাদের আটকাবার চেষ্টা বৃথা। মেয়েরাই একমাত্র জীব, যারা নিজেদের ভাল-মন্দ বোঝে না।"

তৃতীয় দিনে আর বিড়ির অর্ডার আনবে না, মনের মধ্যে এমন একটা ক্ষীণ আশা ছিল। মা কালীর কাছেও ছোট্ট একটা প্রস্তাব রেখেছে হরিহর। আর যদি বিড়ির অর্ডার না আসে তাহলে একমাসের সিগারেট খরচটাই ক্যাশে জমা দেবে ঠনঠনে কালীতলায়।

কিন্তু মায়ের প্রভাব ক্রমশই আধুনিকা মহিলাদের ওপর ক্ষীণ হচ্ছে। আবার মেসেজ এসেছে দু'প্যাকেট সুরসুন্দরী বিড়ির জন্য।

দাঁতে দাঁত ঘষছে হরিহর। পার্সোনেল বিভাগের বিহেভিয়রাল সায়েনটিস্ট ডঃ দে-বিশ্বাসের সঙ্গেও পরামর্শ করেছে সে। "অফিসে, কারখানায় বিড়ির সঙ্গে যা চলেছে তা চিন্তার কারণ। বিড়িটা একটা নির্দোষ আস্তরণ, যার আড়ালে থাকতে পারে এনিথিং—গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, আফিম, কোকেন, এটসেটরা। এর থেকে মদ অনেক ভাল।"

ডঃ দে-বিশ্বাস বলছেন, "কর্মীরা আত্মঘাতী হবার জন্যে কর্তাদের প্রতি ঘৃণায় বিড়ি ধরতে পারে।" খুব লজ্জা লাগছিল, কিন্তু আজও নিজেই বিড়ি কিনে আনল হরিহর। লোকটা আজও মাল ফুরিয়ে যেতে পারে, দাম বাড়তে পারে এইসব ইঙ্গিত দিয়ে কয়েকটা বাড়তি প্যাকেট নেবার পরামর্শ দিল। কিন্তু লোকটা জানে না, আজই হরিহরের শেষ বিড়ি কেনা। হোয়াটেভার হ্যাপন্‌স, এই অধমকে আর কোনওদিন বিড়ি কিনতে দেখবে না।

বিড়িটা আজ প্যাক করল না হরিহর।

যতীনবাবু যথারীতি দেখা করতে এলেন।

তাকে ফিরিয়ে দিল হরিহর। সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা অপদার্থ কাপুরুষদের ধর্ম। জীবনটা একাধিক সিদ্ধান্তের মালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটুকরো কাগজ কাছে টেনে নিল হরিহর। বেপরোয়া বেহায়া হয়ে উঠছে শকুন্তলা সান্যাল-হালদার। স্বামী হিসেবে প্রশ্রয়ের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম হতে চলেছে। এবার যেসব পথ সামনে রয়েছে তার তালিকা করে ফেলল হরিহর।

১। কোনওক্রমে শকুন্তলাকে সর্বনাশের পথ থেকে সরিয়ে আনা। (লাল কালিতে মন্তব্য)—কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? যে মহিলা প্রতিদিন নিজের সর্বনাশ করছেন?

২। কিছু না বলে, শকুন্তলাকে ডাইভোর্সের প্রস্তাব দেওয়া। (লাল কালিতে মন্তব্য)—আদালত কি বিড়ির সর্বনাশা অবক্ষয়ের দিকটা বুঝবে? না আরও কারণ সংগ্রহ করতে হবে?

৩।শকুন্তলার ঠোঁটের বিড়ি হঠাৎ কেড়ে নিয়ে মুখে অনেকগুলো জ্বলন্ত ছ্যাঁকা দেওয়া।

৪। ওকে খুন করা, বিড়ির মধ্যেই কোনও বিষ পুরে দিয়ে।

৫। কিছু না করা, প্রতিদিন যত খুশি চায় তত বিড়ি পাঠিয়ে দেওয়া, যাতে ওর লজ্জা হয়।

সিদ্ধান্ত নেবার আগে পাঁচনম্বর পথটা ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল হরিহর। চার নম্বরটাও কাটল হরিহর। চেইন রি-অ্যাকশনে চাকরিটাও যাবে।

তারপর দিগন্ত সিন্‌হাকে ফোন করল হরিহর। "আজ একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে। আমি বংশবাটী যাচ্ছি আজ।"

"খুবই আনন্দের কথা। গিন্নীর সঙ্গে মিটমাট করে সোজা আমাদের বাড়িতে চলে এসো ফর ডিনার।"

"না ব্রাদার, আজ ডিনার নয়। তবে ভীষণ একটা কিছু ঘটতে চলেছে যা তোমার পুরনো চিত্রনাট্যকে নষ্ট করে দেবে। তুমি

বাড়িতে থেকো, আমি যেখান থেকেই হোক ফোন করব।"

খুব ভয়ে-ভয়ে ছিল দিগন্ত সিন্‌হা। নিজে এবং গৃহিণী একই সঙ্গে সিগারেট টানছেন অথচ উত্তেজনা কমছে না। কিছু না একটা করে বসে হরিহর। পুলিশ, আদালত এসবের হাঙ্গামা কে পোয়াবে?

সন্ধ্যা আটটায় হরিহরের টেলিফোন। "ব্রাদার, আমরা দু'জনেই তোমার ওখানে ডিনারে আসছি, ভাল-মন্দ খাইয়ো। ও আমার সঙ্গে ফিরে এসেছে, এখন স্নান ঘরে ঢুকেছে সেইসময়ে তোমায় ফোন করছি। আমি ভাই কথা দিয়েছি ওকে এবং ইতিমধ্যেই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। ট্রেনে একটাও খাইনি।"

"আর ওই সুরসুন্দরী বিড়ির ভয়াবহ ব্যাপারটা?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল দিগন্ত।

"সুরসুন্দরী বিড়ির কথা বলছ তো। ওমা, বউয়ের মুখে বিড়ির ছ্যাঁকা দেবার প্ল্যান করে গিয়ে দেখি, বিড়িগুলো টেবিলে রেখে বউ একমনে ফর্ম বোঝাই করছে। প্রতিটি সুরসুন্দরী বিড়ির লেবেল ফেরত পাঠালে প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা। লেবেলের সঙ্গে পাঁচটা শব্দে লিখতে হবে 'আমি সুরসুন্দরী বিড়ি পছন্দ করি, কারণ...'

গিন্নি বলল, "দেখো না, এখানের বাজার থেকে সব সুরসুন্দরী উধাও, তাই তোমাকে রিকোয়েস্ট করতে হল। যদি লাখ টাকা পুরস্কার পাই তাহলে সারাদিন ধরে যত ইচ্ছে সিগারেট তুমি খেতে পারবে সুদের টাকায়।"

"তারপর?"

"তারপর আমি দেখলাম, প্রতিটি বিড়ি অক্ষত। শুধু লেবেলগুলো নেই। আমার চোখে জল।"

"তখন তুই কী করলি?"

"আমি কাঁদতে-কাঁদতে শকুন্তলাকে প্রমিস করলাম আমি আর কখনও স্মোক করব না। তুমি এখনই বাড়ি চলো।"

"বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত" এই বলে দিগন্ত সিন্‌হা সানন্দে টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

বাল্মীকি কেন মহাভারত লিখতে রাজি হলেন না?

'এক কর্ম হইতে সর্বদাই আর এক কর্মের উৎপত্তি', আমার কুষ্ঠিতে এ খারাপ ইঙ্গিতটি আছে জেনেও কিছুকাল আগে আই-আই-টি কানপুর তথা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে দু'রাত যাপনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

মহা নামকরা জায়গা এই কানপুর আই-আই-টি। ছাত্র হিসেবে এখানে প্রবেশ করতে হলে সাতজন্ম তপস্যা করাও এমন কিছু বেশি নয়। সোনার সঙ্গে সোহাগা মিশিয়ে এই কর্মশালায় গিনি সোনার ঝকঝকে গহনা তৈরি করা হয়, তারপর হানড্রেড পার্সেন্টি বিদেশে এক্সপোর্ট করে দেওয়া হয়, কারণ সোনার গহনা চায় হিরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে এবং সেই ফিনিশিং টাচ্ সম্ভব কেবল মার্কিন মুলুকের বিদ্যাস্থানগুলিতে। এই বাসনার নাম মণিকাঞ্চন বাসনা— যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বলা হয়েছে মণির মণিত্ব+কাঞ্চনের কাঞ্চনত্ব=সামথিং বাড়তি, যা মণিতেও নেই, কাঞ্চনেও নেই।

কানপুর ক্যামপাসের অতিথিশালায় আচমকা আমাকে দেখে আঁতকে উঠলেন ব্যান্ডোদা। আমারও বক্তব্য : "হ্যালো ব্যান্ডোদা! কী মধুর বিস্ময়! আপনি এখানে!"

ব্যান্ডোদা আমাকে দেখে বিস্মিত, তবু মধুরভাবে নয়। তিনি জানেন ছাত্র হিসেবে আমার ট্র্যাক রেকর্ড কীরকম, সাত কেন, সাতাশ অথবা সাতাত্তর জন্ম চেষ্টা করলেও আই-আই-টি

কানপুরের ছাত্রত্ব সৌভাগ্য আমার কপালে জুটবে না। ব্যাভোদা বললেন, "আগে শুনি, তুই এখানে কী করে ইনভাইটেড হলি!" ব্যাভোদার আশঙ্কা, আই-আই-টি কানপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে! মাছিকে ঢুকতে হলেও এখানে ডক্টরেট ডিগ্রি দেখাতে হয়।

আমার সঙ্গে ছিলেন আই-আই-টি খড়গপুরের প্রধান অমিতাভ ঘোষ। তিনিই আমাকে বেইজ্জতির হাত থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে। প্রথমেই ব্যাভোদাকে স্বাগতম্ জানিয়ে তিনি বললেন, "বেভারলি হিল্স্ থেকে কবে এলেন? বিশ্বময় ম্যানেজমেন্ট পরামর্শ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ আমরা আই-আই-টি খড়গপুরে আপনাকে একবারও পেলাম না।"

"ডাকলেই পাবেন আমাকে। বঙ্গ আমার, জননী আমার! শ্বেতাঙ্গ যবনরা আমাকে ডলার অনেক দেয়, কিন্তু ভালবাসা দেয় দেশের ছোকরারা," এই বলে ব্যাভোদা আমার দিকে চোখের ইঙ্গিত দিলেন। "আমার সম্বন্ধে ভুলভাল লেখে, কিন্তু ওই লেখার জোরেই বাঙালিরা এখন আমাকে চেনে, এইটাই আনন্দ।"

কানপুর গেস্ট হাউসের ডাইনিংরুমে আমাকে এবার ব্যাভোদা সর্বসমক্ষে নিগৃহীত করতেন, তার ওয়ান পয়েন্ট এজেন্ডা হত, কী করে এই পবিত্র বিদ্যাকেন্দ্রে আমার অনুপ্রবেশ ঘটল? অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ সাহস অবলম্বন করে অতিথিকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, "অনেকদিন ধরে রিকোয়েস্ট করে তবে এবার শংকরবাবুকে পাওয়া গিয়েছে। উনি মুখ খুলতে রাজি হয়েছেন, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের যৌথসভায়!"

"অ্যাঁ!" একটা কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইছিল

ব্যান্ডোদার কণ্ঠ থেকে, কোনওক্রমে ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলে নিলেন। ব্যান্ডোদা এসেছেন, রোবোটিক্‌স বিভাগে, কীসব শলাপরামর্শ দিতে। যেসব যন্ত্রশিশুর জন্ম হয় এই প্রসূতিআগারে তাদের কী করে রোজগেরে যুবকে পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে গোপন পরামর্শ দেওয়াই এবার তাঁর কাজ। রোবোটিক্‌স-এর নাকি বিরাট ভবিষ্যৎ, একদিন ইন্ডিয়া এর থেকে টুপাইস অর্জন করতে পারবে অতিসহজে। কারণ দুটো হাত নিয়ে জন্মালেও ধনী দেশের মানুষ আজকাল অনেক কাজ আর করতে চাইছেন না। ধনী দেশগুলোর কর্তারা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছেন। অপরের শ্রম চাইলেও অন্য দেশের শ্রমিককে তাঁরা ঘরে ঢুকতে দিতে চান না; কী করে দুটি উদ্দেশ্য একই সঙ্গে সফল করা যায় তার জন্যেই ব্যান্ডোদার মতন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বহুমূল্যে ক্রয় করা হচ্ছে।

আমার ব্যাপারটা শুনে ব্যান্ডোদা একই সঙ্গে দুঃখ ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। "আনন্দ এই জন্যে যে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি গুরু এবং শিষ্যরা নিজেদের স্পেশালাইজেশনের বাইরেও যে বিরাট এক সৃষ্টির জগৎ রয়েছে তার সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছেন। আর দুঃখ এই জন্যে যে তোর মতন একজন লোক ছাড়া আর কাউকে পেলাম না!"

এরপর অবশ্য অমিতাভ ঘোষকে ব্যান্ডোদা বললেন, "মেঘে-মেঘে ওর বয়সও হচ্ছে, বইও লিখে চলেছে! এতগুলো বই যে লোক লিখেছে তাকে নেমন্তন্ন না করে আপনাদের উপায়ও নেই!"

আমি বললাম, "ব্যান্ডোদা, যারা বলে বাংলা লেখকদের দৌড় আসানসোল পর্যন্ত, তাদের মুখের ওপর যোগ্য জবাব দেবার জন্যেই আমি কানপুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি!"

আমার দুটো বক্তৃতার বিষয় শুনে ব্যান্ডোদা ফিক করে হাসলেন। বললেন, "খুব খুশি হলাম, তুই বক্তৃতার শিরোনামেই নিজের অবস্থাটা স্বীকার করে নিয়েছিস—'কজন মফস্বল লেখকের জন্মকথা!' প্যারিসেও তোর বই বিক্রি হয়, সেই চান্স নিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক লেখক বলে চালিয়ে দিলেও লোকে কিছু বলতে পারত না!"

দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয়ে ব্যান্ডোদা আরও মজা পেলেন। "গল্পলেখক ও সিনেমা ডিরেক্টরের প্রেম ও মন কষাকষি সম্পর্ক!' এটা জমলেও জমতে পারে, তবে বক্তৃতাটা রুদ্ধদ্বার কক্ষে করিস, যাতে বিপদে পড়ে না যাস!"

আমি একটু আমতা-আমতা করছি, খোদ আই-আই-টি কানপুরে লেকচার দিতে আসাটা আমার পক্ষে একটু দুর্বিনীত হয়ে গিয়েছে। এইভাবে ব্যান্ডোদার কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাব এটাও ভাবতে পারিনি। বললাম, "ব্যান্ডোদা, এক কর্ম থেকে আরেক কর্ম ; এক সুযোগ থেকে আরেক সুযোগ কখন কুষ্ঠির খেয়ালে এসে যায় তার ঠিক নেই। আপনার কুষ্ঠিতেও তো ওই একই ওয়ার্নিং রয়েছে!"

ব্যান্ডোদা বললেন, "একসময় ওটা ছিল সৌভাগ্যের লক্ষণ! কলা বেচার পরে রথ দেখাও হয়ে গেল! এখন সারা দুনিয়া এই দুমুখো নীতির বিরোধী, এখন আমরা সর্বত্র বলি, ফোকাস, ফোকাস! একটা জায়গায় আলো মারো, ভাবো পৃথিবীতে আর কিছু নেই!"

"আপনার চিন্তাধারা ও কথামৃতের সঙ্গে আমরা শংকরবাবুর লেখনীর মাধ্যমে পরিচিত।" বললেন অমিতাভ ঘোষ।

"যে যত ভুলভাল লেখে বাংলার বধূরা তাকে তত পছন্দ করে! ওইটাই আমার চিন্তা! ওই প্রত্যেক বইতে এবার থেকে একটা পরিশিষ্ট লিখে দেওয়া আমার কর্তব্য। ওর প্রকাশকের অবশ্য তাতে প্রবল আপত্তি, কারণ সাবধানী সাবধানী সত্যদর্শী লেখক হিসেবেই বাজারে ওকে প্রচার করা হয়েছে!"

অমিতাভ ঘোষ ভাবলেন, এটাও ব্যাম্ভোদার রসিকতা। কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে জানি ব্যাম্ভোদার দুঃখ। একালের বাঙালি লেখকরা তেমন খোঁজ করে কলম ধরতে চায় না। এখানকার গোয়ালাদের দুধে জল আর লেখকদের লেখায় ভাঁওতা। দুটোই আর বেশিদিন চলবে না, এইটাই ব্যাম্ভোদার সাবধান বচন।

রাত্রিবেলায় নির্দিষ্ট সময়ে সান্ধ্য আহারপর্ব শেষ করে শুয়ে পড়েছি, এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। স্বয়ং ব্যাম্ভোদা বিনা নোটিসে উপস্থিত।

সন্ধ্যায় তিনি আমার বক্তৃতা শুনেছেন, কিন্তু আড়ালে থেকে, কারণ আমাকে নার্ভাস করে দিতে চাননি। ব্যাম্ভোদা উৎসাহ জোগালেন, "এখানকার পণ্ডিতগুলো সায়েবি ধরনের, নিজেদের সবজান্তা মনে করেন না। এঁরা বোঝেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত শেষপর্যন্ত যে একই লক্ষ্যর দিকে ছুটে যায় তার নাম সৃষ্টি। কোনও একটা সময়ে সমস্ত সৃষ্টি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, সেই জন্যেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি সাহিত্যকে, সাহিত্যের সৃষ্টি বিজ্ঞানকে বুঝতে চায়। জানতে চায় কে কোন পথে অভীষ্টসিদ্ধি করবে?" ব্যাম্ভোদা মজা করলেন, "গাইয়ে বাজিয়ে লিখিয়েদের একটা বিশেষত্ব এরা একলা পথ হাঁটে, এদের লক্ষ্য

করলে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এমন সব সত্যকে খুঁজে পায় যা আসল লোকটিও জানে না।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল, তুই এর আগে কখনও কানপুরে আসিসনি, এখানে আসবার জন্যে তোকে সাড়ে ছয় দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে, অথচ সেই ছোটবেলায় তোর মানকে কাকা বিয়ে এড়াবার জন্যে এবং আর্টিস্ট হবার জন্যে দেশ ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন।"

আসলে ব্যান্ডোদা ভাবছেন, গ্রহনক্ষত্রদের কোনোরকম অপমান না করে কীভাবে এক কর্ম থেকে আরেক কর্মের উৎপত্তি সম্ভব করা যায়!

খুব ভোরবেলায় ব্যান্ডোদা বললেন, "দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হতে হবে। অমিতাভ ঘোষকেও ফোন করে দিয়েছি। বিদগ্ধ অধ্যাপক, ভয়ঙ্কর সিনিয়ারিটি, তবু মনটা দড়কচা মেরে যায়নি, বললেন, "ব্যান্ডোদা, আপনার সব ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের কাছে অর্ডার।"

কানপুর গেস্ট হাউসে একটাই মুশকিল, এখানে সময়ের নড়চড় নেই। গরম চা-কেও সময় মেনে চলতে হয়, বললেই যখন তখন চা মেলে না।

"এর ফলটা কিন্তু খুবই বিষময়!" মন্তব্য করলেন ব্যান্ডোদা। "স্বয়ং বাল্মীকিও এই হোটেলে বসে একলাইন লিখতে পারতেন না। শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলাকে এবং বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলাকে খুঁজে পেতে হয় লেখকদের। সময়-অসময়ে চা-ই সেই সুযোগ জুটিয়ে দেয়।"

গেস্টহাউসের ভিতরের কর্তারা যতই নিয়মানুবর্তিতার ভক্ত

হোন, বাইরের কোনও গুণগ্রাহী নাগরিক অভ্যাগতদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে নীল আকাশের নীচে গেটের কাছে একটি চায়ের স্টলের ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় সারারাতই খোলা থাকে। ভোরবেলায় ওইখানেই ভাঁড়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, "বেঁচে থাক এই খুরি—মহেঞ্জোদরোর আমল থেকে নিজের ব্যক্তিত্ব অটুট রেখে ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অথরদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।"

গেটের সামনেই গাড়ি প্রস্তুত। গাড়ির সারথিও সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যান্ডোদার অনুরোধে তিন ভাঁড় চা ইতিমধ্যেই সেবন করেছেন। ব্যান্ডোদার এইটাই সুরক্ষা পলিসি! "ভোরবেলায় যাত্রা করলে সারথিকে শ্রীকৃষ্ণের মতন সম্মান করে, গরম চায়ের সাহায্যে তাকে নিদ্রামোহ থেকে মুক্ত করতে হবে।"

কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা? ব্যান্ডোদা এখনও তা সিক্রেট রেখেছেন। মাঝে মাঝে শুধু অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে একান্ত আলোচনা করছেন, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে! কৌতূহল প্রকাশে ফল ভাল হল না। ব্যান্ডোদা বললেন, "চল না, গুরুজনদের ওপর ভরসা রাখ না একটু! অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, এসব পুরাকালে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।"

"আজকাল করে না, ব্যান্ডোদা। এটা যে যুক্তির যুগ, তা আই-আই-টি ক্যামপাসে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।"

"তুই, আমি তো এখানে থাকি না, আমাদের টিকি তো বাঁধা হাওড়ায়! টাকের প্রাদুর্ভাবে টিকি গৃহহারা হওয়ায় আমার বন্ধন টুটে গিয়েছে, ফলে একটু এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াই। আমি বিশ্বের ঘাটে ঘাটে জল খেয়ে বুঝেছি, যুক্তি ও তর্ক এক জিনিস নয়!

বিশ্বাসীর যুক্তি আর তক্কোবাজের যুক্তিও এক নয়! তোর মা এবং আমার মা কুষ্ঠিতে বিশ্বাস করতেন, পয়সা খরচ করে আমাদের ছক করিয়েছিলেন, সেখানে লেখা হয়েছিল, জাতকের এক কর্ম থেকে আরেক কর্মের উৎপত্তি। সেইটা আমি দেখছি আজও হয়ে চলেছে, যুক্তি মানছে না।"

ব্যান্ডোদা হেঁয়ালি বজায় রেখেই একবার একতলার অফিসে চাবি জমা রাখতে চলে গেলেন। অমিতাভ ঘোষ ইতিমধ্যেই ব্যান্ডোদার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, "মজাদার মানুষ! আপনি তো রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন, ব্যান্ডোদা আমার ঘরে এসে গল্প জমালেন। বললেন, হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ওঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো স্বপ্নের মধ্যে এসে ওঁর কাছে দুঃখ করলেন, ওরা কী করে বলে, কানপুরে তেমন কিছু দেখার নেই?"

ব্যান্ডোদা সবিনয়ে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বললেন, "এখানকার লোকরা বলল, যে লোক ইদানীং হাওড়া দেখেছে তার আর কানপুরে কিছু দেখার নেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা, তালামারা কাপড়ের কল, কম্বলের মিল, জুতোর কারখানা, এই সবই শহরটাকে উনিশ শতকের কবরখানা করে তুলেছে।"

"উনিশ শতক তো সে দিনের! উনিশ শতক থেকে তো মানুষের সভ্যতার সূচনা হয়নি!" বৃদ্ধলোকটি নাকি দুঃখ করে মন্তব্য করেছেন।

অমিতাভ ঘোষও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। জানতে চেয়েছেন, "স্বপ্নের মানুষটা কত বুড়ো?"

ব্যান্ডোদা : "বুড়োদের তিনটে গ্রেড্! সাধারণ বুড়ো, কুঁজো

বুড়ো, আর খাটে ওঠার জন্যে রেডি বুড়ো! এই বৃদ্ধটি প্রথম স্তরের। বুদ্ধিবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলি মোটামুটি কর্মক্ষম রয়েছে, একটু তেজও আছে।"

অমিতাভর প্রশ্নের উত্তরে ব্যান্ডোদা বলেছেন, "না, শার্ট প্যান্টপরা একালের সিনিয়র সিটিজান নন। তপোক্লিষ্ট শরীর, একটু শীর্ণই বলা চলতে পারে, ঊর্ধ্ব শরীরে একটি উত্তরীয়। না মশাই, চোখে চশমা নেই, তার মানে চশমাপূর্ব যুগের মানুষ, কিন্তু বল্কলধারীও নন।"

"ফতুয়া বা গেঞ্জি ওই-ধরনের কিছু পরেছেন?" অমিতাভ ঘোষ জানতে চেয়েছিলেন।

"আরে মশাই, গেঞ্জি তো কালকা যোগী! ইংলন্ডের কাছে গারন্‌সি আইল্যান্ড না কোত্থেকে মাত্র একশ বছর আগে ইন্ডিয়ায় গেঞ্জি এল! ফতুয়া অবশ্য অনেক পুরনো। কিন্তু সেলাইকরা কোনও বস্ত্রখণ্ড লোকটার শরীরে নেই।"

"তার মানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রাক-মুসলিম যুগের লোক, কারণ ওঁরা আসবার পরেই আমরা সেলাইসুখ উপভোগ করলাম। তার আগে তো মালকোঁচা মেরে আমরা আলেকজান্ডারের সঙ্গেও লড়াই করেছি!" অমিতাভ ঘোষের কথা শুনে ব্যান্ডোদা মাঝরাতে ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। অমিতাভ যুক্তিবাদী। তাঁর প্রথম বক্তব্য, "আমরা এতদিন এখানে রয়েছি, যাতায়াত করছি, এই ধরনের কেউ তো স্বপ্নে যোগাযোগ করেননি।"

"হয়তো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আপনারা তাঁর মেসেজ রিসিভ করেননি, কিংবা টেকনোলজিস্টদের রকমসকম দেখে ভদ্রলোক সাহস পাননি! চিকিৎসাবিদ্যার কেন্দ্র হলে এমন হত না, ডাক্তাররা

অনেক ঠেকে প্রাচীন বিষয়ে খোঁজখবর করছেন, এমনকী, আদিবাসীদের টোটকাগুলো যাচাই করছেন। টেকনোলজিস্টদের মেজাজ অন্য, তাঁরা এইট্টিনথ সেঞ্চুরির শিল্প বিপ্লবের আগে কোনও কিছু ছিল ভাবতেই পারেন না।"

ব্যান্ডোদা এরপর বলেছেন, "হয়ত আপনারা সাহিত্যিকদের নেমন্তন্ন করছেন, তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করছেন, এইসব লক্ষ্য করে মানুষটি স্বপ্নপথে যোগাযোগের সাহস পেয়েছেন।"

ব্যাপারটা অমিতাভ ঘোষকেও চিন্তিত করে তুলেছে। ব্যান্ডোদা তো বাজে কথা বলবার লোক নন। বহুকাল অনাবাসী হয়ে রয়েছেন, পশ্চিমী সভ্যতার সমস্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাস ওঁর নখাগ্রে। কিন্তু চিন্তার কারণ, সব লোকেই তো জানে, কানপুরে আই-আই-টি ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। আগে লাল ইমলি কম্বলের কারখানা দেখতে আসত, কিন্তু সে কারখানার অবস্থা এখন শোচনীয়।

এরপরে আমরা শুধু জানি, ব্যান্ডোদা ওই কৃশতনু গম্ভীর গুরুদেবটির সঙ্গে আবার স্বাপ্নিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছেন। অমিতাভকে তাঁর একমাত্র অনুরোধ, দয়া করে ঘুমের ওষুধ খাবেন না, কামপোজ-খাওয়া স্বপ্নগুলো খুব বেয়াড়া হয়, কোনও মাথামুণ্ডু থাকে না।

তারপরেও নিশ্চয় অনেক কিছু ঘটেছে, কিন্তু আমরা তার বিশদ বিবরণ এখনও জানতে পারিনি। ব্যান্ডোদা শুধু আই-আই-টি গেস্ট হাউসের মেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে মনে বলছেন, "রামের জন্মস্থান! এত কাছে এসেও রামের জন্মস্থান দেখে না যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

আমাদের গাড়ি ইতিমধ্যে চলমান হয়েছে। সুমো গাড়িতে

ড্রাইভারের পাশে বসেছেন স্বয়ং ব্যান্ডোদা, যাতে তাঁর নির্দেশিত পথ ধরেই ড্রাইভার চলতে পারে। আমরা দু'জন পিছনের সিটে। অমিতাভ ঘোষ ফিস ফিস করে বললেন, "গাড়িতে তেল অনেক আছে। কিন্তু রাম জন্মভূমি সে তো অনেক দূরে, অযোধ্যা কি এখানে!" সেই কথা শুনে আমারও চিন্তা! এই গাড়িতে চড়ে হুট করে অযোধ্যা যাবার পরিকল্পনাটা পাগলামো। ব্যান্ডোদাকে মানিয়ে যায়, উনি যেখানে থাকেন, সেই আমেরিকায় দেড়শো মাইল ড্রাইভ করে লোকে কফি খেতে যায় পছন্দসই দোকানে! কিন্তু এখানে কী হবে?

অমিতাভর দুশ্চিন্তা অন্য কারণে। এই টাটা সুমো গাড়ি যেতে পারে না এমন অগম্যস্থান ভগবান এখনও তৈরি করতে পারেননি ; কিন্তু অযোধ্যা কি এখানে! নদী পেরুতে হতে পারে, যদিও ড্রাইভারদের ধারণা টাটা সুমো শুধু উড়তে পারে তা নয়, সাঁতারও কাটতে পারে। কিন্তু জলচর, খেচর যাই হোক, সময় তো লাগবেই, এবং আমার সিনেমা সংক্রান্ত বক্তৃতাটা দুপুর একটার সময় নির্ধারিত এবং সেই সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন।

অমিতাভ ঘোষ বেশ কিছুটা আতঙ্কিত। এই মিটিংয়ে কৌতূহলী কিছু গৃহবধূরাও আসবেন, তাঁরা উত্তমকুমারের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল, সুচিত্রা সেন কেন সত্যজিতের কোনও ছবিতে পার্ট করলেন না, কোন্ কোন্ মহিলা চুক্তিপত্র সই করেও শেষ মুহূর্তে সত্যজিৎ রায়কে 'না' বলেছেন, এই সব জানতে সভায় আসছেন। তাঁদের ধারণা, অথররাই এসব ঘটনার হাঁড়ি হাটে ভাঙতে পারেন। আই-আই-টি ললনারা যদি মিটিংয়ে এসে বক্তাকে না দেখে ফিরে যান তা হলে অমিতাভ ঘোষের এই ক্যামপাসে

ফিরে আসা আর সম্ভব হবে না।

আমিও অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছি। ব্যান্ডোদা তো জানেনই আমার প্রোগ্রামের কথা। যারা রাহা খরচ দিয়ে বক্তা আনিয়েছে তারা কাজ উশুল না করতে পারলে কী অবস্থায় পড়বেন তা তো ব্যান্ডোদার অজানা নয়।

"রামের জন্মস্থান! আহা ভাবা যায় না, মুখুজ্যে! আই-আই-টি তো তবু আধডজন আছে, সব কটিই তীর্থস্থান, বাড়তে বাড়তে এই প্রতিষ্ঠানও শেষপর্যন্ত সতীর বাহান্ন পীঠ হবে, কিন্তু রাম তো একজনই। সাধে কি আর মহাত্মা গান্ধী থেকে তুলসীদাস পর্যন্ত সবাই রামধুন গেয়েছেন, জয়গান গেয়েছেন রঘুপতি রাঘব রাজা রামের, জয়ধ্বনি তুলেছেন পতিতপাবন সীতারামের!"

আমি বিরক্তিতে ফুঁসছি ; কারণ ড্রাইভার পুরোপুরি ব্যান্ডোদার কব্জায় চলে গিয়েছে। ব্যান্ডোদা তাকে কী বশীকরণ মন্ত্র দিয়েছেন কে জানে। এই ড্রাইভারকে যদি আমরা বলি, কাছাকাছি একটু হাওয়া খেয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের ঐতিহাসিক বাড়িটা দেখে আমরা ফিরে আসব ও তা হলে শুনবেই না।

অমিতাভ ঘোষের গবেষণার বিষয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হলেও এই মুহূর্তে তার সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে বললেন, "এই কানপুর আই-আই-টি ক্যামপাসটা রামের জন্মভূমি হলে আমরা বেঁচে যেতাম! ব্যান্ডোদা এখানেই পায়ে হেঁটে রামচন্দ্র সম্বন্ধে লেটেস্ট খবরাখবর সংগ্রহ করে নিতে পারতেন!"

আমিও একমত। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভেবে বললাম, "রামের লেটেস্ট খবরগুলো তো ভাল নয়, অযোধ্যার নামটা ইদানীং সমস্ত পৃথিবী জেনে গেল। অয়োধিয়া যুগ যুগ ধরে আমাদের মুখ উজ্জ্বল

করে, এখন মুখ পুড়োচ্ছে!" এই ব্যান্ডোদাই আমাকে একবার বলেছিলেন, 'ভাগ্যে নামটা এমন কঠিন যে সায়েবরা উচ্চারণ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে!'

যা হবার তা হবে! ভবিতব্যকে কে কলা দেখাতে পারে! যদি দ্বিতীয় বক্তৃতাটার সুযোগ ফস্কে যায়, তা হলে বুঝতে হবে ভগবান রামচন্দ্র এমনই চেয়েছিলেন! আই-আই-টির দুঃখে ব্যান্ডোদার সান্নিধ্য-সুখ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

"স্বপ্নের এই লোকটি কে, তা বুঝতে পারলেন, ব্যান্ডোদা?"

"স্বপ্নের প্রধান মুশকিল, কোনও ছবিতে ক্যাপশন থাকে না, চরিত্রগুলো কেউ ভিজিটিং কার্ডও দেয় না। আন্দাজ করে নিতে হয়, রোগা, তীক্ষ্ণ নাসা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কণ্ঠে একমুখী রুদ্রাক্ষ, ইনি নিশ্চয় কোনও মুনি। কিন্তু কোন মুনি হতে পারেন?"

"মোটা কোনও মুনিকে আমি কখনও স্বপ্নে দেখিনি, ব্যান্ডোদা। আপনি দেখেছেন?"

"খুব ইম্পার্টান্ট অবজার্ভেশন! কে বলে তুই বোকা! মুনিমাত্রই কেমন পাকাটে পাকাটে চেহারা। বহুক্ষণ তপস্যা করে শরীরকে ধকল দেয়, খায়দায় কম, তাই হাই লেভেলের মুনিরা বোধ হয় মোটা হয় না। আমার মুনিটিও শীর্ণ শরীর হলেও কথাবার্তা কাঠখোট্টা নয়। বললেন, এখানকার ব্যাপারস্যাপারগুলো নিজের চোখে দেখে যাবেন, কারণ গালগল্প বেড়েই চলেছে।"

ব্যান্ডোদা স্বীকার করলেন, "প্রথমে চিনতেই পারিনি ; পরে বুঝতে পারলাম তোদের লাইনেরই লোক! আগে ডাকাতি করতেন, পরে কবি হলেন।"

ভীষণ চটে গেলাম! "ব্যান্ডোদা, কোনও বাঙালি কবিই ডাকাত

ছিলেন না ; বড়জোর দু'একটা আইডিয়া তাঁরা চুরি করেছেন।"

"চুরি আর ডাকাতির মধ্যে তফাত কী?" জানতে চাইছেন মৃদুহাস্য ব্যান্ডোদা।

"অপরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি, আর এই তোর জিনিস কেড়ে নিলাম বললে, সেটা ডাকাতি!"

"চমৎকার একটা সংজ্ঞা দিয়েছিস! তা হলে প্রশ্ন হল, কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণ, তুলসীদাসকৃত হিন্দি রামায়ণ এসব ডাকাতি, এঁরা লুঠ করেছেন আদি কবি বাল্মীকিকে।"

"এই ধরনের বিচার খুব অন্যায় হবে, ব্যান্ডোদা। কারণ এঁরাও জাম্বোসাইজের কবি। এঁরা একটা ভাবনাকে গ্রহণ করে সেটা নিজের মতন করে নিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিংবা রামচরিতামানস রচনা করেছেন।"

"তুই বলতে চাস, এগুলো বেআইনি চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়।"

"ব্যান্ডোদা, এসব কবি খুবই উঁচুদরের, এঁরা খান খড়, কিন্তু বাঁট থেকে বেরোয় দুধ!"

আমার কথা শুনে ব্যান্ডোদা মজা পেলেন। "আমি হাঙ্গামা বাড়াতে চাই না, সে ইচ্ছে থাকলে বলতাম, আদি বাল্মীকি রামায়ণ কি তা হলে খড়? আমি বুঝছি, তোর বক্তব্যটা একটা উপমা মাত্র! সব পয়েন্টে মিলবে না, কোথাও থামতেই হবে!"

ড্রাইভার গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। সে কোনও নির্দেশও চাইছে না, ব্যান্ডোদা সব নিশ্চয় এমনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সে রাজধানী এক্সপ্রেসের মেজাজে বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

ব্যান্ডোদা মুখ ফুটে নাম করেননি কে তাঁর স্বপ্নে উপস্থিত

হয়েছিলেন। "ব্যান্ডোদা, ওয়ার্লডে এখনও পর্যন্ত একজন ডাকাতই কবি হতে পেরেছেন, তাঁর রচনা থেকেই এই অযোধ্যাকাণ্ডের উৎপত্তি, দেশটার হাড় জ্বালা জ্বালা হয়ে গেল!"

ব্যান্ডোদা মনে হচ্ছে বাল্মীকির প্রেমে পড়ে গিয়েছেন! বললেন, "খুব উদ্ধত দেবতারাও স্বপ্নে কেমন বিনম্র হয়ে যান, মুখুজ্যে। ওঁর কথা শুনে, কে বলবে সপ্তকাণ্ড রামায়ণটা উনিই লিখেছেন।"

অমিতাভ ঘোষের একটাই চিন্তা! ফিস ফিস করে বললেন, "রামের জন্মভূমিতে আগামী কাল গেলে ভাল হত না? অযোধ্যায় গিয়ে লাঞ্চের আগে কানপুরে ফিরে আসা একমাত্র হেলিকপ্টারেই সম্ভব!"

ব্যান্ডোদাকে আমি জানি। যা ঠিক করেছেন তা করবেনই। বাধা দিলে বলবেন, "তা হলে শ্রীলঙ্কায় রাবণের প্রাসাদটাও খোঁজ করে আসা যাক।" অতএব অন্যভাবে সামলাতে হবে, এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে উনি নিজেই ড্রাইভারকে বলবেন, গাড়ি ফেরাও।

ব্যান্ডোদা সত্যিই বাল্মীকি সন্দর্শনে মোহিত। বললেন, "তোর সঙ্গে দেখা হলেই ভাল হত। তুই অনেক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারতিস। আমি তো সেই কোন্ আদ্যিকালে বালকবোধ রামায়ণ পড়ে দেশছাড়া হয়েছিলাম, রাম লোকটিকে তখন আকর্ষণীয় মনে হয়নি।"

"লোক নয়, ব্যান্ডোদা। বেনামে বিষ্ণু! লীলাখেলা দেখানোর জন্যে মর্তে চলে এসেছিলেন।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "আমার সায়েব বন্ধুরা রাম চরিত্রটা বুঝতে চায় না, কেন সমস্ত দেশটা রামজন্মভূমিকে এত গুরুত্ব দিতে চায়

তা তাদের মাথায় আসে না। তারা বলে, পুওর সীতা! স্বামীর হাতে নির্যাতিতা হয়ে ওইভাবে নিজেকে বেরিয়াল না দিয়ে উচিত ছিল স্বামীকে ডাইভোর্স করা।"

"ওসব কথা আমাদের মুখে আনতে নেই, ব্যান্ডোদা! বেরিয়াল নয়, সীতার পাতালপ্রবেশ। সীতার মতন সতীরা কখনও স্বামীর মধ্যে কোনও দোষ খুঁজে পায় না, তবে না ঘরে ঘরে তাঁদের ছবি টাঙানো হয়েছে!"

রামসীতা অপেক্ষা রামায়ণের লেখক সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ব্যান্ডোদা গত রাত থেকে। বললেন, "চমৎকার মানুষ। আই-আই-টি কানপুরের ওপর একটু অভিমান আছে, এই যা। ওঁর সন্দেহ ওখানে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, অত বড় গ্রন্থাগারে কোনও বাল্মীকি কর্নার নেই! সায়েবসুবোরাই গ্রন্থাগারের সব জায়গাটা অকুপাই করে বসে আছেন, গেঁয়ো যোগীদের এখানে ঠাঁই পেতে হলে ভায়া ইউরোপ অথবা আমেরিকা, নিদেনপক্ষে জাপান ঘুরে আসতে হয়!"

গাড়ি থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে ব্যান্ডোদা খুশ মেজাজে রয়েছেন। গতকাল রাতে সুযোগ পেয়ে তিনি রামায়ণ সম্বন্ধে অনেক গোপন খবর খোদ ঘোড়ার মুখ থেকে শুনে নিয়েছেন। তারই কিছু অংশ এবার ব্যান্ডোদার শ্রীমুখ থেকে জানা গেল।

"বাল্মীকির বাবার নাম জানা ছিল না। উনিই বললেন, প্রচেতা ঋষির বংশধর। দশম পুত্র। একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন, আমি বললাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথও বাবামায়ের চতুর্দশ সন্তান! তারপর যেসব সন্দেহ ছিল তা যাচাই করে নিলাম। স্বীকার করলেন, কম বয়সে বয়ে গিয়ে দুর্দান্ত ডাকাত হয়েছিলেন। ইস্কুলের ছেলেরাও জানে

রত্নাকর ডাকাত বনের মধ্যে নিরীহ পথিককে খুন করে সর্বস্ব হরণ করত। তারপর একদিন নারদ ও ব্রহ্মা এই ডাকাতের খপ্পরে পড়ে গেলেন, নারদ তখন বললেন, তার পাপের ভাগ রত্নাকরের কোনও পোষ্যই নেবে না। এঁদের বেঁধে রেখে রত্নাকর বাড়ি ফিরে বাবা মা ছেলে মেয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, নারদই রাইট। কেউই ডাকাতির পাপের ভাগ নিতে রাজি নন। এরপরেই নারদের প্রেসক্রিপশন : ষাট হাজার বার রাম নাম জপ করো। তারপর সেই পুরনো গপ্পো। তপস্যা করতে করতে সমস্ত শরীর উইতে ঢেকে ফেলায় নাম হল বাল্মীকি।"

ব্যান্ডোদা বলেছিলেন, "ভাগ্যে ইউ পি-র বনে তপস্যা করেছিলেন, তাই অত সুন্দর নামটা পেলেন, কলকাতায় তপস্যা করলে স্রেফ ধুলো অথবা জঞ্জালে চাপা পড়ে যেতেন, নাম হয়ে যেত ধুলেশ্বর অথবা জঞ্জালা!"

ব্যান্ডোদা জিজ্ঞেস করলেন, "কবিবর, তমসাতীরবর্ত্তী কাননে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটাকে হত্যা করায়, ইমোশনের মাথায় আপনি যে সৃষ্টির প্রথম শ্লোক রচনা করলেন—মা নিষাদ এট্‌সেটরা—এটা সবাই আজও আওড়ায়, কিন্তু মানেটা কেউ তেমন বুঝতে পারে না। কী বলতে চেয়েছিলেন আপনি?"

বাল্মীকি বললেন, "আসলে আমি রেগে গিয়েছিলাম। রেগে গেলেও যে কবিতা বেরোয় এটা কবিদের ট্রেড সিক্রেট। আমি বলেছিলাম, 'ওরে নিষাদ, তুই যখন কামমোহিত বিহঙ্গম মিথুনের একটাকে হত্যা করলি, তখন অনন্তকাল তোর গতি হবে না!' খুব হইচই পড়ে গেল শ্লোক শুনে, ব্রহ্মা পর্যন্ত স্বীকার করলেন, কবিত্বশক্তি স্বরূপিণী দেবী বাণী স্বয়ং তোমার কণ্ঠে অবস্থান

করছেন, কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হয়, যাকে ভর্ৎসনা করা, সেই ব্যাধ ব্যাপারটা বুঝতে পারল না—অর্থাৎ ভস্মে ঘি ঢালা হল।"

ব্যান্ডোদা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তাঁর নিবেদন, "এই যে শুনে আসছি, মহাত্মাদের পূর্বশক্তিবশতই কবিত্বশক্তির জন্ম হয়। নীচমুখে প্রকাশ পেলেও কবিতাকে অবমাননা করা উচিত নয়!"

বাল্মীকি : "গোড়ায় আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, আমাকে বলা হল, একমাত্র শ্লোকই কাব্যমধ্যে পরিগণিত, আর আমি যে বিপুল বিষ্ণুলীলা বর্ণনা করব, তাই মহাকাব্য হবে।"

ব্যান্ডোদা : "বিপুল বলতে কত?"

বাল্মীকি : "আদি কবি এই টাইটেল নিশ্চিত করতে আমাকে নিজের হাতে চল্লিশ হাজারের বেশি শ্লোক লিখতে হয়েছে। বেদব্যাসের মতন গণেশকে অনুলেখক হিসেবে পাইনি, আমার দুঃখ, আদি কবি, কিন্তু কপিরাইটের সুবিধে পাইনি, যার যা খুশি তাই পরবর্তীগণ চেঞ্জ করে দিয়েছে। একজন তো মেয়েদের হাততালি পাবার জন্যে গল্পটা শেষের দিকে পালটে দেখিয়ে দিল, রাম নয়, স্বয়ং সীতাই সহস্রস্কন্ধ রাবণকে নিধন করলেন, এই বইয়ের নাম দেওয়া হল অদ্ভুত রামায়ণ। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হল, কপিরাইট আটকানো গেল না!"

ব্যান্ডোদা সত্যিই বুদ্ধিমান। স্বপ্নের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে বাল্মীকির কাছ থেকে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করে নিয়েছেন। মানুষটি ডাকাত কেমন, কেমন করে ডাকাতি থেকে এই লেখার লাইনে এসে গেলেন। "শিষ্যগণকে সঙ্গে নিয়ে মুনিবর যখন তমসাতীরবর্তী কাননে বিচরণ করছিলেন তখন তাঁর মাথায় সোনালি জটাজাল, হাতে কুশ এবং কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম। বোঝা

যাচ্ছে তখনও ইন্ডিয়ায় কাপড়ের তেমন প্রচলন হয়নি। ব্যাধের শরে নিহত পাখির পত্নী যখন করুণস্বরে বিলাপ করছেন দেখে মুনিবর শোকাভিভূত হলেন। আকাশ থেকে দেবী সরস্বতী ভাবলেন, শোকও তো মোহ, বাল্মীকির অযোগ্য, তাই কবিত্বশক্তি রূপে ওঁর মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রথম কবিতার শ্লোক নির্গত হওয়ার পরেই ব্রহ্মা স্বয়ং এসে ওঁকে জানালেন, কবিত্ব-স্বরূপিণী দেবী সরস্বতী স্বয়ং তাঁর কণ্ঠে অধিষ্ঠান করছেন।"

আমি তো অবাক। ব্যান্ডোদা বললেন, "আই-আই-টি কানপুরে শাস্ত্রগ্রন্থ থাকলে একটু চেক করে নিতাম আজ সকালেই। ব্রহ্মা নিজে নাকি আদি কবিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কবির বর্ণিত বিষয় কখনও মিথ্যা হয় না, তিনিই নাকি অপর সৃষ্টিকর্তা! শুধু তাই নয়, কবিই ব্রহ্মা, কবিই বিষ্ণু এবং কবিই শিবস্বরূপ!"

"বুঝলি মুখুজ্যে, রামায়ণের কনট্রাক্ট হয় গেল। কবি যেভাবে রামলীলা বর্ণনা করবেন ভগবান বিষ্ণুও সেইরকম কাজ করবেন।"

"তা হলে ভিতরের কথা তেমন জানা গেল না, ব্যান্ডোদা। রামায়ণের সাফল্য সম্বন্ধে তো অনেক কথাই লোকমুখে প্রচারিত রয়েছে।"

এবার ব্যান্ডোদা সুখবর দিলেন। "স্কুপ করেছি বলব না, কিন্তু কয়েকটা অপ্রচলিত এবং অস্বস্তিকর খবর পাওয়া গেল! খোদ কানপুরে আদি কবির দাপট তেমন লক্ষ্য করা যায় না। আমি অবশ্য বললাম, জোড়াসাঁকোয়, চিৎপুর রোডে আর এক কবির জন্মভিটের কাছাকাছি অঞ্চলে একই অবস্থা। তারপরেই ব্যান্ডোদা বোমাটা ফাটালেন!"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যান্ডোদা বললেন, "ভিতরের

খবরটা শুনে রাখ। রামায়ণ প্রকাশিত হবার পরে তো হইহই পড়ে গেল! লেখকদের যা হয়, একখানা বড় সাফল্য হলেই পরের লেখাটার জন্যে প্রচণ্ড ধরাধরি শুরু হয়ে যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে বললেন, স্বয়ং সরস্বতী এতই খুশি যে তোমার মুখপদ্মে চিরতরে অবস্থান করতে চান। আমি যোগ্য সাবজেক্ট ভেবে রেখেছি, তোমার পরবর্তী বিষয় মহাভারত।"

"বলেন কি ব্যান্ডোদা!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক চললে, মহাভারতটাও লিখতেন বাল্মীকি। কিন্তু তা হল না, লিখলেন একজন জুনিয়র রাইটার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।"

"সে কি! এত বড় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কেন বাল্মীকি?"

"সেটা তো তোরা খুঁজে বার করবি। আমি এন আর আই বাঙালি, দুনিয়ার হাটে হাটে পরামর্শ বিক্রি করে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়, আমি এসব খোঁজ করব কী করে?"

"আপনি ঠিক বলছেন ব্যান্ডোদা? বাল্মীকি সেকেন্ড বইটা লেখবার প্রস্তাব পেয়েছিলেন!"

"স্বয়ং বাল্মীকি স্বপ্নে এই অধমকে গত রাত্রে বলেছেন। কোন্ দুষ্প্রাপ্য ডকুমেন্টে তার উল্লেখ রয়েছে তাও উল্লেখ করলেন— বৃহদ্ধর্মপুরাণ। অফার পেয়ে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করার সময়ে বাল্মীকি করজোড়ে ব্রহ্মাকে বললেন, আমি এখন মোহবিবর্জিত ও সংসার শূন্য, আমি কার জন্যে খাটব? আমার কাছে সমস্ত উদ্যমই এখন বৃথা।"

"তারপর কী হল, ব্যান্ডোদা?"

"এদেশে যা হয়ে থাকে। অন্তত একত্রিশ জন মহর্ষি প্রবলভাবে

তৎপর হয়ে উঠেছিলেন মহাভারত রচনার দায়িত্ব পাবার জন্যে। এঁদের মধ্যে কশ্যপ এবং কপিল থেকে বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য কে না ছিলেন? বাল্মীকি এখনও গোপ্পে লোক, কীভাবে শেষপর্যন্ত বেদব্যাসের সিলেকশন হল তা আমাকে আর একদিন বলবেন বলেছেন। কিন্তু যা বললেন না, মহাভারত লেখায় কেন তাঁর অরুচি হয়ে গেল? এইটা চেষ্টা করলে তোরা এখনও খুঁজে বার করতে পারিস। কানপুর আই-আই-টি-র উচিত কাউকে এই কাজে সহযোগিতা করা।"

ক্যাম্পাস থেকে উত্তর-পশ্চিম-মুখো চলতে চলতে আমাদের টাটাসুমো হঠাৎ এক জায়গায় থামল। ব্যান্ডোদা নেমে পড়লেন। অমিতাভ ঘোষের উদ্বেগ তখন আরও বেড়ে গিয়েছে। কোন রুটে কীভাবে কত সময়ে রামজন্মভূমি অযোধ্যায় পৌঁছোন যাবে তার হিসেব করে চলেছেন। অমিতাভ বলে উঠলেন, "এ তো বিঠুর! তার মানে কানপুর থেকে মাত্র কুড়ি-একুশ কিমি এসেছি আমরা। এইখানেই তো বাল্মীকি মুনির আশ্রম—আজকাল লোকজন তেমন আসে না।"

ব্যান্ডোদা বললেন, "দেখে নে। এইটেই তো তীর্থস্থান হওয়া উচিত, লেখার লাইনের গুরুদেব গঙ্গাতীরের এই আশ্রমেই জীবনযাপন করেছিলেন, কিন্তু কেউ দেখতে আসে না।"

একজন মলিন বসন ভদ্রলোক ছুটে এলেন, আমাদের গাইড হতে চাইছেন। ভদ্রলোক বলতে আরম্ভ করলেন, "মস্ত জায়গা এই বাল্মীকি আশ্রম। কানপুরে সতীঘাটে লক্ষ্মণ সীতাকে রেখে চলে যান। সীতা বাল্মীকির এই আশ্রমে এসে ওঠেন। ওই যে পাতকুয়ো দেখছেন, দুঃখিনী সীতা ওইখানে থেকেই জল তুলতেন রোজ। লব

কুশ ওইখানে খেলাধুলো করত, লেখার মাঝে মাঝে বাল্মীকি তাদের লেখাপড়া শেখাতেন। এখান থেকে আপনাদের ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে নিয়ে যাব, ওখানে যে বাণে লব স্বয়ং রামচন্দ্রকে জখম করেছিলেন তাও দেখাব। এই আশ্রমের সামনের গঙ্গা থেকে ওই তির পাওয়া গেছে।"

আমার চিন্তা অন্য। কেবলই ভাবছি, আদি কবির জীবনে কী এমন ঘটল যে আর লিখতে চাইলেন না?

ব্যান্ডোদা বললেন, "কয়েকটা সম্ভাবনা রয়েছে। দূরদর্শী কবি, অহেতুক ঝুঁকি নিতে চাইলেন না, অমর হওয়ার পক্ষে একখানা রামায়ণই যথেষ্ট। পরের বইটা পাঠকদের প্রত্যাশামতো না হলে প্রথম বইটাও মার খাবে। কে যেন বলে গিয়েছেন, লেখকজীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি তাঁকে ভাল, আরও ভাল লিখে যেতে হবে, একটু খারাপ হলেই পাঠকরা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করবেন।"

বাল্মীকির আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখতে রোমাঞ্চ বোধ করছি। এসব সত্য? না কাল্পনিক? তা নিয়ে মাথা ঘামাতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। সেকালের পাঠকরা বাস্তব ও কল্পনার কত সহজ সমাধান করে দিয়েছিলেন, কবিকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি যা লিখবে তাই সত্য হবে।

"ব্যান্ডোদা, আপনার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুটোই আমার থেকে অনেক বেশি। আজকের মিটিং চুলোয় যাক। আপনি কারণটা খুঁজে বার করুন, কেন্ বাল্মীকি করজোড়ে বললেন, রামায়ণ রচনা করেছি, এই যথেষ্ট। পরের বইটা যিনি লিখবেন তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি যা জানি সব বলে দেব।"

ব্যান্ডোদা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর চুপি চুপি

আমাকে বললেন, "যদি আবার স্বপ্নদর্শন হয় তবে ব্যাপারটা একটু বাজিয়ে নিতে হবে। আমার ধারণা, মস্ত বড় ঋষি, মস্ত বড় কবি, স্বয়ং সরস্বতী সারাক্ষণ জিহ্বাগ্রে বিরাজ করছেন, কিন্তু নিজের অজান্তে আদি কবি তাঁর চরিত্রদের সঙ্গে একটু বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাম সীতা লব কুশ যা করছে করুক, নিস্পৃহভাবে তাদের কথা মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ করো, কিন্তু তাই বলে নিজেকেও নিজের বইয়ের একটা চরিত্র করে ফেলা! তুই হয়তো বলবি, মহাকাব্যে তো শুধু যুক্তিগ্রাহ্য নয়, এখানে নিয়তি ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব বড় ভূমিকায় উপস্থিত রয়েছে।"

আমাদের গাইড তখনও বলে যাচ্ছে, বাল্মীকির কোনও হাত ছিল না। স্বয়ং রামের নির্দেশেই নির্বাসিতা সীতাকে লক্ষ্মণ এই আশ্রমে রেখে যান। লব কুশের সমস্ত শিক্ষা বাল্মীকির হাতে। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় বাল্মীকি তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, এখানে উপস্থিত ছিলেন না। যুদ্ধে রামচন্দ্ররা চারভাই যখন লব-কুশের হাতে নিহত হলেন তখন শোকে সীতা আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বাল্মীকি সেই সময় আশ্রমে ফিরে এসে চার ভাইকে বাঁচিয়ে অশ্বমেধের ঘোড়া ফিরিয়ে দেন।

ব্যান্ডোদা মাঝে মাঝে মনোযোগ দিয়ে লোকটির কথা শুনছেন। তারপর চুপি চুপি আমাকে বললেন, "বাল্মীকির বিরক্তির কারণটা এবার আন্দাজ করতে পারছি। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলো যখন নিজেরাই হাঁটা-চলা আরম্ভ করে এবং লেখকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন লেখকদের মনোকষ্টের সীমা থাকে না। শুনেছি মূল বইতে লব-কুশের উপাখ্যান ছিল না। তুই দেখ শ্লোকসংখ্যা নিয়েও বিরোধ, উনি বোধহয় লিখেছিলেন পঁচিশ হাজার শ্লোক, সেটা

হঠাৎ বেড়ে দাঁড়াল চল্লিশ হাজারে। খুবই বিচক্ষণ মুনি ছিলেন, তখনই ইনিংস ডিক্লেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিলেন, হাজার অনুরোধেও মহাভারত রচনার দায়িত্ব নিলেন না।"

গাইডকে সন্তুষ্ট করে ব্যান্ডোদা আমাদের নিয়ে টাটাসুমোতে ফিরে এলেন। অভিতাভ ঘোষ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার মোক্ষম চাল দিলেন। বললেন, "এবার তবে আই-আই-টি-তে ফেরা যাক।"

আমি বললাম, "সে কী! আমাদের তো যেতে হবে রামের জন্মস্থান অযোধ্যায়।"

অমিতাভ বললেন, "দেখুন, বাল্মীকির ফটো আমরা দেখিনি। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের ফটো এবং কণ্ঠস্বর শুনেছি। তাঁকে বিশ্বাস করলে, এই বিঠুর বাল্মীকি আশ্রমই রামজন্মভূমি।"

ব্যান্ডোদা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। "প্রফেসর ঘোষ তো ঠিক কথাই বললেন। আশ্রমাধ্যক্ষ কবি বাল্মীকির মনোভূমিই যে রামের জন্মস্থান এবং তা যে অযোধ্যার চেয়ে সত্য সে কথা আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় চিরদিনের জন্য প্রমাণ করে দিয়েছেন। এখানে বসেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, এই পবিত্র তীর্থ আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং রামজন্মভূমির সন্ধানে অযোধ্যা যাওয়ার কোনও দরকার নেই। ব্যাপারটা আমি বাল্মীকিকে বুঝিয়ে বলব, আমার আশঙ্কা আজ রাতে তিনি আবার আই-আই-টি-তে আসবেন। ব্যাপারটা শুনে নিশ্চয় খুবই খুশি হবেন।"

এবার ড্রাইভারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন ব্যান্ডোদা। আমাদের সুমো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এবার কানপুরের দিকেই ছুটতে শুরু করল।

আজব আবিষ্কার

এক যে ছিল দেশ। সেই দেশে রাজা ও রাজপুত্র, মন্ত্রী ও মন্ত্রী-পুত্র, কোটাল ও কোটালপুত্র ছাড়াও সাধারণ ও অসাধারণ লোক বাস করতো। তাদের কেউ বা চাষী, কেউ বা শ্রমিক, কেউ বা শিক্ষক, কেউ বা চিকিৎসক, কেউ বা বৈজ্ঞানিক।

এই রূপকথার নায়ক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক। প্রতিভাবান যুবকটির নাম অবনীদাস ব্যানার্জি বি.এস-সি (ক্যাল), এম. এস-সি (ইলিনয়)। গল্পের শুরু কিন্তু অবনীদাসের বাড়িতে নয়—অন্যত্র।

প্রখ্যাত হোলসেলার, জেনারেল মার্চেন্ট এবং অয়েল মিলার ঘনশ্যাম সাধুখান অন্য দিনের মতো তাঁর বিখ্যাত দোকান 'সাধু ভাণ্ডার'-এর গদিতে বসে, নরম তালিকায় হেলান দিয়ে তাঁর অগণিত বিষয়-সম্পত্তি, কালো টাকা এবং স্বর্ণসঞ্চয়ের গোপন মানসিক হিসেব-নিকেশ করছিলেন। এখন খরিদ্দারদের তেমন জ্বালাতন নেই। কারণ ঘনশ্যামের নির্দেশমতো দোকানের প্রবীণ বিশ্বস্ত কর্মচারী সেবাচরণ মাইতি কালো নোটিস বোর্ডের ওপর সাদা খড়িতে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছে: "সরিষা তৈল: নাই, বেবিফুড : নাই, বিস্কুট : নাই, নুন : নাই, চিনি : নাই, কেরোসিন: নাই।" 'নাই'-এর তালিকা সুদীর্ঘ। 'আছে'-এর মধ্যে কেবল কিছু ছোলা, বিখ্যাত ব্র্যান্ডের কয়েক টিন বহুমূল্য ঘি এবং বিভিন্ন ধরনের

পাঁপর।

ঘনশ্যাম সাধুখান এই সময় দু'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং একমাত্র বংশধর তিনকড়ির সহযোগিতায় এক টাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা এবং একশ টাকার নোটের বান্ডিল তৈরি করেন। সদাসতর্ক ও সন্দেহপ্রবণ ঘনশ্যাম এক সময় নোটের সমস্ত বান্ডিল নিজেই দ্বিতীয় বার গুনতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন এই ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ এমনই বেড়েছে যে, ঘনশ্যামের পক্ষে সমস্ত নোট গোনা সম্ভব নয়। তাই তিনি কেবল পুত্র তিনকড়ির তৈরি একশ টাকার নোটের বান্ডিল ডবলচেক করেন এবং আড়চোখে অন্য কর্মচারীদের উপর কড়া নজর রাখেন।

পুত্র তিনকড়ি আজ ফুটবল খেলা দেখার নাম করে, বাবার কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টা ছুটি নিয়ে এক লারেলাপ্পা মার্কা রঙিন জনপ্রিয় ছবির তারকাকে রুপোলি পর্দায় তৃতীয়বারের মতো দেখতে গিয়েছে। সুপার-হিট ছবির প্রায়-বিবসনা এই পঞ্চদশী নায়িকাটি গত দু'সপ্তাহে বারবার তিনকড়ির নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

ঘনশ্যাম মানুষটি বেজায় শান্ত। কিন্তু তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কি তা জানতো? বেলা সাড়ে-তিনটা নাগাদ ঘনশ্যাম হঠাৎ উঁচু গলায় কর্মচারী সেবাচরণকে ডাকলেন।

বড়বাবুর ডাক শোনামাত্র সেবাচরণ হাজির। ঘনশ্যাম সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন : "বোর্ডের ওপর বেবিফুডের মিথ্যে কথাটা মুছে দাও।"

সেবাচরণ তো তাজ্জব। বড়বাবু কি ভুল বকছেন?

রক্তচক্ষু ঘনশ্যাম বললেন, "কী হলো তোমার? 'নাই' কথাটা মুছে দিয়ে আমাদের গুদামে যত বেবিফুড আছে সব নিয়ে এসে

বিক্রি আরম্ভ করো।"

সেবাচরণ ভয় পেয়ে মালিককে জিজ্ঞেস করলো, "সমস্ত এস্টক? সে তো চার-পাঁচ হাজার টিন, বাবু!"

ঘনশ্যাম নির্মল হেসে বললেন, "সে তো ভালই। চার-পাঁচ হাজার ফ্যামিলির বাচ্চা ছেলেরা এই দুর্দিনে দুধ খেয়ে বাঁচবে।"

বিস্মিত সেবাচরণ মনিবকে মনে করিয়ে দিলো, "ওগুলো ভিতরে ভিতরে আপনি যে আড়াই গুণ দামে বেচবার হুকুম দিয়েছিলেন?"

"অন্যায্য দাম আমি আর নেবো না, সেবাচরণ। সমস্ত জিনিস কনট্রোল দামে বেচবো।" এক গাল হেসে ঘোষণা করলেন ঘনশ্যাম সাধুখান।

সেবাচরণ ভয় দেখালো, সাদাবাজারে সোজাপথে এখনই বেবিফুড ছাড়লে ঝুটঝামেলা বাড়বে। দোকানের সামনে বিরাট লাইন পড়বে। পিছন-দরজা দিয়ে আড়াই গুণ দামে বেচলে ওসব হাঙ্গামা হয় না।

"ঝুট-ঝামেলা এড়াবার জন্যে তো আমার বাপ এই 'সাধু ভাণ্ডার' খোলেননি", সেবাচরণকে বেশ বকুনি লাগালেন ঘনশ্যাম।

পাড়ায় পাড়ায় বার্তা রটতে কয়েক মিনিট মাত্র লেগেছিল। আধ ঘণ্টা পরে দোকানের সামনে যখন বিরাট ভিড় হয়েছে, তখন ঘনশ্যামকে গলবস্ত্র হয়ে লাইনে-দাঁড়ানো জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেলো। বিনয়ে বিগলিত ঘনশ্যাম অনুরোধ করছেন: "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমার গোডাউনে আপনাদের জন্যে হাজার হাজার বেবিফুড আছে।"

একটু পরে ঘনশ্যাম হুকুম করলেন, "চাবি নিয়ে তিন নম্বর, চার

নম্বর, ছয় নম্বর গোডাউন খুলে ফেলো—আটা, ময়দা, নুন, কেরোসিন যা আছে সব ন্যায্য মূল্যে ছেড়ে দাও।"

দোকানের কর্মচারীরা বিস্ময়ে বোবা হয়ে ঘনশ্যামের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এ-অঞ্চলের কালোবাজারীর সম্রাট বলে ঘনশ্যাম সুপরিচিত।

হুকুম তামিল হচ্ছে না দেখে ঘনশ্যাম চিৎকার করে বললেন, "হাঁ করে আবার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস বাপধন? টাকা কি আমি মরবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবো? যা আছে সব বেচে দে—শুধু ওই সরষের তেলটুকু ছাড়া।"

কর্মচারীরা ভাবলো, কালোবাজার-কুলতিলক ঘনশ্যামের মাথায় নিশ্চয় কোনো স্পেশাল ব্যবসাবুদ্ধি খেলেছে—তাই সরষের তেলটুকু ছাড়া সব বাজারে ছেড়ে দিচ্ছেন। ঘনশ্যামের উদারতায় অভিভূত খদ্দেরদের একজন—ইস্কুলমাস্টার সন্তোষ মুখুজ্যে গদির কাছে এসে ঘনশ্যামের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "কী উপকার যে করলেন, সাধুখাঁমশায়—বাড়িতে এক ফোঁটা নুন ছিল না, কেরোসিনের অভাবে দুদিন বাড়িতে কোচিং ক্লাস বন্ধ রেখেছি। ছেলেরা না পড়লে মাইনে দেবে না।"

ঘনশ্যাম হঠাৎ সন্তোষ মুখুজ্যের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে বললেন, "আমাকে আর এইভাবে লজ্জা দেবেন না। আমি উপকার করবার কে? এই বেবিফুড, নুন, কেরোসিন এসব কি আমার বাবা তৈরি করেছেন? এসব তো আপনাদের জন্যেই অন্য জায়গা থেকে আমি কিনে এনেছি!"

ঘনশ্যামের হাত ধরে সন্তোষ মুখুজ্যে বললেন, "এতোই যখন করলেন, তখন একটু সরষের তেল ছাড়ুন। তেলের অভাবে বড়

কষ্টে আছে ব্রাহ্মণী।"

হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন তিপান্ন বছরের ঘনশ্যাম সাধুখান। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, "ওই অনুরোধটা করবেন না, মাস্টারমশাই। আমার এস্টকের সরষের তেল খাইয়ে আপনাদের চোখের এবং বুকের বারোটা বাজাতে পারবো না। আমার নিজস্ব মিলের তৈরি জিনিস তো, আমি জানি সরষের সঙ্গে কিসের ভেজাল মেশানো হয়।"

"এতো তেল তাহলে কী হবে, বাবু?" কাঁদ-কাঁদ হয়ে জিজ্ঞেস করে "খাঁটি" সরিষার তৈল ডিপার্টমেন্টের হেড কর্মচারী নলিনী সৎপথী।

ঘনশ্যামবাবু জানেন তাঁর গুদোমে অন্তত দশ লক্ষ টাকার তৈল মজুত আছে। তবু তিনি সহজভাবে বললেন, "ফুড ইন্সপেক্টরকে খবর দাও, আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দাও, সমস্ত তেল নর্দমায় ঢেলে দাও—তোমাদের যা-ইচ্ছে করো। আর এইসব যদি কিছুই না করতে চাও—তাহলে 'মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী' এই স্ট্যাম্প লাগিয়ে সমস্ত তেল কোনো রঙের কারখানায় অর্ধেক দামে বিক্রি করে এসো।"

এমনই অভাবনীয় ও নাটকীয় পরিস্থিতিতে হন্তদন্ত হয়ে ঘনশ্যামের উত্তরাধিকারী তিনকড়ি ভিড় ঠেলে বাবার সামনে হাজির হলো। "বাবা বাবা!" কাতরভাবে ডাকছে তিনকড়ি।

ঘনশ্যামবাবু বললেন, "বাবা তিনকড়ি, দু'দিনের জন্যে সংসারে এসেছি—বস্তাখানেক কাগজের নোট জমিয়ে রেখে কী লাভ হবে?"

বাবাকে সামলাবার চেষ্টা করবার আগে তিনকড়ি দোকান

থেকে কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় সরিয়ে দিলো। ঘনশ্যাম কিন্তু সকলের সামনেই বললেন, "তিনকড়ি, তেলের টিনের ওপর তো ঘোষণা করা আছে : ভেজাল প্রমাণে একশ টাকা পুরস্কার। ওই একশ টাকাই আমার হাতে দে—আমি নতুনভাবে জীবন শুরু করবো।"

ভয় পেয়ে তিনকড়ি প্রথমে কাঁদতে শুরু করলো। বাবার যে সিরিয়াস কিছু একটা হয়েছে তা সে আন্দাজ করছে। বাবার হাতদুটো চেপে ধরে কাঁদ-কাঁদ মুখে তিনকড়ি বললো, "বাবা, আপনি চুপ করুন। আপনার মুখ দিয়ে এইভাবে কথাবার্তা বেরুলে আমাদের সর্বনাশ হবে—পুলিস, ফুড ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্সের লোকরা এখনই হাজির হবে, আমাদের জেলে যেতে হবে।

ওসব কোনো কথা ঘনশ্যামের মাথায় ঢুকছে না। সেবাচরণকে ডেকে তিনি বেমালুম বললেন, "আমাদের গমের চাকির ডান দিকে লোহার প্লেটখানা সরিয়ে ফেলো—মাটির তলায় ওখান থেকে একটা স্টিলের বাক্স বেরুবে। তার মধ্যে দেড়লাখ টাকার নোট রেখেছি, কখন কী দরকার হয় এই ভেবে।"

"বাবা! বাবা!" তিনকড়ি এবার বাবার মুখ চেপে ধরবার চেষ্টা করলো।

ছেলের হাত সরিয়ে দিয়ে জনসমক্ষে ঘনশ্যাম বললেন, "বাবা তিনকড়ি, তোর মায়ের কাছ থেকে লকারের চাবিগুলো নিয়ে আয়। স্বনামে বেনামে তিনটে চারটে শহরে আমাদের একত্রিশটা ব্যাংক লকার আছে—কোনো একটা ব্যাংককে আমি এতোদিন বিশ্বাস করতে পারিনি।"

বাবাকে কোনোরকমে হাতে-পায়ে ধরে তিনকড়ি এবার পৈতৃক নিবাস সাধুধামে নিয়ে গেল। সাধুপত্নী এবং পুত্রবধূ ভাবলেন নিশ্চয় কোনো জটিল ব্যামো—আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে তাঁরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করলেন।

বিব্রত তিনকড়ি মাকে বকুনি লাগিয়ে বললো, "হার্ট অ্যাটাক নয়—বাবা হঠাৎ কী সব ভুল বকছেন। তোমরা পাখার হাওয়া চালিয়ে যাও। আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।"

টনটনে জ্ঞান নিয়ে ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছিস কেন? আমার তো কিছু হয়নি। আমি পাপের ধন রাখবো না, সব ফাঁস করে দেবো।"

সাধুপত্নী চারুহাসিনী কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় বললেন, "ওরে ডাক্তার নয়, তোরা পুলিসকে খবর দে। যা খুনখারাপীর রাজত্ব চলছে—কেউ নিশ্চয় তোর বাপকে ভয়টয় দেখিয়েছে।"

খাল কেটে কেউ এই সময় পুলিস আনে না। তিনকড়ি বললো, "ডাক্তার আসুক—প্রাইভেট ডিটেকটিভও আসুক। আমি রিটায়ার্ড ডেপুটি কমিশনার এবং বড়লোকদের বিশ্বস্ত ডিটেকটিভ ত্রিনয়ন ঘোষালকে খবর দিচ্ছি।"

ব্যাগ হাতে ডাক্তার নীহার ঘোষ এসে দ্রুত ঘনশ্যামের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন, "হার্ট, লাং, ব্লাড প্রেসার সবই তো ঠিক রয়েছে—আমি তো কোনো গোলমাল দেখছি না।"

তিনকড়ি কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় বললো, "ডাক্তারবাবু, বাবার মাথাটা।"

নীহার ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, "ঘনশ্যামবাবু, কেমন ফীল করছেন?"

"চমৎকার, ডাক্তারবাবু—চমৎকার। অনেক বছর পরে মনটা বেশ ফুরফুরে হাল্কা লাগছে। অম্বলের রুগীর বমি হয়ে যাবার পরে যেরকম স্বস্তি লাগে—আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে। মনের ওপর এতদিন যেন একটা আড়াইমণি বাটখারা চাপানো ছিল।"

তিনকড়ি কেঁদে ফেললো। "ডাক্তারবাবু, আমার বাবার কী হলো! আপনি আর একবার ভাল করে দেখুন।"

বিছানার ওপর উঠে বসে ঘনশ্যাম এবার বললেন, "ডাক্তার, লাস্ট দশ বছরে সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটার বিচি এবং আরও নানা রকম অখাদ্য মিশিয়ে আমি কত লোকের সর্বনাশ করেছি ভাবলে আমার চোখে জল আসছে। তুমি আমাকে ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলো—আমার মতো দুষ্টু লোকের বেঁচে থেকে লাভ কী?"

"ওঁকে মারবেন না—ডাক্তারবাবু। শুধু এখনকার মতো ঘুম পাড়িয়ে দিন। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এইসব ভুল-বলা বন্ধ করিয়ে দিন।" টকটকে লালপাড় কাপড়-পরা চারুহাসিনী দেবী এবার ডাক্তারের কাছে কাতর আবেদন করলেন।

ডাক্তার নীহার ঘোষ বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। সুস্থ সবল লোক, টনটনে জ্ঞান রয়েছে, কোনোরকম মানসিক বিকারের লক্ষণ নেই। এহেন লোককে কী করে তিনি পাগল ঘোষণা করেন? অথবা ঘুমের ওষুধ দেন?

বিছানা থেকে ওঠবার চেষ্টা করে ঘনশ্যাম সাধুখান বললেন, "খোকা, নরেন বোসের বিধবা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁকে একটু খবর দে। সদ্যবিধবাকে ঠকিয়ে জলের দামে আমি জয়নগরের একশো বিঘে জমি হাতিয়ে নিয়েছিলাম।"

"ওই দেখুন ডাক্তারবাবু—বাবা ভুল বকছেন। ডাক্তারবাবু,

ব্রেনে টিউমার হয়ে এমন বিকার হতে পারে?" তিনকড়ি চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রায় ভেঙে পড়লো।

ডাক্তার নীহার ঘোষ কোনোদিন এই ধরনের ব্রেন টিউমারের কথা শোনেননি। গম্ভীরভাবে বললেন, "যাই হোক, এই ধরনের জলজ্যান্ত সুস্থ সবল লোককে আমি পেথিডিন দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতে পারবো না।"

ঘনশ্যাম কেশে বললেন, "ঠিক বলেছো, নীহার ভায়া। ওরা আমাকে পাগল ভাবছে। আমার মনে হচ্ছে—এতোদিন পাগল হয়ে ছিলুম, এই সবে সুস্থ হতে আরম্ভ করেছি।"

এবার তিনকড়িকে ডাকলেন ঘনশ্যাম। "বাবা তিনকড়ি, আমার লাইফে কোনো কিছু ব্ল্যাক রাখবো না—সব হোয়াইট করে ফেলবো।"

ডাক্তার নীহার ঘোষের সহযোগিতা না পেয়ে তিনকড়ি বিরক্ত ও দুঃখিত হলো। এমন বিপদের দিনে ডাক্তারবাবু তাকে দেখলেন না, অথচ প্রতি মাসে ওঁর বাড়িতে ন্যায্য দামে কেরোসিন, নুন, চিনি পাঠাচ্ছে তিনকড়ি। ঠিক হ্যায়। তিনকড়ির সেন্ট জন অ্যামবুলেন্সের ট্রেনিং আছে—বন্যার সময় রিলিফের কাজে বহু ইনজেকশন দিয়েছে তিনকড়ি। বাবাকে সে-ই এখনকার মতো একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে দেবে।

ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া মাত্রই ডিটেকটিভ ত্রিনয়ন ঘোষাল পাইপ মুখে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘনশ্যামের হাত ধরে নাটকীয় কায়দায় তিনি বললেন, "ত্রিনয়ন ঘোষাল যতক্ষণ আছে—কোনো ভয় নেই—যত খুশি টাকাকড়ি, সোনাদানা, বিষয়-সম্পত্তি আপনারা করুন—কোনো ব্যাটা পুলিস আপনাদের কিছু করতে

পারবে না। এখন যেসব সিনিয়র পুলিস অফিসার দেখছেন এসব তো আমার হাতে তৈরি। এদের অনেকে তো আমার কাছে প্রোবেশনার ছিল। আমি কলম না ধরলে এদের চাকরি পাকা হতো না। কোনো অফিসার সার্চে এলে আড়ালে ডেকে বলে দেবেন, ত্রিনয়ন ঘোষালের ক্লায়েন্ট আপনি। ম্যাজিকের মতো হাতে হাতে ফল পাবেন।"

তিনকড়ি বললো, "পুলিসের কোনো হাঙ্গামা হয়নি। ওদের সঙ্গে পাকাপাকি মাসিক ব্যবস্থা তো আপনি নিজেই করে দিয়েছেন!"

"তাহলে? সি বি আই? গোল্ড কনট্রোল? আই টি থেকে বাড়ি তল্লাশি করতে এসেছিল নাকি?" ত্রিনয়ন জানতে চাইলেন।

না। ওসব কিছুই না, জেনে ত্রিনয়ন একটু বিরক্ত হলেন। "তাহলে আমাকে অমন জরুরী কেস বলে ডেকে পাঠালেন কেন? আমি অহ্নিকটা পর্যন্ত সেরে আসতে পারলাম না।"

তিনকড়ি বললো, "আমি ছিলাম না। দুপুর সাড়ে-তিনটের সময় হঠাৎ বাবা বেবিফুডের দু'নম্বর স্টক সমস্ত বার করে দিতে বললেন।"

ত্রিনয়নবাবু এবার ঘনশ্যামের কাছে গিয়ে বললেন, "ঘনশ্যামবাবু, কোনো উগ্রপন্থী ছোকরা প্রাণের ভয় দেখিয়ে আপনাকে টেলিফোন করেছিল কি? আমার কাছে কিছু চেপে রাখবেন না।"

ঘনশ্যাম বললেন, "এতদিন আমি চেপে রেখেই তো এই অবস্থা হয়েছে। আমি কারো কাছে কিছু চেপে রাখবো না। কেউ আমাকে প্রাণের ভয় দেখায়নি। মিস্টার ঘোষাল, সেবারে আমাদের মিলের

ইউনিয়নের ছোঁড়াটাকে গুণ্ডা দিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া করিয়ে দিলেন। তার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি ছোঁড়াটাকে পুনর্বহাল করতে চাই।”

“ওসব কথা স্বপ্নেও ভাববেন না, ঘনশ্যামবাবু। বহু কষ্টে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আপনার মিল থেকে গোখরো সাপ বিদেয় করেছেন,” ত্রিনয়নবাবু বললেন। বাড়ির সবার সামনে এইসব অতি গোপনীয় কথা ঘনশ্যামবাবু খোলাখুলি বলে ত্রিনয়নবাবুকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলছেন।

ইতিমধ্যে তিনকড়ির ইনজেকশনের ফল আরম্ভ হয়েছে। ঘনশ্যামবাবু গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন।

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ত্রিনয়ন বললেন, “ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে। তুমি ঠিক জানো, বাবাকে কেউ প্রাণের ভয় দেখায়নি?”

“প্রাণের থেকেও বাবা টাকা বেশি ভালোবাসেন। এর আগেও তো উড়ো চিঠি এসেছে—কিন্তু বাবা কখনও এইভাবে ভেঙে পড়েননি।”

তিনকড়ির কথা শুনে হাসলেন ত্রিনয়নবাবু। তারপর তাকে আড়ালে ডেকে বললেন, “তোমার ওয়াইফ এবং মাদারের সামনে কথাটা পাড়লাম না—তুমি নিজেও একটু সাবধানে থেকো। প্রাণের চেয়েও প্রিয় দুটি জিনিস আছে তোমার বাবার—টাকা এবং তুমি। হয়তো তোমার সম্বন্ধেই কোনো ভয়টয় দেখিয়েছে—বলেছে ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ না করলে ছেলে গুম করবো।”

দাঁত বার করে হেসে ফেললো তিনকড়ি। “সেটা সম্ভব নয়, কাকাবাবু। কারণ অয়েল মিলের ব্যাপারে বাবা স্বাস্থ্যবিভাগে

রিপোর্ট করতে বললেন। অয়েল মিলটা আমার নামে—তার মানে আমার নির্ঘাত কয়েক বছরের জেল হবে। বাবা যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসতেন এবং সুস্থ থাকতেন তাহলে এসব ঘটতো না।"

প্রয়োজনীয় প্রাইভেট গার্ডের ব্যবস্থা করে, ত্রিনয়নবাবু সাধু ভাণ্ডারের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

শোনা গেল এক সাধু দুপুরের দিকে দোকানে এসেছিল। একটা সিকি পেয়ে সেই সাধু আশীর্বাদ করে গেল—তোর মুক্তি হোক। তার থেকেই এই বিপদ হলো কিনা কে জানে?

চার আনার সাধুদের ক্ষমতার উপর ত্রিনয়নবাবুর এতো বিশ্বাস নেই। আজকাল অবশ্য এনফোর্সমেন্ট পুলিসের কিছু লোক সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও কে কে এসেছিল, কী ধরনের ফোন এসেছিল, ত্রিনয়ন ঘোষাল জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

সেবাচরণ বললো, "ডজন ডজন লোক এসে যেমন জিজ্ঞেস করে বেবিফুড আছে কি না—তেমন লোকজন এসেছে। বাবু অমায়িক হেসে সবাইকে বলেছেন, 'বেবিফুড থাকলে আমরা কেন বেচবো না বলুন? সেন্ট্রাল গভরমেন্ট এদিকে মাল আসতে দিচ্ছে না—ওরা চায় না আমাদের এদিকের ছেলেরা দুধ মাখন খেয়ে সুস্থ সবল হোক।' এর মধ্যে দু'একজন দশ টাকার নোট ভাঙিয়েছে—ঘনশ্যামবাবু হাসিমুখে দোকানের বহু বছরের ট্রাডিশন মতো নোট ভাঙিয়ে দিয়েছেন। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি সিগারেট খেয়েছেন, তার দশ টাকার নোট ভাঙিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন—আসছে সপ্তাহে আসুন, যদি একটু কেরোসিন দিতে পারি।"

ত্রিনয়নবাবু আর সময় নষ্ট করলেন না। বাজে বিবরণ শুনে লাভ কী? পরের দিন আবার আসবেন তিনি।

ঠিক ভোর সাড়ে-তিনটের সময় ঘনশ্যামবাবুর ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙামাত্রই তিনি বহুদিনের অভ্যাসমতো কোমরের ঘুনসিতে হাত দিয়ে চাবির খোঁজ করলেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন—"আমার চাবি? চাবি!"

চারুহাসিনী দেবী স্বামীর পাশেই জেগে ছিলেন। বললেন, "ভয় নেই, চাবির গোছা আমি তুলে রেখেছি।"

সানন্দে চারুহাসিনী দেবী পুত্র তিনকড়িকে ডেকে আনলেন। ঘনশ্যাম এতোক্ষণে আবার স্বাভাবিক ফর্মে ফিরে এসেছেন। বললেন, "খোকা, বেবিফুডের কিছু স্টক আজ বাইরে পাচার করে দিতে হবে, মনে থাকে যেন।"

"স্টক? কাল তো আপনি সব দানছত্র করে দিয়েছেন।" তিনকড়ি দুঃখের সঙ্গে অভিযোগ করলো।

"আমি দানছত্র করে দিয়েছি?" চোখের কোল দিয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে ঘনশ্যামের। গতকাল বিকেলে কী যেন হয়ে গিয়েছিল। ধরা গলায় ঘনশ্যাম বললেন, "জানিস খোকা, হঠাৎ যেন মনে হচ্ছিল আমার মধ্যে আমি নেই।"

তিনকড়ি বললো, "যা সর্বনাশ হবার তা হয়েছে। আপনাকে আর একটু আগে ঘুমের ওযুধটা দিতে পারলে কেরোসিন এবং নুনের স্টকটা বাঁচানো যেতো।"

তার উপর ইনকাম ট্যাক্স এবং পুলিসের লোকরা এসে কী গোলমাল বাধায় তার ঠিক নেই। কাল সারারাত ধরে তিনকড়ি যতখানি পেরেছে টাকাকড়ি সোনাদানা অন্যত্র পাচার করেছে। শুধু

ওই আটা-চাকির তলায় রাখা বাক্সটা ভিড়ের মধ্যে বেহাত হয়েছে। দোকানের কর্মচারীরাই ওটা সরিয়েছে বলে তিনকড়ির বিশ্বাস। কিন্তু তখন তিনকড়ি বাবাকে সামলাবে, না সামান্য দেড়লাখ টাকার পিছনে ছুটবে?

ঘনশ্যামবাবুর শরীর পরীক্ষার জন্যে সকালে ডাক্তার নীহার ঘোষ আবার এসেছিলেন। ওখান থেকে ফিরে, নিজের চেম্বারে এসে ডাক্তার ঘোষ তাঁর প্রফেসরকে কল বুক করলেন। ঘনশ্যামবাবুর মতো আশ্চর্য কেস কখনও তাঁর নজরে পড়েনি। রিপোর্ট শুনে মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর ক্ষেত্রীও তাজ্জব। "কোনো ব্রেন টিউমার থেকে এরকম হতে পারে নাকি, স্যার?" ডাক্তার ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার বিদ্যেতে অন্তত জানা নেই," প্রফেসর ক্ষেত্রী উত্তর দিলেন।

ঘোষ আবার জানতে চাইলেন, "কোনো ভাইরাস ইনফেকশন থেকে?"

প্রফেসর ক্ষেত্রী ওধার থেকে হেসে উঠলেন, "আমেরিকায় শুনেছি, দু'একটা বড়লোকের এমন ঘোড়ারোগ ধরে—যথাসর্বস্ব তারা দান করে বসে।"

ডাক্তার নীহার ঘোষের সামনে মোটা চামড়ার ব্যাগ হাতে বসেছিল অবনীদাস ব্যানার্জী, মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। রোগা লম্বা ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো চেহারা। বয়সে তরুণ, কিন্তু মাথায় বিচিত্র আকারের টাক—ঠিক যেন জাপানী প্রথায় চুল কেটে কে ইন্ডিয়ার ম্যাপ উল্টো করে মাথার তালুতে বসিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, "আপনি তো মশাই, নামকরা ফরেন

ওষুধ কোম্পানি কাইজারের রিপ্রেজেনটেটিভ। এই ধরনের কোনো রোগের ওষুধ আছে কিছু আপনাদের?" এই বলে ঘনশ্যামবাবুর পুরো কেসটা বলে গেলেন নীহার ঘোষ।

গভীর আগ্রহে প্রতিটি বিবরণ শুনলো এ ডি ব্যানার্জি ওরফে অবনীদাস ব্যানার্জি। নীহার ঘোষ বললেন, "ঠিক দুপুর সাড়ে-তিনটের সময় আমার পেশেন্টের ক্রাইসিস আরম্ভ হলো, এবং এগজ্যাটলি বারো ঘণ্টা পরে ভোর সাড়ে-তিনটেব সময় রুগী নরম্যাল হয়ে নিজমূর্তি ধারণ করলো : আবার নুন, তেল, কেরোসিন লুকিয়ে রেখে টু-পাইস কামাবার আকাঙক্ষা ফিরে এলো।"

অবনী ব্যানার্জি যেরকম আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত রোগলক্ষণ নোট করতে লাগলো তাতে নীহার ঘোষ অবাক হলেন। অবনী ব্যানার্জি প্রশ্ন করলো, "একটা পয়েন্ট, ডাক্তারবাবু, আপনার পেসেন্টের পরের দিন ব্ল্যাক মার্কেটের ইচ্ছে কি আগের থেকেও স্ট্রং হলো?"

"এটা তো একটা ইন্‌টারেস্টিং কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছেন। দাঁড়ান, পেশেন্টের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে দেখি।" এই বলে নীহার ঘোষ ফোনে তিনকড়ির সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে বললেন, "ঠিক আন্দাজ করেছেন মশাই। আমার পেসেন্ট—নামটা আপনাকে প্রফেশনাল কারণে বলতে পারছি না—এখন বাড়তি পয়সা কামাবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। বলছে, ছোলার ডাল, দেশলাই, ঘি, মোমবাতি সব বাজার থেকে লোপাট করে দাও, আমি আজই লাখ টাকা কমাতে চাই।"

একজন অর্ডিনারি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ এতো ডিটেলে এই আজব কেসের কথা শুনে কী করবে? "আপনার হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠাবেন বুঝি?" মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার

নীহার ঘোষ। একটু অপ্রস্তুত হয়ে অবনী ব্যানার্জি বললো, “বুঝতেই তো পারছেন, স্যার!”

ঘোষের চেম্বার থেকে বেরিয়ে, রিকশায় নিজের বাড়িতে ফিরে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলো অবনী ব্যানার্জি বি. এস-সি (ক্যাল), এম. এস-সি (ইলিনয়)। শেষের ফরেন ডিগ্রিটা কোনো কাজে লাগেনি অবনীর—কাইজার কোম্পানিতে চাকরির অ্যাপ্লিকেশন পাঠাবার সময় ওই ডিগ্রিটার কথা সে চেপেই গিয়েছিল।

আনন্দের উত্তেজনায় অবনী হঠাৎ নাচতে আরম্ভ করলো। শব্দ পেয়ে অবনীর মাসিমা এবং একমাত্র অভিভাবিকা সুশীলা দেবী ছুটে এসে দেখলেন, বুশ শার্ট খুলে ফেলে বগলকাটা সামারকুল গেঞ্জি এবং টেরিকটনের প্যান্ট পরে তাঁর বোনপো উদ্দাম নৃত্য করছে। এই নাচ দেখলে তাঁর ভয় লাগে। বেশি লেখাপড়া শেখার লোভে ফরেনে গিয়ে, অবনী যখন হঠাৎ ফিরে এলো, তখন তাঁর ভয় হয়েছিল, দিদির ছেলেটা বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামপাসেই অবনীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কেতকী রায়ের। সর্বগুণের পাত্র অবনীকে পেলে যে কোনো ইন্ডিয়ান মেয়েরই ধন্য হয়ে যাবার কথা। কেতকীর সঙ্গে অবনীর অনেকখানি জমেও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবনীর ওই ইন্ডিয়ার ম্যাপের মতো পিকুলিয়ার টাক প্রজাপতির নির্বন্ধে বাদ সাধলো, কেতকী রায় নির্দ্বিধায় অবনীকে ইস্তফা দিয়ে তার তুলনায় যথেষ্ট নিরেস কিন্তু ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক মাদ্রাজী যুবককে বিয়ে করলো।

আগেই অবনীর মাথা থেকে চুল উঠেছিল, এই মর্মান্তিক ঘটনার পর পড়াশোনা মাথায় উঠলো। ডক্টরেটের কাজে ইস্তফা দিয়ে বিভ্রান্ত অবনী আচমকা দেশে ফিরে এলো। টাক সম্বন্ধে রিসার্চ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবনী। মানুষের যতরকম ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, তার মধ্যে টাকই যে সবচেয়ে গুরুতর, এসম্বন্ধে অবনীর মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেমিস্ট্রির দুঁদে ছাত্র অবনীর জীবনে এখন একটি মাত্র পণ—টাকের বিনাশ অথবা শরীর পাতন।

অবনীর বিয়ের জন্যে মাসিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অবনীকে বুঝিয়েছেন, মাথা জোড়া টাক থাকলেও অবনীর মতো পাত্রকে আইবুড়ো মেয়ের বাবারা লুফে নেবেন। অবনী ওইসব শুনে আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ওইখানেই তো অবনীর আপত্তি। মেয়ের বাবার রেকমেন্ডশনে মেয়ের মন জয় করতে চায় না অবনী। অবনী এতোদিনে নিশ্চিন্ত হয়েছে, কোনো মেয়ে স্বতপ্রণোদিতভাবে টাকমাথা গলিয়ে কোনো পুরুষের গলায় মাল্যদান করতে চায় না।

অবনীর বন্ধু, কবি সাংবাদিক বুলু পাল তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে—চুল এমন একটা জিনিস না আমাদের না থাকলেও চলে যায়। সরকারী কোনো তালিকাতেও চুলকে এসেনশিয়াল কমোডিটি বলে স্বীকার করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ মানুষের চুলকে আমরা পছন্দ করি না—না হলে নিয়মিতভাবে দাড়ি কামানো এবং চুল কাটবার জন্যে সভ্যসমাজে এতো সময় এবং অর্থ ব্যয় করা হয় কেন? স্বল্পভাষী অবনী চুপ করে বন্ধুর কথা শুনেছে, কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। নিজের গোঁ থেকে সে এক চুল সরে আসতে রাজি নয়। যৌবন বসন্তে তার প্রথম প্রেমের নায়িকা

তন্বীশ্যামা কেতকী রায়ের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান অবনী কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

টাকের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, পরিণতি, আকার এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে অবনী নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে পড়াশোনা করেছে। টাকের নিরাময় ও বিলুপ্তি সম্বন্ধে গোপনে বহু রাত্রি জেগে গোপন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিল অবনী। নিতান্ত পেটের দায়ে একটা চাকরি করতে হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চটপট ওষুধ কোম্পানির কাজ সেরে এসে অবনী নিজের গবেষণাগারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাসিমা চোখের জল ফেলেন। ছেলেটার বন্ধু-বান্ধব সব বিদায় নিয়েছে—মাইনের সব টাকা ওই বিকট রিসার্চে নষ্ট হচ্ছে।

গবেষক অবনী সম্প্রতি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিল। সাফল্যের শ্বেতবসনা দেবী হয়তো তার ওপর কৃপাবর্ষণ করবেন না। ক্রমশ অবনীর ধারণা হচ্ছিল, টাকের কোনো রাসায়নিক নিরাময় সম্ভব নয়। ওষুধ খাইয়ে বা মাখিয়ে কোনোদিন পৃথিবী থেকে টাক বিদায় করা সম্ভব হবে না। অবনীর আশঙ্কা, একমাত্র আণবিক পদ্ধতিতে এই জটিল ব্যাধির নিরাময় সম্ভব। সংবাদপত্রে এবং বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জার্নালে সম্প্রতি রিপোর্ট বেরিয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মরুভূমিকে সবুজ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। অবনীর মনে হলো, এই একই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কে মিনি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কেশ বপন ও বর্ধন হয়তো সম্ভব। কিন্তু অবনী রসায়নের ছাত্র এবং সেই সঙ্গে আচমকা মনে পড়ে গেল, কাজল-কালো চোখের কেতকী রায় অ্যাটমিক সায়ান্সের মেডিক্যাল প্রয়োগ নিয়েই ডক্টরেট করছিল। হায়! কেতকী এবং অবনী দু'জনে যদি এই টাক নিয়ে যৌথ গবেষণা চালাতে পারতো,

তাহলে পৃথিবীর এক আদিম সমস্যার এতদিনে নিশ্চয় সমাধান হতো। কোটি কোটি নরনারীর গভীর গোপন দুঃখের অবসান হতো।

কেতকীর কথা মনে পড়লেই বেচারা অবনীর মানসিক ভারসাম্য সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। বিমর্ষভাব কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লাগে।

অবনী নিজেকে বোঝায়, সে পুরুষমানুষ। পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথে চলাচলের জন্যেই ঈশ্বর পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই নতুন উদ্যমে সে গবেষণার কাজ শুরু করে হতাশার ভাব কাটিয়ে, অবনী সম্প্রতি দেশের সুপ্রাচীন কিংবদন্তি, রূপকথা এবং উপকথার মধ্য থেকে কেশ বর্ধনের নানা উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলি গবেষণায় লাগাবার চেষ্টা করছিল। নিজের মনে অবনী বিড়বিড় করতো "কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুল কেমন করে সম্ভব হলো? রূপকথার রাজ্যে কোথাও তো আমরা টাকের ইঙ্গিত পাচ্ছি না। ঘৃণিত রাক্ষস-রাক্ষসীদের মাথাতেও আমরা যথেষ্ট চুল দেখতে পাচ্ছি।" বেচারা মাসিমা আজকাল হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মনের দুঃখে নিজের মাথা কামিয়ে ফেলতে ফেলতে তিনি নাপিতকে বলেছিলেন, "নেড়ার নেই টাকের ভয়।" বোনপোর দুঃখে বিগলিত হয়ে তিনি কেতকী রায়কে অনেক গালিগালাজ করেছেন। আপন মনে তিনি বকবক করেছেন, "কী যুগ পড়েছে! আমাদের সময়ে তো ভাবতেই পারতাম না, পাত্তরের পিছনে গিয়ে দেখবো তার টাক আছে কি না। বরং টাক মানেই টাকা, আমরা জানতাম। আজকালকার ধাড়ী আইবুড়ো মেয়েরা যে কী হয়েছে!"

গবেষণার কাজের জন্যেই ঘনশ্যামের অয়েল মিল থেকে অবনী

কিছু সরিষার তেল আনিয়েছিল। ঘনশ্যামকে মাঝে মাঝে অবনী দু'একটা স্যাম্পেল ওষুধ উপহার দিয়েছে। অবনীর আশা ছিল তাকে অন্তত ঘনশ্যাম খাঁটি সরিষার তেল দেবেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

সৌভাগ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজও অঘটন ঘটে। সত্যিকথা বলতে কী, বড় বড় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অঘটনটাই ঘটনা। নানারকম শাস্ত্রীয় গাছগাছড়ার মিশ্রণে তৈরি ওষুধে প্রয়োজনীয় ফল না পেয়ে চিন্তিত অবনী রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখলো ঘনশ্যামের তেল মোটেই খাঁটি নয়—ভেজালে পরিপূর্ণ। রাগে অর্ধোন্মত্ত অবনী মনে মনে মনে বললো, "এই ব্যাটা ভেজাল-ওয়ালাদের জব্দ করবার যদি কোনো ওষুধ বার করতে পারতাম!"

ভাগ্যলক্ষ্মী এবার অবনীর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন! গভীর রাতে নানা চিন্তা করতে করতে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ হাত ফসকে সিগারেটটা কেমিক্যাল সলিউশনে পড়ে গেল। সিগারেটটা তুলে টেবিলের এক পাশে ফেলে রেখে অবনী আর একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। একটু পরে অবনী প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল ; এবং সেই সময় বাড়ির ঠাকুর-কাম-চাকর গদাধর ল্যাবরেটরি ঘর ঝাঁট দিতে এসে অবনীর পরিত্যক্ত সিগারেট তুলে নেয়। সায়েবের বাক্স থেকে সিগারেট চুরি করার অভ্যাস গদাধরের অনেক দিনের।

প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে অবনী দেখলো অবাক কাণ্ড। গদাধর সোজা তার ঘরে এসে বললো. "দাদা, তুমি আমাকে মারো। আমি অনেকদিন তোমার বাক্স থেকে সিগারেট চুরি করে খাচ্ছি। আজও টেবিলে যে সিগারেট পড়েছিল তা খেয়েছি।"

তারপর তাজ্জব ব্যাপার। গদাধর কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করলো, প্রতিদিন বাজার থেকে সে ষাট-সত্তর পয়সা সরাচ্ছে। মাসিমার রুপোর পানের ডিবে কাক নিয়ে যায়নি—সে-ই সরিয়ে ফেলে বাজারে বিক্রি করেছে।

গদাধর বললো, "দাদা, আমি বুকটাকে হালকা করতে চাই। তোমার মানিব্যাগ থেকে চুরি করে, বাজার থেকে সরিয়ে এবং আরও নানা ভাবে সাঁইত্রিশ টাকা জমিয়েছি। আমার টিনের বাক্সর মধ্যে টাকাগুলো রয়েছে। আগামী কাল দেশে পাঠিয়ে দেবো ভেবেছিলাম। তুমি ওই টাকা ফেরত নিয়ে আমাকে শাস্তি দাও। তুমি পুলিস ডাকলেও আমার কিছু বলবার থাকবে না।"

স্তম্ভিত অবনী কোনো শাস্তিই দিল না গদাধরকে। বললো, "মাসিমাকে কিছু বলতে হবে না! আর কখনও চুরি করিস না।"

দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ পায়চারী করলো অবনী। তারপর সেই ঐতিহাসিক শিশি থেকে কয়েকফোঁটা তেল নিয়ে নিজের ওপর কীসব গবেষণা করলো। সারাদিন দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলো অবনী। মাসিমা ও গদাধর হাজারবার ডাকা সত্ত্বেও ঘর থেকে বেরিয়ে ভাত খেলো না।

বারো ঘণ্টা পরে বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে অবনীর মনে হলো বিজ্ঞানের বিধাতা তার জন্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন। পরীক্ষাটা সে প্রথমে ঘনশ্যাম সাধুখানের ওপরেই চালাবে। নোট ভাঙাবার নাম করে দুপুরবেলায় অবনী সাধু ভাণ্ডারে গিয়েছিল। ঘনশ্যামকে কথায় কথায় অবনী বলেছিল, "এবারে যে সরষের তেল দিয়েছেন অতি চমৎকার।"

পান চিবোতে শয়তান ঘনশ্যাম বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে

উত্তর দিয়েছিল, “আপনারা চেনাশোনা পার্টি—আপনাদের কি খারাপ জিনিস দিতে পারি? ওপরে কি ভগবান নেই?”

এরপর ঘনশ্যামকে একটা সিগারেট অফার করেছিল অবনী। ঘনশ্যাম না বলেননি। তার পরবর্তী ঘটনা তো সকলেরই জানা!

ডাঃ নীহার ঘোষের চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে ছোট্ট কেমিক্যাল শিশিটার দিকে অবনী বারবার তাকাচ্ছে এবং ঈশ্বরকে নমস্কার জানাচ্ছে। অবনী প্রথমে ভাবলো নিজের নামটাই বৈজ্ঞানিক জগতে সে অমর করে রাখবে। তার এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের নাম দেবে—Abani-1 সংক্ষেপে A-1! কিন্তু সেই হৃদয়হীনা সহপাঠিনী কেতকীর মুখটা সাফল্যের এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে অবনীর চোখের সামনে ভেসে উঠছে! বুকটা অব্যক্ত কারণে টনটন করছে। অবনীর স্বগতোক্তি : ‘কেতকী আজও তোমাকে মনে আছে। ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া।’ অবনী ও কেতকী দু’নামের আদ্যাক্ষরের যুগলমিলন ঘটিয়ে তার প্রথম আবিষ্কারের নাম দিলো AK-1।

বারবার তিন বার। ‘এ কে ওয়ান’ সম্পর্কে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেনি অবনী। সে তাই আর একটা সিগারেটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা কেমিক্যাল মিশিয়ে নিলো। তারপর সোজা ট্যাক্সি নিয়ে ওষুধপাড়ার বিখ্যাত কোম্পানি ত্যাগী এন্ড মহাত্মা প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেকটর সত্যনারায়ণ চোরাড়িয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলো। চোরাড়িয়াজীর সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে অবনীর পরিচয় আছে। লোকটাকে বহুবার সন্দেহ করেছে অবনী। কিন্তু কখনও জালে ফেলতে পারেনি।

"কেয়া খবর, ভাইসাব?" এই বলে চোরাড়িয়া নিজের সিগারেট বার করে অবনীকে দিতে গেলেন।

অবনী বললো, "ভাইসাব, আপনি তো রোজই সিগ্রেট পিলাচ্ছেন, আজ গরিবের একটা সিগ্রেট খান।"

অর্ডিনারি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ অবনী ব্যানার্জির পকেটে দামী ব্র্যান্ডের সিগারেট দেখে চোরাড়িয়াজী ভাবলেন, ছোকরা আজকাল তাহলে বাঁ-হাতে টু পাইস করছে! চোরাই ওষুধ কেনা-বেচার মুকুটমণি চোরাড়িয়া বললেন, "আপনারা আমার ইয়াংগার ব্রাদারের মতো। সাম্পুল ঝেড়ে দেবার ইচ্ছে হলে আমার কাছে আসবেন— সোব বেওস্থা করে দেবো।"

সিগারেট খাবার পরের ঘটনা নাটকীয়। চোরাড়িয়াজীর অবস্থা সাধুখানের থেকেও শোচনীয়। ওঁকে ঘুম পাড়াবার কোনো লোক ছিল না। রাত্রের বেতার সংবাদে নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করা হলো, 'ওষুধ-পাড়ার এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী আজ জীবনরক্ষাকারী ওষুধ জালের অভিযোগে থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন। এই ব্যবসায়ীটির বসতবাটি এবং বিভিন্ন অফিস খানাতল্লাশি করে সরকারী অফিসাররা কয়েক লক্ষ টাকার সোনার ইট, হীরে জহরত এবং মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য ওষুধ উদ্ধার করেছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই প্রশংসনীয় কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

অভিনন্দনের এই ব্যাপারটা শুনে খিল খিল করে হাসতে লাগলো অবনী। সেই আওয়াজ শুনে মাসিমা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো তোর?"

"কিছু নয়। হঠাৎ কাতুকুতু লেগে গেলো," এই উত্তর দিয়ে

তখনকার মতো মাসিমাকে নিবৃত্ত করলো অবনী।

এরপর শহরের ধনী ব্যবসায়ী মহলে প্রবল উদ্বেগ ও উত্তেজনা। দুটো ঠাণ্ডা মাথার বিজনেসম্যান হঠাৎ কেন সাময়িকভাবে বেসামাল হলেন তা সংশ্লিষ্ট মহলে কেউ বুঝতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটা রহস্যাবৃত মনে হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ত্রিনয়ন ঘোষাল নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না। সবাই ওঁর কাছে উপদেশ চাইছে। চোরাড়িয়াজীও মিস্টার ঘোষালের ক্লায়েন্ট।

পুলিস সদর দপ্তরের কাছে খাবারের দোকানে অবনীর সঙ্গে ত্রিনয়নের আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল। অনেকদিন থেকেই দু'জনের পরিচয়। মিনি-হাতি সাইজের সেজ মেয়েটিকে অবনীর ঘাড়ে চাপানোর জন্যে ঘটক মারফত ত্রিনয়ন একবার চেষ্টা করেছিলেন।

একসঙ্গে মিষ্টি খেতে খেতে ত্রিনয়ন গম্ভীরভাবে বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে দুটো কেসেরই কোনো কানেকশন নেই। দুটো ক্ষেত্রেই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে প্রায়-ল্যাংটা সাধু ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। ক্লায়েন্টের আপিসে সাধু দেখলেই পাকড়াও করে আমাকে খবর পাঠাতে বলেছি।"

"তাহলে তো রহস্যমোচনের সূত্র পেয়ে গিয়েছেন।" অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে মন্তব্য করলো অবনী।

"তাই মনে তো হচ্ছে, মিস্টার ব্যানার্জি। কিন্তু বন-জঙ্গল ছেড়ে পয়সার ধান্দায় আজকাল এতো সাধু এই শহরে ঘোরাঘুরি করছে যে ব্যাপারটা কাকতলীয় হতে পারে," বললেন রহস্যসন্ধানী ত্রিনয়নবাবু।

ত্রিনয়ন বললেন, "আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার দুই মক্কেলই টাকা হারানোর শোকে বুক চাপড়াচ্ছে। ডবল এনার্জি নিয়ে তারা এখন দু'নম্বর টাকা রোজগারের চেষ্টা করছে।"

রাজভোগের ডিশ শেষ করে ত্রিনয়নবাবু বললেন, "যদি কেউ এই রহস্য সমাধানে সাহায্য করে, তাকে আমরা নগদ ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।"

এর পরে কী করবে অবনী? এই অভাবনীয় আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশের সরকারকে এখনই জানানো উচিত। সাংবাদিক বন্ধু বুলু এখন রাজধানীতে বিশেষ সংবাদদাতার কাজ করছে। ওকেই টেলিফোন করলো অবনী। প্রাইম মিনিস্টার অথবা হেলথ মিনিস্টার এই ধরনের কারুর সঙ্গে বিশেষ ব্যাপারে সে দেখা করতে চায়। বুলু রসিকতা করলো, "ব্যাপারটা কী? টাকোন্নয়ন কি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একতিয়ারে পড়ে? আমার তো মনে হয় তোর যুবমঙ্গল বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা উচিত।" আরও কথা বলার আগে তিন মিনিটের ডিমান্ড টেলিফোন কল শেষ হলো।

বুলুর পরামর্শমতো অবনী তার আবিষ্কারের সামান্য একটু ইঙ্গিত দিতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে একান্ত গোপনীয় চিঠি লিখলো। চিঠিতে সে সাবধান করে দিয়েছিল, জাতীয় স্বার্থে এই আবিষ্কারের ব্যাপারটা যথাসাধ্য গোপন রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

এর পরের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটতে লাগলো। তৃতীয় দিনে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন এলো, কিন্তু রাজধানী থেকে নয়, ওষুধশিল্পের মক্কা প্রায়-নিউ ইয়র্ক মার্কা পশ্চিমের এক স্বদেশি শহর থেকে। বিশ্ববিখ্যাত এক ওষুধ কোম্পানির খোদকর্তা এখনই তাঁর সঙ্গে

দেখা করার গোপন নিমন্ত্রণ জানালেন অবনীকে। এইসব কোম্পানির কর্মদক্ষতার পরিচয় মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই পাওয়া গেল। ট্রাঙ্ক-টেলিফোন নামাবার কয়েক মিনিট পরেই বিখ্যাত এক ট্রাভেল এজেন্টের কোকিলকণ্ঠী স্থানীয় প্রতিনিধি ফোনে মধুরকণ্ঠে সময়োচিত অভিনন্দন নিবেদনের পর জানতে চাইলেন, অবনীর পক্ষে কোন্ প্লেনে যাওয়া সুবিধে হবে। মহিলা আরও বললেন, অবনীর ইচ্ছেমতো সব কিছু ব্যবস্থা করার নির্দেশ তাঁরা হেড অফিস থেকে পেয়েছেন। পাঁচতারা মার্কা দু'তিনটে বিখ্যাত হোটেলের নাম উল্লেখ করে মহিলা জানতে চাইলেন, অবনী কোথায় থাকা পছন্দ করবেন?

নতুন এয়ারপোর্টে বিমান থেকে নেমেই এক মাথা-খারাপ-করে-দেওয়া আধুনিক সুন্দরীর খপ্পরে পড়লো অবনী। ওষুধ কোম্পানির বড় সায়েবের সোস্যাল সেক্রেটারি তাকে রিসিভ করতে এসেছেন। একগুচ্ছ দামী ফুল হাতে সুন্দরী মহিলাটি যখন অবনীর লাগেজ টিকিটের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন রাত ন'টা।

ভি-আই-পি আদরে মিস খিদমতজী সমুদ্রের ধারে এক আশ্চর্য রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন অবনীকে। এই ধরনের হোটেল আরব্য উপন্যাসের রঙিন ফিল্ম সংস্করণ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। অবনী নিজেও এই ধরনের পঞ্চতারকাখচিত ইন্দ্রপুরীতে কখন পদার্পণ করেনি।

অবনীর হাত-ব্যাগটা সযত্নে নিজের হাতে তুলে নিয়ে মিস খিদমতজী চটুলচরণে হোটেলের লিফটে চড়লেন। বৈদ্যুতিক বোতাম টেপা মাত্রই প্রচণ্ড বেগে লিফটের স্বর্গারোহণ আরম্ভ

হলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উনিশ তলায় পৌঁছে লিফটের অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। সুহাসিনী সঙ্গিনী এবার অবনীকে হোটেল ঘরে পৌঁছে দিলেন। এবং বললেন, আগামীকাল সকাল সাড়ে-আটটার সময় জনসন সায়েবের বাড়িতে মিটিং।

বিশ তলার ছাদে যে ঘূর্ণায়মান বিলাস-রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে সম্মানিত অতিথিকে নৈশভোজের জন্যে নিয়ে যাবার মধুর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন মোহময়ী মিস খিদমতজী। বিখ্যাত এই বিলাস কেন্দ্রে ব্যবসা ও চলচ্চিত্রের উজ্জ্বলতম তারকাদের নিত্য আনাগোনা; কিন্তু অবনী এখন ক্লান্ত—নিজের ঘরে বসেই সে চারখানা রুটি এবং আলুচচ্চড়ি খেয়ে নিতে চায়। অতিথি আপ্যায়নে তুলনাহীন মিস অবন খিদমতজী মিষ্টি হেসে রুম সার্ভিসে ফোন করে নানা সুখাদ্য অর্ডার দিলেন। অবনীর আড়ষ্টতা ভাঙাবার জন্যে বললেন, "আমার কথা ভেবেই তোমাকে কিছু খেতে হবে। আমারও বেশ খিদে পেয়েছে।"

খাবারের সঙ্গে ফরাসি হোয়াইট ওয়াইনের বোতল খুললেন উদ্ভিন্নযৌবনা মিস খিদমতজী। মিষ্টি হেসে, সোনালি চুড়ির আওয়াজ বাড়িয়ে সুন্দরী বললেন, "হোয়াট এ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! আমার নাম অবন আর তোমার নাম অবনী! উই মাস্ট সেলিব্রেট দিস!"

কম বয়সের কোনো মেয়ে কখনও এত আদর করে অবনীকে খাওয়ায়নি। অবনী মোহিত। ডিনারের শেষে অবন আবার টেলিফোন তুললেন। এঁটো বাসনপত্র ঘর থেকে দ্রুত নিয়ে যাবার জন্যে রুম সার্ভিসকে নির্দেশ দিলেন। হোটেলের সুসজ্জিত অ্যাটেনডেন্ট দু' মিনিটেই হুকুম তামিল করে দু'জনকে শুভরাত্রি

জানিয়ে বিদায় নিলো।

অবনী অভিভূত। অল্প বয়সী সুন্দরী মহিলাদের এই ধরনের স্মার্টনেস এদেশে সে দেখেনি। অফিসের সাধারণ একজন সোস্যাল সেক্রেটারিও যে এতো কাজের হতে পারে তা অবনীয় জানা ছিল না। এদেশের সুন্দরী মেয়েরা যে ওয়ার্লডের বেস্ট, এসম্বন্ধে অবনীর মনে এখন একটুও সন্দেহ নেই। অবনী এবার আন্তরিকভাবে সঙ্গিনীকে বললো, "আমার জন্যে আপনি অনেক কষ্ট করলেন।" মিস খিদমতজী অত্যন্ত সহজভাবে বললেন, "এখনও কিছুই করবার সুযোগ দাওনি তুমি।"

বৈজ্ঞানিক অবনী সুন্দরীর এই কথার তাৎপর্য না বুঝে চুপচাপ বসে রইলো। সঙ্গিনী অধৈর্য হয়ে উঠলেন। দুষ্টু হাসিতে মুখ ভরিয়ে সুসজ্জিতা ও সুগন্ধা মিস খিদমতজী এবার কাজলকালো চোখের সুইচ টিপে অবনীকে বিশেষ ধরনের ইঙ্গিত করলেন। মোহমুগ্ধ অবনী স্বপ্নালু চোখে অবনের লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো মুখের দিকে তাকালো। অবনের কেশসজ্জাও আধুনিক—চুলগুলো ধুনুচি স্টাইলে চুড়োর মতো করে বাঁধা। বিজন ঘরে নিশীথ রাতের এই রোমান্স অবনীর বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু মিস খিদমতজী নিশ্চয় তার টাক দেখেননি। তাই ছুতো করে অবনী এবার পিছন ফিরলো। উর্বশী মিস খিদমতজীর তবু মত পরিবর্তন হলো না। গভীর অর্থভরা ছন্দে দেহবল্লরী কাঁপিয়ে তিনি অবনীর কানের কাছে মুখ এনে মধুগুঞ্জন করলেন, "হাউ হ্যান্ডসাম ইউ আর।"

বেশ ঘাবড়ে গেলো অবনী। পিছন থেকে তার টাক পুরোপুরি দেখার পরেও কোনো সুন্দরী জীবনে এই প্রথম অবনীর কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল না। কিন্তু অবনী কোনো মেয়েকেই ঠকাবে

না। যদি কোনো কারণে মিস্ খিদমতজী তার টাক না দেখে থাকেন এই সন্দেহে অবনী কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো, "সুন্দরী, তুমি আমার মাথার পিছন দিকটা দেখেছো?"

সুপুষ্ট ও সুগোল বুকের ওপর থেকে নরম সিল্কের আঁচল ইচ্ছে করে খসিয়ে দিয়ে মিস খিদমতজী বললেন, "কাম অন—তুমি আমাকে টিজ কোরো না। তোমার মতো যারা জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে মাথা ঘামায় তাদের তো চুল পাতলা হবেই!" আচমকা মিস খিদমতজী এবার কুসুমকোমল হাতে অবনীর থুতনি নেড়ে দিলেন।

মিস খিদমতজীর সুমধুর ব্যবহারে নতুন ধরনের আকর্ষণ বোধ করছে অবনী। অবনের স্বচ্ছ ব্লাউজের অন্তরাল থেকে রহস্যজনক-ভাবে উঁকি-মারা দুটি সতেজ সমৃদ্ধ উদ্ধত অঙ্গের কোমল আকর্ষণ তরুণ অবনীর পক্ষে ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। শাড়ির আঁচলে বক্ষসম্পদ লুকিয়ে রাখার কোনো-প্রকার চেষ্টা না করে দীর্ঘাঙ্গিনী মিস খিদমতজী এবার অবনীকে আহ্বান জানালেন, "কাম অন বৈজ্ঞানিক।"

আত্মসমর্পণের পূর্বমুহূর্তে ওই বৈজ্ঞানিক কথাটায় বিজ্ঞানসাধক অবনীর সম্বিত ফিরে এলো। হঠাৎ মনে হলো, বিদেশ বিভুঁইয়ে অপরিচিতা মোহিনীর মোহ তাকে বিপদে ফেলতে পারে।

মিস খিদমতজী ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে অবনীর অনুমতির প্রতীক্ষা না করে পাঁচ ইঞ্চি মোটা নরম ফোম-রবারের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। এই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গের বেশবাসের সবকটি স্তরই সুপরিকল্পিতভাবে শিথিল। এবার মোহময়ী ভঙ্গিতে চরম আহ্বান জানালেন মিস খিদমতজী, "আমি আর ধৈর্য

ধরতে পারছি না ডালিং। কাম অন।”

অবনী বেশ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু এবার মনস্থির করতে মাত্র এক মুহূর্ত লাগলো। চোখে মুখে লালসার ছাপ ফুটিয়ে আকারে ইঙ্গিতে সে সুন্দরীকে বুঝিয়ে দিলো, এই সব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে সে তাড়াহুড়ো পছন্দ করে না। মিষ্টি হেসে অবনী বললো, “আগে একটা সিগারেট খাওয়া যাক।”

“আমি সিগারেট খাই না।” শিথিলবসনা মিস খিদমতজী এই কথা বলাতে মাথায় হাত দিয়ে বসলো অবনী। সমস্ত পরিকল্পনাই তাহলে ভেস্তে গেল। কিন্তু হতাশ না হয়ে, শেষ চেষ্টা করলো অবনী। ডবলবেডে অর্ধশায়িতা সুন্দরীর দেহের কাছে সরে গিয়ে মিস খিদমতজীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো অবনী বললো, “আমার প্রথম অনুরোধটাই যদি না রাখলে, তাহলে আমি কী করে বুঝবো যে আমাকে পছন্দ হয়েছে তোমার?”

শয্যাশায়িনী সুন্দরী এর পর ‘না’ বলতে পারলেন না। শিথিল বেশবাস একটু সামলে নিয়ে মিষ্টি হেসে মিস খিদমতজী বললেন, “দুষ্টু কোথাকার! অন্য কেউ হলে, এতোক্ষণে আমি চলে যেতাম। কিন্তু আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাকে অবলাইজ করবো। তুমি যা বলবে তা শুনবো।”

অবনীর দেওয়া সিগারেট এবার হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন মিস খিদমতজী।

সিগারেটে কয়েক টান দিয়েই মহিলা একটু ঝিমিয়ে পড়লেন। এর পর মন্ত্রের মতো ফল হলো। মিস খিদমতজী সলজ্জভাবে বিছানা থেকে উঠে বডিস এবং ব্লাউজের হুক বোতামগুলো দ্রুত লাগিয়ে নিলেন। লজ্জায় মুখে হাত দিয়ে অবনীর সামনের চেয়ারে

বসে পড়লেন মিস খিদমতজী।

অবনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে মহিলা বললেন, "আমি মোটেই মিস্টার জনসনের সোস্যাল সেক্রেটারি নই। আমি এই পাঁচতারা হোটেলের সঙ্গে অ্যাটাচড আছি। অফিসের সেক্রেটারি হলে আমি কত মাইনে পেতাম? দেড় হাজার, দু' হাজার? আমি এখানে তোমাদের মতো ভি আই পি-দের বিনোদন করে প্রতি দিনে ওই টাকা রোজগার করি।"

এবার কাঁদতে লাগলেন বিনোদিনী মিস খিদমতজী। বললেন, "আমার দুঃখ কি জানো? রোজগারের টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি না। প্রতি মাসে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা জমা দিলে সঙ্গে সঙ্গে 'গাভমেন্ট' সন্দেহ করবে।"

মিস খিদমতজী বললেন, "তোমার কাছ থেকে সমস্ত গোপন খবর বার করে নেবার জন্যে স্পেশালি তৈরি হয়ে এসেছিলাম, মিস্টার ব্যানার্জি। বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখবে?" এই বলে মাথায় ঝুপড়ির মতো বাঁধা খোঁপার মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলেন মিস খিদমতজী। ওখান থেকে ছোট্ট আমেরিকান টেপ রেকর্ডার বেরিয়ে আসতে দেখে অবনীর লোম খাড়া হয়ে উঠলো। মিস খিদমতজী রুমালে নাক ও চোখ মুছে বললেন, "তোমার-আমার গোপন প্রেম এবং গুপ্ত-গৃহের সমস্ত কথাবার্তা ওখানে রেকর্ড হয়ে থাকতো।"

ভগবানকে নমস্কার জানালো অবনী, মস্ত এক ফাঁড়া থেকে রক্ষা পেয়েছে সে। মিস খিদমতজী বললেন, "আমি পিসিমার নামে সমুদ্রের ধারে ফ্ল্যাট কিনেছি, আমার কয়েক লক্ষ টাকার হীরে জহরত আছে। এসব আমি ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি তুমি আমাকে

ক্ষমা করো, ভালোবাসো।"

অবনী জানতে চাইলো, "জনসন সায়েব আমার খোঁজ পেলেন কোথা থেকে? এই শহরের কাউকেই তো আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে জানাইনি।"

মিস খিদমতজী বললেন, "কেন? রাজধানীর সরকারী দপ্তর থেকে। ওখানকার গোপন দরকারী খবরাখবর বিদ্যুতের বেগে এখানে চলে আসে—না হলে ব্যবসাবাণিজ্য চলবে কী করে?"

বহু কষ্টে, অবশ অর্ধচেতন মিস খিদমতজীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে হোটেলের একতলায় নামিয়ে এনেছিল অবনী। গাড়িতে ওঠবার সময় সুন্দরী বললেন, "তুমি তো আমাকে বিয়ে করবে না। কিন্তু একটা উপকার করো। শুধু আমাকে বলো, তুমি যা আবিষ্কার করেছো সেটা ট্যাবলেট না ইঞ্জেকশন?"

মজা বাড়াবার জন্যে অবনী বললো, "কাউকে বোলো না কিন্তু—ইঞ্জেকশন।"

সমুদ্রের ধারে পর্বতচূড়ায় আকাশ দীপের মতো বাড়ি। বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানির বিদেশী ম্যানেজিং ডিরেকটর মিস্টার জনসন সেখানেই সাদর আমন্ত্রণ জানালেন অবনীকে। প্রথম দশ মিনিট নানা অবান্তর বিষয়ে আলোচনা হলো। তারপর সুযোগ বুঝে জনসন বললেন, "আমার বহু স্থানীয় বৈজ্ঞানিক বন্ধু আছেন, তাঁদের সকলের মুখেই শুনেছি, এদেশের সায়ানটিস্টদেব কোনো সম্মান নেই। আমার বন্ধুরা আরও বলেন, বৈজ্ঞানিকদের নির্দিষ্ট কোনো দেশ নেই—তাঁরা হলেন পৃথিবীর নাগরিক।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে অবনী মন দিয়ে সাহেবের কথা শুনে

যাচ্ছে। বছর তিনেক আগে এই কোম্পানিতেই সামান্য একটা চাকরির আবেদন করেছিল অবনী, কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি।

মিস্টার জনসন বললেন, "বৈজ্ঞানিক হিসেবে এদেশে সবাই আপনাকে ঠকাবে, মিস্টার ব্যানার্জি। কিন্তু আমাদের সুইস কোম্পানির পলিসি আলাদা। আমরা মানুষকে সম্মান দিতে জানি। আপনার ফর্মুলাটা পেলে আমরা আপনার নামে, গোপন সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজার পাউন্ড দিতে পারি।"

চুপ করে রইলো অবনী। জনসন এবার হেসে বললেন, "আপনি হয়তো ভাবছেন, মরাল প্রবলেমের কেমিক্যাল চিকিৎসার জন্য ওষুধ পৃথিবীতে আপনিই প্রথম আবিষ্কার করেছেন। ব্যাপারটা সত্যি নয়। ফর ইওর ইনফরমেশন, আমাদের ল্যাবরেটরিতে গোপনে অনেকখানি কাজ এগিয়েছে—আমরা এমন এক ইঞ্জেকশন প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছি, যার একটি নিলে, মানুষের কোনো একটা স্পেসিফিক অন্যায় করতে ইচ্ছে করবে না।"

এখনও চুপ করে রইলো অবনী। জনসন বললেন, "আপনি চাইলে আরও রিসার্চের সুযোগ দেবো আপনাকে—এনি-হয়্যার ইন দি ওয়ার্লড।"

"আমার গবেষণার বিষয়—টাক," মিস্টার জনসনকে শান্তভাবে জানিয়ে দিলো অবনী।

"টাকসংক্রান্ত রিসার্চে আমাদের কোম্পানির কোনো আগ্রহ নেই, মিস্টার ব্যানার্জি। কোটি কোটি ফ্রাঁ জলে ফেলে এই সাবজেক্ট আমরা ছেড়ে দিয়েছি।"

অবনী বললো, "আমার হাতে যা সামান্য কিছু ফসল রয়েছে তা হলো টাক গবেষণার বাই-প্রোডাক্ট।"

মৃদু হেসে জনসন বললেন, "আপনার হাতে কি আছে, তার কিছু কিছু খবর আমাদের কাছে আছে বলেই তো আপনাকে নেমন্তন্ন করে এনেছি।"

অবনী বললো, আমাকে আপনারা সত্যিই অবাক করলেন। আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখবো।"

বিদায় নেবার আগে জনসন বলেছিলেন, "একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, মিস্টার ব্যানার্জি। সব সময় এমন একটা ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন, যা লক্ষ লক্ষ লোককে খাওয়ানো যায়। আপনি হয়তো আদর্শের উত্তাপে আপনার প্রতিভা দিয়ে এমন জিনিস আবিষ্কার করলেন, যা মাত্র গুটিকয়েক বড়লোকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা গেলো। কিন্তু তাতে আপনার লাভ কী? পুলিস এবং গভরমেন্ট ছাড়া সে ওষুধ কেউ কিনবে না। আপনি দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাবেন না। অথচ মাথা খাটিয়ে সেই একই জিনিস একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে তৈরি করুন, যা কোম্পানির মালিকদের পিছনে না লাগিয়ে কারখানার শ্রমিকদের খাওয়ানো যাবে। তাহলে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ট্যাবলেট বিক্রি হবে।"

অবনীর মাথায় আইডিয়া খেলে গেলো। জনসন যা যা বলতে চাইছেন, সেই মতে 'ব্ল্যাকিনন' বা এ-কে১ বার না করে অবনীর উচিত 'বোনাসিন' বা এ-কে২ আবিষ্কারের চেষ্টা করা। বোনাসিন হবে এমন ওষুধ যা খেলে শ্রমিকদের আর বোনাস দাবি করবার ইচ্ছে হবে না। বোনাস দাবির সময় তাদের মধ্যে ঝিমুনির ভাব আসবে, মনে হবে, "দূর! ঝুটঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। শ্লা বোনাসের কোনো দরকার নেই।"

প্লেনে নিজের শহরে ফিরবার পথে এই সিরিজের আরও ওষুধের কথা অবনীর মাথায় খেলে গেল। 'ওভারটিনন'—এ-কে৩। অফিসে, কারখানায়, ব্যাংকে তিনটের সময় শ্রমিক ও কর্মচারীদের চায়ের সঙ্গে এই ওষুধ গোপনে মিশিয়ে দিলে কোনো শ্রমিকের আর ওভারটাইমের লোভ হবে না। পাঁচটা বাজলেই যাতে বাড়ি যেতে পারে এই চেষ্টায় তারা ডবল স্পিডে কাজ তুলে ফেলবে। এ-কে১ কে একটু হেরফের করতে পারলেই এইসব ওষুধ সহজেই তৈরি করা যাবে—কিন্তু অবনীর এসব ইচ্ছে মোটেই নেই। ব্ল্যাকিনন নিয়েও সে মাথা ঘামাতো না, যদি না ঘনশ্যামবাবু ওইভাবে তাকে বিষ মেশানো সরষের তেল দিয়ে বিপদে ফেলতেন।

অবনীর সঙ্গে করমর্দন করে জনসন বলেছিলেন, "গতকাল আমি নিজে এয়ারপোর্টে যেতে পারিনি। আমাদের স্পেশ্যাল সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে ছিলাম। সে আপনাকে ঠিক মতো দেখাশোনা করেছে তো?"

অনেক কষ্টে অবনী হাসি চেপে রাখলো, বললো, "আপনাদের সোস্যাল সেক্রেটারিরা যে এরকম কাজের হয় তা আমার জানা ছিল না।"

নিজের শহরে ফিরে অবনী একটুও বিশ্রাম পেলো না। রাজধানী থেকে সরকারের এক বিশেষ প্রতিনিধি এসে গোপনে অবনীর সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তার রাজধানী যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভদ্রলোক প্রথমে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে অবনী রাজধানীতে যাক। পরে সরকারকে বিল করবে। কিন্তু

অবনীর গাঁট থাকলেও কড়ি নেই, রিচার্সের নেশায় সে সব টাকা খরচ করে ফেলেছে। সরকারী অফিসারকে তা বোঝাতে একটু সময় লেগেছিল।

রাজধানীতে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের পরে ব্যাপারটা অবশ্য অনেক সহজ হয়ে গেলো। পাঁচতারা সরকারী হোটেলে যতদিন খুশি থাকবার ব্যবস্থা হলো অবনীর। প্রাইম মিনিস্টার অভিনন্দন জানালেন অবনীকে। বললেন, "দেশের বৈজ্ঞানিকরা যদি ঠিকমতো আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে আমাদের সবুজ বিপ্লব, নীল বিপ্লব, কালো বিপ্লব সফল হবে—আর না হলেই লাল বিপ্লব আসবে।"

চাযবাসের ব্যাপারে সবুজ বিপ্লব কথাটা অবনী আগে শুনেছে। কিন্তু নীল, কালো ও লাল বিপ্লবের কথা জীবনে এই প্রথম শুনলো। প্রাইম মিনিস্টারের স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট পরে অবনীকে বলেছিল, "জিভ ফসকে আপনি দুটো টপ সিক্রেট বিপ্লবের ব্যাপার জানতে পেরেছেন—দেখবেন কেউ না জানতে পারে। নীল বিপ্লব মানে হলো নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমরা রপ্তানি বাড়িয়ে বাঘা বাঘা কানট্রির মাথা ঘুরিয়ে দেবো। কালো বিপ্লব মানে, কালো টাকা এই দেশে একটিও রাখা হবে না—সেন্টিমেন্টাল কারণে পরিবার পিছু একটি করে হিসাববহির্ভূত সিকি রাখবার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। আর লাল বিপ্লব তো মশাই অর্ডিনারি বিপ্লব—দুনিয়াভোর সেই ফরাসি বিপ্লব থেকে যা হয়ে এসেছে, মাথা কাটলেই রক্ত পড়ে!"

ব্ল্যাক রেভলিউশনের প্রধান অস্ত্র হতে পারে এই ব্ল্যাকিনন এ-কে১। প্রাইম মিনিস্টারের কাছে ঘনশ্যাম সাধুখানের কেসটা বর্ণনা

করতে যাচ্ছিল অবনী। মুচকী হেসে প্রাইম মিনিস্টার বললেন, "বিস্তারিত রিপোর্ট আমি পেয়ে গিয়েছি, ইনক্লুডিং দি চোরাড়িয়া ইনসিডেন্ট।" নিজস্ব গুপ্তচর বিভাগ প্রেরিত ওই সব রিপোর্ট পড়ার পরেই যে অবনীকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন, তা বোঝা যাচ্ছে!

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, "এই ধরনের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবই আমি আশা করেছিলাম। ধনীরা নিজে থেকে সৎ হবে এটা এ যুগে আশা করা শক্ত। তোমরা সৎ থেকে, পরিশ্রম করে, ভালোবাসা দিয়ে দেশকে বাঁচাও—এই আবেদন নিবেদন তো আমার মিনিস্টাররা রোজ রোজ বক্তৃতায় প্রচার করে এলিয়ে পড়লেন। এখন কেমিস্ট্রি আমাদের সাহায্যে আসবে—কারুর কাছে আর আবেদন নিবেদন করতে হবে না।"

এর পর কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে বললেন প্রাইম মিনিস্টার। তারপর সুপার ক্যাবিনেটের এক টপ সিক্রেট মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে হবে অবনীকে।

হোটেলে ফিরতেই মাথায় হাত দিয়ে বসলো অবনী। কে বা কারা তার জিনিসপত্র তছনছ করেছে। ভাগ্যক্রমে কিছু চুরি যায়নি। মিটমিট করে হাসলো অবনী। যা চুরি করবার জন্যে তারা এসেছে, তা হোটেলে ফেলে রেখে যাবার পাত্র নয় অবনীদাস ব্যানার্জি।

সরকারী প্রতিনিধি অবনীকে এর পর ওই হোটেলে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। বললেন, "প্রাইভেট সেকটরে আর একটা পাঁচতারা হোটেল আছে। সেখানে চলুন।"

এই হোটেলে এলাহী আয়োজন। বিছানা থেকে সুইমিং পুল দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা স্পেশাল ঘর পেলো অবনী।

তারপর অবনী রেডিও খুলে খবরে শুনলো, প্রধানমন্ত্রী রাজধানী

স্কুটার-ট্যাক্সি ড্রাইভারদের এক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশ এমন এক চাঞ্চল্যকর কাজ করতে পারে যা সারা বিশ্বকে আবার বিস্মিত করবে।

সাংবাদিক বন্ধু বুলু পালের অফিসে অবনী পরের দিন গিয়েছিল। বুলু বললো, "আচমকা এই ঘোষণা করে গতকাল প্রাইম মিনিস্টার আমাদের বড্ড ভুগিয়েছেন। ফলো আপ করতে গিয়ে কিছুই পাই না—সরকারী অফিসাররা মুখ খুলবে না। একজন ভড়কি দিলো, পেট্রোলের বদলে জল দিয়ে গাড়ি চালাবার পদ্ধতি বেরিয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছো, সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একেবারে টপসি-টার্ভি হয়ে যাবে। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, ব্যাপারটা একদম বাজে। কোনো এক রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট তিনটে জলের ট্যাংক বসাবার জন্যে আর্থিক অনুমতি চেয়েছে।"

"তারপর?" অবনী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে। তার নিজস্ব আবিষ্কারের খবরটা বুলুর কাছেও টপ সিক্রেট রেখেছে অবনী। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে তার সাক্ষাতের খবরটাও সে জানে না।

বুলু পাল বললো, "শেষে কে জি বি এবং সি আই এ দুটো মহল থেকেই সহযোগিতা পেলাম। কে জি বি-র ধারণা, প্রধানমন্ত্রী বলতে চাইছেন, আমরা হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত—অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবে। সি আই এ-র ধারণা, আমরা আই-সি-বি-এম অর্থাৎ অন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়বো, যদিও কূটনৈতিক কারণে এই অস্ত্রকে বলা হবে, আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেপণযন্ত্র। হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করবার জন্যে রাজধানী থেকে যে কোনো রাজ্যের শহরে এই ক্ষেপণযন্ত্র দিয়ে পুস্তিকা,

প্রাচীরপত্র ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রচার সাহিত্য পাঠানো হবে।"

বুলুকে বিপথগামী করতে অবনীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তার মুখ বন্ধ। বুলু অবশ্য এসব ব্যাপারে তেমন চিন্তিত নয়। বললো, "রাজধানীতে থেকে এসব আমাদের সহ্য হয়ে গিয়েছে। আণবিক বিস্ফোরণই হোক আর ক্ষেপণযন্ত্রই হোক আমার কী এসে যায়? শুধু একটা পয়েন্ট, এই ধরনের ইম্পর্টান্ট ঘোষণা এক ডজন ফটফটিয়া ড্রাইভারের সামনে না করলেই পারতেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী।"

কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিনের শেষে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে অবনী ব্যাগ হাতে হোটেল ফাইভস্টারে ফিরলো। তার শরীর আর বইতে চাইছে না। সমস্ত জীবন ধরে ব্যাগ হাতে করে বহু ডাক্তারের কাছে সে কাইজার কোম্পানির মাল বেচেছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি। ঘরের ভিতর থেকে দরজা লক করে জামা-কাপড় খুলে ফেললো। অবনী। স্রেফ আন্ডারপ্যান্ট পরে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে সে মড়ার মতো শুয়ে রইলো। সমস্ত দিনে আজ যা হয়েছে তাতে মনটা হতাশায় ভরে উঠছে। ছবিগুলো পর পর ভেসে উঠতে আরম্ভ করলো।

প্রথম যে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে অবনী দেখা করলো তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর সঙ্গে কথা না বলে অবনী কেন প্রথমেই খোদ প্রাইম মিনিস্টারের কাছে দরবার করছে। "আফটার অল আপনি একজন অর্ডিনারী ওষুধ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ।"

অবনী উত্তর দিয়েছেন, কারও রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে সে রাজধানীতে আসেনি।

মন্ত্রী বললেন, "আপনার গবেষণার সমস্ত বিবরণ দিয়ে একটা বিস্তারিত নোট দশ কপি করে পাঠাবেন। সেই সঙ্গে অন্তত বারোটা আবিষ্কারের নমুনা পাঠাবেন।" অবনী মনে মনে ভাবলো, এই না হলে মন্ত্রী! সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

পরবর্তী মন্ত্রী মহাশয় এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পরে অবনীর সঙ্গে দেখা করলেন। ধূর্ত শৃগালের মতো সব শুনে বললেন, "প্রস্তাব আমি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবো, প্রোভাইডেড দেশের গভীর দক্ষিণে কোনো অনগ্রসর জেলায় কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব আপনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেন। মিটিং-এ প্রকাশ্যে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো, কারখানা আপনি পূর্বাঞ্চলে যেখানে আছেন সেখানেই করুন ; কিন্তু আপনি বলবেন টেকনিক্যাল কারণে তা সম্ভব নয়।"

অবনী বলছিল, "কারখানা। সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। এখন আমি শুধু গবেষণা করতে চাই। তার জন্যে আমার বাড়ির দু'-খানা ঘরই যথেষ্ট।"

মাননীয় মন্ত্রী মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, "ওসব পুরনো ট্রিকস আমার জানা আছে—এই বলে প্রথমে ল্যাবরেটরির স্যাংশন নিয়ে নেবেন। তারপর স্থানীয় পাবলিক আন্দোলন করুক, ল্যাবরেটরি যেখানে, সেখানেই কারখানা হোক।"

মাননীয় তৃতীয় মন্ত্রী বললেন, "আমি আপনাকে সর্ব রকম সাহায্য দেবো—কিন্তু আগে ওই ওভারটিনন ওষুধটা রেডি করতে হবে। অফিস টাইমে আমার পাবলিক সেকটর কোম্পানিগুলোব স্টাফ কোনো কাজ করছে না, সবাই ওভারটাইমের জন্যে উঁচিয়ে আছে।"

অবনী বললো, "ব্ল্যাকিনন-এর কাজ অনেকটা এগিয়ে রয়েছে—আমি যতদূর জানি দু'নম্বর টাকাই আপনাদের সবেচেয়ে বড় সমস্যা।"

"রাখুন রাখুন" এক বকুনি লাগালেন মাননীয় মন্ত্রী। টুথপিক দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে তিনি মন্তব্য করলেন, "সাদা টাকা কালো টাকার ব্যাপারটা মোহেনজোদারোর আমল থেকে সমস্ত পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু এই ওভারটাইমের কিছু একটা না করতে পারলে আমার তিন-চারটে রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি সামনের বছরেই লালবাতি জ্বালবে।"

উঠতে যাচ্ছিল অবনী। মাননীয় মন্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, একটা ইম্পর্টান্ট ব্যাপার—জনসংযোগের দিকটাও মনে রাখবেন। 'ওভারটিনন' নাম দিলে এক ব্যাটাকেও ওই জিনিস খাওয়াতে পারবো না। সাবসিডাইজড্ মিল্ক-প্রোটিন ফোটিন ইত্যাদি একটা আকর্ষণীয় নাম দেবেন, যাতে কোনরকম রেজিসটেন্স না হয়।"

মাননীয় শ্রীমতিরাম পরীক্ষিৎ সব শুনে অবনীকে মৃদু বকুনি লাগালেন, "আপনার এতো নেশনাল ইস্পিরিট—আর আপনার সৃষ্টির নাম দিলেন ফোরেন ল্যাংগোয়েজে! আপনি স্বদেশি নাম তোয়ের করুন।"

ব্ল্যাকিনন-এর জায়গায় 'কালামারী' শব্দটা ভেবেছিল অবনী, কিন্তু তেমন পছন্দ হয়নি। অবনী বললো, "এসব জিনিস রপ্তানি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।"

হা-হা করে হেসে পরীক্ষিৎজী বললেন, "ঠিক চিজ যদি বানাতে পারেন, দেশের ডিমান্ড মেটাতেই আমরা পাগল হয়ে যাবো। আমার তো সাজেসন দেশের প্রত্যেকটি লোককে বোছরে একবার

করে ওই 'গোলি' খাওয়ানো হোক—সব দেশওয়ালী ভাইয়ার কালা চীজের ওপর টান আছে!"

উঠতে যাচ্ছিল অবনী। কিন্তু পরীক্ষিৎজী চায়ের হুকুম দিলেন। বললেন, "আপনার বেসিক থিওরিটা কী? কালেজে আমারও সায়ান্স ছিলো।"

অবনী বললো, "কেমিক্যাল সলিউশন অফ স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড মরাল প্রবলেমস্। ওষুধ খাইয়ে মানুষকে দিয়ে আপনি যা করাতে চাইবেন তাই পারবেন। শুধু ওষুধের ক্ষেত্রে ফলটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না—এখনও পর্যন্ত আমরা মাত্র বারো ঘণ্টা ওষুধের অ্যাকশন পাচ্ছি।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রবীণ পরীক্ষিৎজী তাঁর স্বভাবমতো তিন চারবার ঘাড় কাঁপালেন। তারপর বললেন, "বারো ঘণ্টা হলেই আমরা 'হেপী', আমাদের চলে যাবে।"

"কী চলে যাবে?" অবনী কিছু বুঝতে পারছে না।

পরীক্ষিৎজী বললেন, "আমি নেক্স্ট চুনাওয়ের কথা ভাবছি। আপনি বললেন, এমন গোলি বার করা সম্ভব যার একটা খেলে কোনো একটা ইস্পেশাল পার্টিকে ভোট দিতে ইচ্ছে করবে।"

ভয়ে আঁতকে উঠলো অবনী। তবে আকস্মিক আবিষ্কারের এই ভয়াবহ দিকটা কখনও তার মাথায় আসেনি। সে বললো, "অবশ্যই এসব সম্ভাবনা আছে—কিন্তু ওই স্টেজে আসতে অন্তত আরও তিরিশ বছর লাগবে।"

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না পরীক্ষিৎজী। তিরিশ বছর, সে তো অনেক সময়—পঁচাত্তর বছরের পরীক্ষিৎজী তখন কোথায়?

একটা পাগলামো চেপে বসছে মাথায়। অবনীর ইচ্ছে করছে

এই বিরাট শহরের প্রত্যেক কেষ্ট বিষ্টুকে সে একটা করে সিগারেট খাওয়ায়। তারপর দেশে কী ফল হয়। কিন্তু অবনীর ওষুধের স্টক একেবারেই কমে এসেছে। এখানে এতোদিন থাকতে হবে তাও ভাবেনি অবনী।

চায়ের কাপ হাতে আন্ডার প্যান্ট-পরা অবস্থাতেই অবনী এবার জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। ফ্লাড লাইটের আলোয় সুইমিং পুলের নীল জলে বিকিনী পরা তন্বী নীলনয়না সুন্দরীরা জলকেলিতে মত্তা। মাঝে মাঝে তারা জলপরীর মতো বিশ্রাম নেবার জন্যে সজল দেহে সুইমিং পুলের ধারে এসে বসছে ; তারপর হঠাৎ যৌবনের মদমত্ততার ঝপাং করে আবার জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হঠাৎ অবনীর দৃষ্টি বিশেষ করে এক রমণীর দিকে আবদ্ধ হলো—এই রমণীটি নীলনয়না নন। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত নারীদেহ থেকে জাতি নিরূপণ করবার অভিজ্ঞতা অবনীর নেই। তবু হঠাৎ অবনীর মনের মধ্যে কবিতা গুন গুন করে উঠলো—"সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে, বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।"

জামাকাপড় পরে সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে ডাইনিং রুমে যেতে যেতে অবনী শুনলো, "অবনীদা না?"

অবনী চমকে উঠলো। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। জলে-ভেজা সুইমিং কসটিউমপরা সুললিত দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেতকী! হ্যাঁ কেতকী! হোয়াট এ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!

"কেতকী, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। গায়ে একটা কিছু দাও," গম্ভীরভাবে বললো অবনী।

কেতকী মেমসাহেবদের মতো দৌড়ে গিয়ে প্রায় ব্যালে নৃত্যের ছন্দে একটা টার্কিশ টাওয়েলের গাউন নিয়ে এলো। পশ্চিমী ভদ্রতা অনুযায়ী অবনীকে সেই ড্রেস পরিয়ে দিতে সাহায্য করতে হলো। অবনী যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছিল যাতে তার হাত কেতকীর দেহস্পর্শ না করে।

কেতকীর স্বামী মোহন সুন্দরমের কথা জানতে চাইলো অবনী। সে ভেবেছিল, ওরা দু'জনে নিশ্চয় একই সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছে। কেতকী গম্ভীর হয়ে গেলো। "সে চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গিয়েছে, অবনীদা। মোহন এবং আমি এখন আলাদা থাকি।"

প্রায় উলঙ্গ দেহের ওপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে কাউকে ডাইনিং হলে নেওয়া যায় না। অবনী নিজের ঘরে ফিরে চললো।

শাড়িতে সুসজ্জিতা হয়ে কেতকীও একটু পরে অবনীর ঘরে এসে বসলো। কেতকী এখন ওহায়োতে নিউক্লিয়ার মেডিসিন সংক্রান্ত গবেষণা করছে। অনেক দিন পরে আবার স্বদেশ দেখতে এসেছে।

অবনীর ভয় হলো, কেতকী এখনই জিজ্ঞেস করবে, সে কী করছে? কী উত্তর দেবে অবনী? ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে যদি কেতকীকে না একটু শুনিয়ে দিতে পারলো, তাহলে অবনীর বেঁচে কী লাভ?

কেতকীর দিকে তাকিয়ে আছে অবনী। ওকে ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে—মোহন সুন্দরম লেখাপড়ায় যতই হাঁদা গঙ্গারাম হোক, ডেলিকেট জিনিস যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। এক একটা কেয়ারলেস বেপরোয়া লোকের পাল্লায় পড়ে ওয়েল-প্রিজার্ভড সুন্দরী মেয়েরা বিয়ের ঠিক পরেই যেভাবে ধসে যায়! নিউক্লিয়ার

মেডিসিনের কোন্ শাখা নিয়ে কাজ করছে কেতকী? অবনীর প্রবল ইচ্ছা হলো, কেতকীকে বলে, টাকের বিষয়টা ভুলো না। আণবিক শক্তি ছাড়া এ বিষয়ে আর বোধ হয় কিছু করবার নেই। কিন্তু অবনীর মনে পড়লো, কেতকী এখন তার নয়, কেতকীকে উপদেশ দেবার কোনো অধিকার নেই তার।

কেতকী বোধ হয় এখন বিদেশে শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছে। ওর অনভ্যস্থ ঊর্ধ্বাঙ্গ থেকে ইম্পোর্টেড শাড়ির আঁচল নেমে এলো। আগেকার সময় হলে অবনী নিজের প্রাপ্তবয়স্ক চোখজোড়াকে, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতো। কিন্তু কেতকী এখন অন্য আর একজনের। অনধিকার অবলোকনের জন্যে অবাধ্য আঁখিকে অবনী নিঃশব্দ বকুনি দিলো।

অবনী জানালো সে আরও কয়েকদিন রাজধানীতে আছে। কেতকী বললো, সেও দু'একদিন থাকবে। সুতরাং অবশ্যই আবার দেখা হবে।

অনেকদিন ধরে বহু চেষ্টার পরে যাকে অবনী প্রায় ভুলে যেতে সক্ষম হয়েছিল, সেই আবার তার অনিবার্য আকর্ষণ নিয়ে এইভাবে তার জীবনপথের ধারে এসে দাঁড়ালো, নিজের চোখ দুটোতে হাত দিলো অবনী—এই চোখের মণিতেই কিছুক্ষণ আগে কেতকীর সম্পূর্ণ দেহ প্রতিফলিত হয়েছে।

অবনীর উচিত ছিল কেতকীকে বলা, তোমাকে জীবনে না পেলেও আমি তোমাকে সাধনার ছায়াসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছি। তোমার স্মৃতিকে অমর করে রাখবার জন্যেই নতুন আবিষ্কারে নিজের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে তোমার নামের প্রথম অক্ষরের রাজ-যোটক ঘটিয়েছি। হয়তো সাধারণ মানুষ এ-কে

শব্দের তাৎপর্য কোনোদিন জানতে পারবে না। কিন্তু মৃত্যুর আগে ছোট্ট একটা নোটে অবনী অন্তত কেতকীকে খবরটা লিখে জানিয়ে যাবে।

অবনীর ঘুম আসছে না। অনেক চেষ্টায় সে কয়েকঘণ্টা চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইলো। গভীর রাতে বিছানা থেকে উঠে বাথরুম যাবার পথে অবনী দেখলো দরজার কাছে তার নাম লেখা এই হোটেলেরই একটা খাম পড়ে রয়েছে। খাম খুলে অবনীর চোখ ছানাবড়া। একটা টাইপ-করা স্লিপে ইংরিজীতে লেখা—'কে জি বি কাছেই আছে। বিওয়্যার।'

কী ফ্যাসাদেই পড়লো অবনী। তার সামান্য আবিষ্কার সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাচক্রের ধুরন্ধররা কেন আগ্রহী হতে যাবে? বিশেষ করে কে জি বি! অবনী যতদূর জানে সোভিয়েট দেশে তো ঘনশ্যাম সাধুখান এবং সত্যনারায়ণ চোরাড়িয়ারা নেই।

অবনীর প্রশ্নের উত্তর ওই নোটের সঙ্গে আর একটা কাগজে লেখা আছে। "তোমার আবিষ্কারের রহস্য ওদের কাছে পরিষ্কার হলে মানুষের সমূহ বিপদ। স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মনে মনে গুমরোবার যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু ওদেশের নাগরিকের আছে তাও যাবে।"

অবনী আর ভাবতে পারছেন না। সেও একটা ঘুমের পিল খেলো। কিন্তু ঘুমিয়েও শান্তি নেই—সেখানে স্বপ্নের প্রতিটি ফ্রেমে কেবল একজনই বারবার আসতে লাগলো। তার নাম কেতকী, কেতকী এবং কেতকী।

পরের দিন সুপার ক্যাবিনেটের গোপন মিটিঙে যাবার জন্যে অবনী একটু তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলো। সুইমিং-পুলের

ধারের জায়গাটা অবনীর খুব ভালো লেগেছে। কেতকী এই ভোরেই জলে নেমেছে। একবার টুপ করে জলপরীর মতো ভেসে উঠে সে অবনীকে জিজ্ঞেস করলো, "সাতসকালে কোথায় চললেন?"

অবনীর ইচ্ছে হয়েছিল কেতকীকে জানিয়ে দেয়, "কেতকী, তুমি আমাকে নির্বাচন না করেছো, তার জন্যে আফসোস করবে, যদি বলি আমি সুপার ক্যাবিনেটের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। সরকারের স্পেশাল গাড়ি আমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে।" কিন্তু এসব কথা বলা যায় না। ঠোঁটে লেগে-যাওয়া মার্মালেড ন্যাপকিনে মুছতে মুছতে অবনী বললো, "কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সারতে যাচ্ছি।"

ব্যাগ হাতে অবনী যখন সরকারের গোপন সভাকক্ষে প্রবেশ করলো তখন ভারী শিল্পমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর মধ্যে 'অবনী আবিষ্কারের' প্রস্তাবিত কারখানা কোন্ মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হবে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে। এমন সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রবেশ।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "এটা খুবই দুঃখের বিষয়, সব মন্ত্রীর হাতেই কয়েকটা কলকারখানা আছে—এই পুওর ফরেন মিনিস্টার ছাড়া। মিস্টার ব্যানার্জির আবিষ্কারের ফলে কূটনৈতিক জগতে যে আন্তর্জাতিক ঝড় উঠতে পারে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কারখানা একমাত্র আমার আন্ডারে হওয়াই উচিত।"

মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী : ডিফেন্সের গুরুতর প্রয়োজনে যে জিনিস লাগবে তা কেমন করে ফরেন মিনিস্ট্রিতে যেতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না।"

ফরেন মিনিস্টার : "এই আবিষ্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যখন আণবিক বিস্ফোরণের মতো মস্কো, ওয়াশিংটন, কানাডা, লন্ডন, পিকিং-এ সমালোচনার ঝড় উঠবে, এদেশকে খয়রাতি দান বন্ধের প্রস্তাব উঠবে, তখন কে ঠেলা সামলাবে? প্রতিরক্ষা বিভাগ?"

আর একজন মন্ত্রী, যাঁর সঙ্গে ফরেন মিনিস্টারের সম্পর্ক ভালো নয় : "এর মধ্যে আবার পিকিং কেন? ওখানকার কাস্টমস ইনসপেকটরের সঙ্গেও করমর্দনের সুযোগ পেলে তো আমাদের ফরেন মিনিস্টার ধন্য বোধ করবেন। যতদূর বুঝেছি, এই আবিষ্কারের ফলে কালোবাজারীদের মূলোচ্ছেদে সম্ভব হবে, সুতরাং এই কারখানা অর্থমন্ত্রীর।"

ফরেন মিনিস্টার : "নোট ছাপার কারখানায় উৎপাদন বাড়াতেই তিনি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন—এতো নোটের উৎপাদন ওয়ার্লডে আর কোথাও নেই।"

স্বাস্থ্যমন্ত্রী : "আর্থিক সাশ্রয় করতে হলে এই কারখানা আমার আন্ডারেই থাকা উচিত। কবে কে কখন কালোবাজারী হবে, তার জন্যে অপেক্ষা করার ঝুঁকি না নিয়ে এ-দেশের প্রত্যেক নাগরিককে টিকে হিসেবে এই ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। আমার পরিবার পারকল্পনার সেট-আপ সর্বত্র রয়েছে, সুতরাং একই খরচে—পরিবারও ছোট থাকবে কালোবাজারীর হারও কমবে। তবে প্রোডাক্টের নাম পাল্টাতে হবে। গতকাল হোল নাইট জেগে আমার সেক্রেটারি একটা চমৎকার নাম তৈরি করেছেন—নিরোধ টু। এখনকার নিরোধকে আমরা নিরোধ ওয়ান বলে চালাবো।"

তর্ক এবং কথা কাটাকাটি যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন প্রাইম মিনিস্টারের প্রবেশ এবং অকস্মাৎ ক্লাসে পিন ড্রপ সাইলেন্স। প্রাইম

মিনিস্টার বললেন, "সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনারা এতো হৈ চৈ করছেন কেন? আপনারা একমত না হতে পারলে, অ্যাটমিক এনার্জির মতো এই বিভাগও আমার খাসে থাকবে। কিন্তু নাম কী হবে?"

ডিফেন্স মিনিস্টার : "এমন একটা নাম যে ধরি তো মাছ না ছুঁই পানি—গোছের হবে। লোকে যেন ব্যাপারটা প্রতিরক্ষার ব্যাপার না ভাবে।"

ফরেন মিনিস্টার : "শান্তিপূর্ণ গবেষণামূলক নাম হওয়া চাই। বিদেশে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচারে আমার ছেলেদের তাহলে সুবিধে হয়।"

অবনী এতক্ষণ মাথা নিচু করে এককোণে বসেছিল। প্রাইম মিনিস্টার এবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এনি সাজেশন?"

একটু লজ্জা পাচ্ছিল অবনী। কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার এদেশের কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদের মনের অবস্থা জানেন। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন, "লজ্জা কী? কাম অন অ্যাবনী?"

বিনয়ে বিগলিত অবনী বললো, "ব্যাপারটা যদি ধোঁয়াটে রাখতে চান, তাহলে অ্যাটমিক এনার্জির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম দেওয়া যেতে পারে অ্যাবনিক এনার্জি!"

প্রাইম মিনিস্টার সোৎসাহে নামটা গ্রহণ করায় সভার অন্য কেউ প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেলো না। ওঁরা ভেবেছিলেন, এই আবিষ্কারের সঙ্গে প্রাইম মিনিস্টারের বাবা অথবা ঠাকুরর্দার নাম জুড়ে দিয়ে ওঁকে খুশি করবেন।

এবার অন্য গোলমাল বাধলো। প্রাইম মিনিস্টার বললেন, "ব্ল্যাকিনন সম্পর্কে আমি রিপোর্ট পড়েছি—কিন্তু গোপনে

আমাদের সামনে এই আশ্চর্য ওষুধের কার্যকারিতা দেখানো প্রয়োজন।"

জনৈক তরুণ রাষ্ট্রমন্ত্রী : "যে কোনো একজন মনোপলি শিল্পপতিকে এখানে আনা হোক। আমাদের সামনেই তাঁকে ওষুধ খাওয়ানো হোক। আমরা ফলাফল দেখি।" ভদ্রলোক এবার গড়-গড় করে কয়েকটি দেশবিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় ধনপতির নাম বলতে লাগলেন।

"স্টপ, স্টপ।" চিৎকার করে উঠলেন পরীক্ষিৎজী। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "এই ধরনের চরিত্রহত্যা আমাদের পার্টির পছন্দ নয়। আপনারা তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে মিনিস্টারি করছেন। বিপদ-আপদের দিনে এঁদের কাছেই আমাকে ইলেকশন ফান্ডের জন্যে হাত পাততে হয়।"

আর একজন : "তা ছাড়া এইসব শিল্পপতিরা এখানে উপস্থিত নেই। কারুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগ ঠিক নয়।"

তরুণ মন্ত্রী : "লাও বাবা। অভিযোগের কী হলো? তাঁরা এসে আমাদের সামনে ওষুধ খাবেন—যদি তাঁদের ভিতরে কিছু না থাকে বেরুবে না।"

আইন মন্ত্রী : "এঁদের কাউকে আনতে গেলেই হেবিয়াস কর্পাস হবে, সুপ্রিম কোর্ট বাধা দেবেন। প্রাক্তন আদালতমন্ত্রী বিম্বিসার সেন তো এই এই ধরনের কেসের জন্যে উঁচিয়ে আছেন। সুপ্রিম কোর্টে আমাদের সংবিধানের কপি দেখিয়ে উনি আসামী খালাস করে নিয়ে যাবেন। ইন এনি কেস, অ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত না নিয়ে কিছুই করা যাবে না।"

তরুণ মন্ত্রী : "আমরা তো কোনো ধনপতিকে জোর করছি

না—তিনি স্বেচ্ছায় আসুন।"

আইনমন্ত্রী : "সেটা আরও সিরিয়াস ব্যাপার। সরকার বিষ-প্রয়োগের অভিযোগে পয়জনিং কেসে পড়ে যাবে। সামান্য টেলিফোনে আড়িপাতা নিয়ে অন্য দেশে কী কাণ্ড হয়েছে, তা তো আপনারা জানেন।"

এরপর প্রাইম মিনিস্টার প্রস্তাব দিলেন, "একচেটিয়া শিল্পপতির প্রয়োজন নেই—আমাদের এখানকার কেউ ভলানটিয়ার হোন। তাঁর ওপর ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

সভায় এবার প্রবল উত্তেজনা। কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। কেউ বললেন, "প্রাইম মিনিস্টার কি আমাদের ব্যক্তিগত সততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?" কেউ চোখের জল রুমালে মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি আমাকে সরাতে চান? তাহলে সোজাসুজি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিতে হুকুম করুন। আমি তো কখনও আপনার অবাধ্য হইনি।"

সভা তখনকার মতো ভঙ্গ হলো। আগামীকাল আবার মিটিং হবে।

ক্লান্ত অবনী এবার একটা কফির দোকানে একখানা মশলাদোসা খেয়ে মধ্যাহ্নভোজন পর্ব সারলো। তারপর সময় কাটাবার জন্যে বুলু পালের সঙ্গে দেখা করতে চললো। সাংবাদিক বুলু পাল বললো, "তোর সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে ছিল মাইরি। কিন্তু ভিতরের সোর্স থেকে শুনছি মন্ত্রিসভায় ক্রাইসিস। গতকাল পর্যন্ত বেশ হ্যাপি ফ্যামিলি ছিল। হঠাৎ কী ব্যাপার হলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—আমাকে ভাই এখনই উঠতে হবে। দু' একজন মিনিস্টারের মুখ যদি খোলাতে পারি।"

হতাশ হৃদয়ে হোটেলে ফিরে এলো অবনী। আর মাত্র কয়েক ফোঁটা ওষুধ অবশিষ্ট আছে তার কাছে। নিরাপত্তার জন্যে কাইজার কোম্পানির নেজাল ড্রপের শিশিতে ওষুধটা রেখেছে অবনী। পকেটে থাকলেও কেউ সন্দেহ করে না। সর্দিতে ব্যবহার করা জিনিস—কেউ ঘেন্নাতে হাত দেবে না।

নেজাল ড্রপের শিশিটা বের করে দেখলো অবনী। টেনেটুনে আরও দশটা সিগারেট তৈরি হতে পারে।

ক্লান্তি ও হতাশায় অবনী হঠাৎ রুম সার্ভিসে ফোন করে হুইস্কির অর্ডার দিলো। ড্রিংক করা অবনীর অভ্যাস নয়। শেষ ড্রিংক করেছিল যেদিন কেতকীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়। সেই দৃশ্যটা ভগ্নহৃদয়ে অবনী আজও ভোলেনি।

ইলিনয়ের কলেজ ক্যাম্পাসে অবনী তখন কেতকী কেতকী করে পাগল। কত বিড়ালাক্ষি বিধুমুখী তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবনী যে বৈদূর্যমণিটির সন্ধান পেয়েছে তার নাম কেতকী। রূপকথার এই রাজকন্যাটি যেন সাত সাগরের পারে অবনীর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। শুক্রবারের বিকেলে কতবার কেতকীকে নিয়ে ডেটিং-এ বেরিয়েছে অবনী। কোনো সায়েব ছোকরার সঙ্গে ডেটিং-এ বেরতো না কেতকী।

বেশ কয়েক মাস এইভাবে চলবার পরে আসরে আবির্ভূত হলো মোহন সুন্দরম—অবনীর থেকে এক বছরের জুনিয়র। কেতকী বলতে অবনী তখন অজ্ঞান। একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর কেতকীকে মেয়ে হোস্টেলের ঘরে পৌঁছে দিলো অবনী। আরও একটু সময় চুরি করবার জন্যে ওখানেই এক কাপ কফি খেলো অবনী। তারপর বেরিয়ে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে খেয়াল হলো গাড়ির

চাবিটা কেতকীর টেবিলে ফেলে এসেছে সে। দ্রুত ওর ঘরে ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অবনী।

কেতকী তার রুমমেট ডরোথিকে বলছে, "টাক হচ্ছে ডেকাডেন্সের প্রতীক। আজকাল টাক দেখলে আমার গা ঘুলিয়ে ওঠে। আমি কী যে করি।" ডরোথি বলছে, "টাকের মালিককে সোজা বলে দেবে, আমার কাছে এসো না।" কেতকী বললো, "আমার নতুন ফ্রেন্ড মোহনের কী সুন্দর ঘন কালো ঢেউ-খেলানো চুল, দেখেছো?"

অবনী এবার দরজায় টোকা দিয়েছিল এবং কোনো কথা না বলে চাবি নিয়ে সেই যে বেরিয়ে এসেছিল—আর কোনো সম্পর্ক রাখেনি। কিন্তু সেই রাত্রে কেতকীকে হারানোর বেদনায় অবনী হুইস্কির বোতলের সিকিভাগ শেষ করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়েছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করেছিল, পৃথিবীতে এত মাথা থাকতে এই টাকের বোঝা কেন আমার ওপর চাপালে প্রভু?

অবনী নিজেকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, টাকের অপমান মানেই তাকে অপমান নয়। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কেতকীকে হারিয়ে সে উন্মাদের মতো হয়ে পড়েছিল।

কলেজের গবেষণা মাথায় উঠলো। নিজেকে শান্ত করবার জন্যে বিদেশের পালা চুকিয়ে সে স্বদেশে ফিরে এসেছে। মেধাবী অবনীর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

রাজধানীর বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলের নির্জন কক্ষে বসে আজও হতাশা অনুভব করছে অবনী। ক্যাবিনেটের গোপন সভায় আগামীকাল কী হবে কে জানে?

এমন সময় টুং-টাং করে ঘরের বেল বেজে উঠলো। দরজা

খুলেই সুসজ্জিতা সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী কেতকীকে দেখলো অবনী।

"ডিসটার্ব করলাম না তো?" মিষ্টি শরীরের মালিক মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"আমার সমস্ত জীবনটাই তুমি ডিসটার্ব করেছো।" কেতকীকে এই সত্য কথাটা বলতে পারলে সুখী হতো অবনী। কিন্তু যা হবার তাতো হয়েছেই। গতস্য শোচনা নাস্তি, অবনী নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। অতিথিকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করলো অবনী।

কেতকী সোফায় বসলো। অবনীর সামনে হুইস্কির বোতল দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, "এসব ছাই-পাঁশ কবে থেকে ধরলে, অবনী?"

কী বলবে অবনী? উত্তরটা সোজা। "যেদিন থেকে বুঝলাম আমার পোড়া কপালে ছাই ছাড়া কিছু নেই।"

"এসব কী বলছো, অবনী?" ওর হাতটা ধরলো কেতকী।

অবনী হেসে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গেলাসে আর একটু হুইস্কি ঢেলে বললে, "জীবনে দু'বার হুইস্কি খেয়েছি, কেতকী—সেই যেদিন জানতে পারলাম তুমি আমাকে বিয়ে করবে না, আর এই এতোদিন পরে আজকে।"

কেতকী বললো, "তোমার সমস্ত গল্প শুনবো, অবনী। দেশে ফিরে এসে তুমি কী কী করলে, সব জানতে চাই।"

"যার মাথায় মস্ত টাক, তার সম্বন্ধে সময় নষ্ট করে কী লাভ?" দুঃখের সঙ্গে বললো অবনী।

কেতকী বললো, "কবে কমবয়সে কী অপরাধ করেছি, তা তুমি

আজও এইভাবে মনে রাখবে, অবনী?" একটু থেমে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কেতকী বললো, "মাথা-বোঝাই চুলে আমার ঘেন্না করে গিয়েছে—আমার টাকই ভালো, টাকই ভালো।"

"মোহনের সঙ্গে তুমি মিটমাট করে নিলে পারতে, কেতকী", অবনী এবার ভালো হবার চেষ্টা করে।

"মিটমাটের কথাই ওঠে না। মিটমাট যদি কারও সঙ্গে করতে হয়ে সে তোমারই সঙ্গে, অবনী।" কেতকী এবার ওর খুব কাছে এগিয়ে আসছে—ওর উষ্ণ নিশ্বাস নিজের দেহে অনুভব করছে অবনী।

অমোঘ ইনসটিংটের খরস্রোতে আজ নিজেকেই ভাসিয়ে দেবে অবনী। সংযমের কোনো বাধা মানবে না অবনী। বিজন ঘরে নিশীথ রাতে কেতকীকে পেয়ে ধন্য হবে সে! সজল চোখে অবনী বললো, "সেই এলে কেতকী, কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল। আজ আমার কোনো পরিচয় নেই—আমি একটা ওষুধ কোম্পানির সামান্য রিপ্রেজেনটেটিভ।"

নেলপালিশে রাঙা কোমল হাতে কেতকী এবার অবনীর ঠোঁট চেপে ধরলো। "ওসব কথা তুলে তুমি আমার কষ্ট বাড়িও না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

ক্ষমাসুন্দর অবনী গভীর আনন্দ অনুভব করছে। দীর্ঘ দশ বছর এক-টানা জ্বরেভুগে, হঠাৎ যেন তার রোগমুক্তি হলো। জীবনে কখনও অবনী এতো হাল্কা অনুভব করেনি।

কেতকীকে বসিয়ে রেখে অবনী কয়েক মিনিটের জন্যে বাথরুমে গিয়েছে, তার মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটলো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সন্ত্রস্ত অবনী দেখলো তার

অনুপস্থিতিতে কেতকী তারই ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে ফেলেছে।

কেতকী এবার খিল খিল করে হাসছে। বলছে, "মোহন সুন্দরমের সঙ্গে আমার মোটেই মনোমালিন্য হয়নি। স্রেফ কিছু কাঁচা ডলারের লোভ দেখিয়ে ওরা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে, অবনী। ওদের ধারণা আমি ছাড়া আর কেউ তোমার কাছ থেকে খবর বার করতে পারবে না। অবনী, তুমি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িও না—" করুণভাবে বললো কেতকী।

"তোমার মুখদর্শন করতে কষ্ট হচ্ছে আমার, কেতকী," বেশ তিক্তভাবে বললো অবনী।

"কিন্তু তোমার ওই মাথা জোড়া টাকের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে হলে আমি পাগল হয়ে যাবো, অবনী।"

"কার আশীর্বাদে জানি না, কিন্তু একটুর জন্যে আজ আমি সি-আই-এর হাত থেকে বেঁচে গেলাম।" এই বলে কেতকীকে হাত ধরে তার ঘরে পৌঁছে দিলো অবনী।

অবনীর স্বপ্ন এবং হৃদয় ভঙ্গ হয়েছে—কেতকী পর্যন্ত তার সঙ্গে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! আগামীকাল সুপার ক্যাবিনেটের গোপন মিটিংই তার শেষ ভরসা। ইচ্ছে হচ্ছে কেতকীর অবস্থাটা মন্ত্রীমণ্ডলীকে ডেকে দেখায়। অবনীর আবিষ্কার সম্পর্কে তাহলে ওঁদের আর কোনো সন্দেহ থাকতো না। কিন্তু কেতকীকে চরম বিপদে ফেলবে না অবনী—প্রেমের ব্যাপারে ছেলেরা যে মেয়েদের মতো ছোটলোক হতে পারে না, তার একটা প্রমাণ অবনী পৃথিবীতে রেখে যাবে।

পরের দিন ভোরে সুপার ক্যাবিনেটের গোপন সভায় এসে

অবনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। সেক্রেটারী কানে কানে বললেন, "কার ওপর আপনার ওযুধের পরীক্ষা করবেন সে বিষয়ে সকল মন্ত্রী একমত হয়েছেন।"

অবনী ভাবলো তার শেষ সিগারেট দিয়েই বাজিমাত করবে। শিশিতে যে-কয়েক ফোঁটা ওযুধ অবশিষ্ট আছে তা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবে।

মাননীয় মন্ত্রীরা গম্ভীরমুখে নিজেদের আসন গ্রহণ করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কোনো মন্ত্রী ধূমপান করছেন না।

নির্ধারিত সময়ে সভার কাজ আরম্ভ হলো। এবার সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা : যাঁর ওপর অবনীদাসের আবিষ্কারের পরীক্ষা হবে, তাঁর নাম জানা যাবে।

অবনী এবার মাথায় হাত দিল। হা ঈশ্বর! মাননীয় মন্ত্রীরা অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারী অফিসের কনিষ্ঠতম টেমপোরারি চাপরাসীটিকে নিয়ে এসেছেন! ওঁরা দেখেছেন—ওকে নিয়েই বিপদ সবচেয়ে কম, চাকরি যদি যেতেই হয় তাহলে এই গেঁয়ো ছোকরারই যাক।

ছোকরা বলির পাঁঠার মতো ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। আর উপস্থিত মাননীয় ব্যক্তিরা অবনীকে বলছেন, "আর দেরি কেন? আপনার ওষুধ ছাড়ুন—যেখানে যত জালজোচ্চুরি আছে সব বেরিয়ে পড়ুক।"

নিজের দেশ ও নিজের আবিষ্কারের ওপরেই বিতৃষ্ণা ধরছে অবনীর। নিরীহ গোবেচারা ছেলেটাকে দেখে তার ভীষণ মায়া হচ্ছে। অবনী বুঝতে পারছে, এই পোড়া দেশে সমস্ত সদিচ্ছার শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হয়। তার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ঘৃণায়

এবং বিতৃষ্ণায় অবনী হঠাৎ এক অদ্ভুত কাজ করে বসলো। দূর ছাই, বলে সিগারেটের বাক্স টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো এবং পকেটে যে নেজাল ড্রপের কাঁচের শিশিতে মহামূল্যবান আবিষ্কারের শেষ কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট ছিল ধানি পটকার স্টাইলে মেঝেতে আছড়ে ফেললো। ঝন ঝন করে আওয়াজ হতেই সকলে চমকে উঠলো।

হৈ হৈ রব উঠলো। দেহরক্ষীরা ছুটে গিয়ে অবনীকে জাপটে ধরলো। তারা ভাবলো, অবনী বোমা বা ওই ধরনের মারাত্মক কিছু ছোড়বার চেষ্টা করছে।

অবনী তখন হা-হা করে হাসছে। পরীক্ষিৎজী বললেন, "কী হলো মিস্টার বেনার্জি? অনেক তো বোড়ো বোড়ো কথা বলেছেন—এবার আপনার সামপুল দেখান।"

অবনী কোনো উত্তর না দিয়ে হা-হা করে হেসে যাচ্ছে। দুনিয়ার সমস্ত লোককে তার চেনা হয়ে গিয়েছে—আর কোনো আবিষ্কারের ইচ্ছা অবনীর নেই।

সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে এই ভেবে দেহরক্ষীরা অবনীকে বলপূর্বক রাস্তায় বার করে দিল।

রাজধানীর রাজপথে তখনও অবনী হা-হা করে হেসে যাচ্ছে।

আজব স্টেথো

অবশেষে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। যা বহুযুগ ধরে মানুষ অনুসন্ধান করছে, যার জন্যে জাপান, জার্মানি, আমেরিকা যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত তা আয়ত্তে এসেছে একজন মানুষের— শ্রীশিবনাথ সমাদ্দার।

শিবনাথের এই আবিষ্কার সমস্ত মানবসমাজে আলোড়ন তুলবার সম্ভাবনা রাখে। শিবনাথের হাতে হয়েছে সেই আশ্চর্য স্টেথো যার সাহায্যে পঁচিশ বছরের শিবনাথ সমাদ্দার মানুষের মনের কথা শুনতে পায়।

আমার বন্ধু মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "ব্যাপারটা এমনই জটিল এবং অবিশ্বাস্য যে কীভাবে শিবনাথের ব্যাপারটা লিখবেন তা আপনাকে ঠিক করতে হবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি পরামর্শ দিলেন, "ঘটনাগুলো আপনি রূপকথার স্টাইলে সাজিয়ে যান, আফটার অল শিবনাথ নামের লোক শুধু এই ইন্ডিয়াতেই থাকতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই। লর্ড শিভা তো শুধু বাঙালি বা ইন্ডিয়ানদের ওপরেই রাজত্ব করছেন না—মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে প্রলয়পয়োধিতে ফেলে লস্যি বানাবার দায়িত্ব তাঁর ওপর রয়েছে।"

ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জির কাছ থেকে শুনে এর আগে দুটো গল্প আমি লিখেছি। সুধাকর বললেন, "আমি ডাক্তার নই। আমি

অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির এম এসসি। আমি মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পাশ নই, আজকাল যাদের সাইকিয়াট্রিস্ট বা মনোরোগ চিকিৎসক বলে আমি তাও নই। তবে সাইকিয়াট্রিস্টরা যা ওষুধ দিয়ে, ইঞ্জেকশন দিয়ে, ইলেকট্রিক শক দিয়ে, মস্তিষ্কে অপারেশন করে সারাতে চান তা আমরা চেষ্টা করি সারাতে মানসিক প্রক্রিয়ায়। মানসিক হাসপাতালেও আমাদের ডাক পড়ে ভাই। স্রেফ কেমিক্যালের জোরে মানসিক রোগ সব সময় বাগে আনা যায় না ; কেবল গুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে মানুষকে আঘাঘুমন্ত জাগ্রত অবস্থায় রেখে তাকে ভেজিটেবল বানানো যায়।"

সুধাকরবাবুর প্রচণ্ড প্র্যাকটিস নয়, কিন্তু মোটামুটি চলে যায়। তাঁর চেম্বারে রোগীকে আরাম কেদারায় শুইয়ে, লাল আলো জ্বালিয়ে সম্মোহিত করে মনোবীক্ষণ চলে। কত যে অদ্ভুত আনাগোনা আমাদের এই সংসারে, কত যে তাদের দুঃখ এবং যন্ত্রণা!

আজকাল আবার সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলোয়। সুস্থ মানুষ আগে অসৎসংসর্গে বিড়ি সিগারেট গাঁজা আফিম মদের খপ্পরে পড়তো। এখন ড্রাগ-এর যুগ। ড্রাগ বলতে আমাদের প্রজন্মের সবাই ওষুধ বুঝতো। মাত্র ক'টা বছরের ব্যবধানে 'ড্রাগ' তার আদি জাত খুইয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করলো ; আমাদের সময় ড্রাগের এখন নতুন নাম মেডিসিন। বাংলায় ওষুধ কথাটা সৌভাগ্যক্রমে তার স্বধর্ম হারায়নি। একালের ড্রাগের বাংলা প্রতিশব্দ হয়েছে 'মাদক', যদিও এর থেকে ঠিক ড্রাগের দৌরাত্ম্য বোঝানো যায় না। কারণ ওর মধ্যে মদ শব্দটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ড্রাগের ওপর প্রবন্ধ লিখতে বসিনি এখন। যা বলতে চাইছি, ড্রাগের প্রকোপে ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জির রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

ড্রাগের নেশা চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র মার্কিন দেশের বেটিফোর্ড সেন্টার—সেখানে যেমন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তেমন মনোবিজ্ঞানীও আছেন। ড্রাগ জিনিসটা দেহ ও মন দু'টিকেই একই সঙ্গে আক্রমণ করে এবং মানুষকে কাবু করে ফেলে। তার সঙ্গে লড়তে গেলে পুনরাক্রমণ চালানো প্রয়োজন রসায়নও মনোবিজ্ঞানের দুই রণাঙ্গন থেকে।

শরীরকে বিভিন্ন কেমিক্যালসের ডাস্টবিন করে তোলার পক্ষপাতী নন ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি। তাঁর ধারণা নিজেকে নিজেই সারিয়ে তোলার অবিশ্বাস্য শক্তি ঈশ্বর মানুষের মনের মধ্যেই রেখেছেন। আমরা এখনও এই নিরাময় শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার শিখিনি। এ-বিষয়ে আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে বহুদিন ধরে।

সেদিন হঠাৎ ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি ফোন করলেন। আচমকা শান্তিভঙ্গ করার জন্যে মার্জনা চাইলেন, তারপর বললেন, "আমি মশাই বাংলায় ভীষণ উইক। যে-লোক অপরের মনের কথা বুঝতে পারে তাকে এক কথায় কী বলে?" 'অন্তর্যামী' শব্দটা সুধাকর চ্যাটার্জির মনে আসছে না।

হাতের গোড়ায় অভিধান ছিল। খুলে বললাম, "যিনি মনের ভিতর অবস্থান করেন এবং মনের সকল কথা জানেন তাঁকে অন্তর্যামী বলা চলে।"

সুধাকর সন্তুষ্ট হলেন না। "ওই তো বিপদ বাধালেন। যিনি মনের কথা জানতে পারেন অথচ মনের ভিতরে অবস্থান করেন না তাঁকে কী বলা হবে?"

"এই রকম সিচুয়েশন তো সেযুগে হয়নি, তাই অভিধানে সেরকম শব্দের ব্যবস্থা নেই, ডাক্তার চ্যাটার্জি।"

ওঁকে আবার অপেক্ষা করতে বললাম। অভিধানটা আর-একটু ঘাঁটা যাক। "একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছে, ডাক্তার সায়েব। অন্তর্ভেদী—মনের গুপ্তভাবে জানতে পারে বা চেষ্টা করে এমন কেউ।"

সুধাকর চ্যাটার্জি ফোনে বললেন, "কিন্তু ধরুন যদি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ার ব্যাপার না থাকে? স্রেফ বুকে একটা যন্তর বসিয়ে যদি কেউ মনের কথা শুনতে পায়?"

সুধাকর বললেন, "আপাতত অন্তর্যামী কথাটাই 'ইয়ুজ' করি। পরে দেখা যাবে। এতোদিন এই বিরল সম্মান একমাত্র ঈশ্বরই পেয়েছেন, একমাত্র তিনিই মানুষের মনের কথা অটোম্যাটিক্যালি জানতে পেরেছেন, তাই অন্তর্যামীর অপর অর্থ ঈশ্বর। কিন্তু আমাদের শিবনাথ তো ঈশ্বর নয়।"

সুধাকর চ্যাটার্জি মনের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুললেন। ফলে একদিন হাজির হওয়া গেলো ওঁর চেম্বারে।

সুধাকরের কাছে একটি রোগী ছিল। এই রোগীটির ধারণা, উত্তমকুমারের আত্মা তার ওপর ভর করেছে, অতএব সে নিজেই উত্তমকুমার। ফলে সারাক্ষণ ভুগতে হচ্ছে আপনজনদের।

সুধাকর চ্যাটার্জি তাকে বলেছেন, "আপনি উত্তমকুমার এটা মেনে নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনি বুঝছেন আপনি উত্তমকুমার, না-হলে আপনি ওই দাবি করে ঝুট ঝামেলা বাড়াবেন কেন? এখন কথা হলো, উত্তমকুমারের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে-কোনো ভূমিকায়

অভিনয় করতে পারতেন এবং যে-কোনো চরিত্রকে রূপ দিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে আজ উত্তমকুমার আপনি রতন সামন্তর ভূমিকায় অভিনয় করে যান এক সপ্তাহের জন্যে। সবাই দেখুক, তখন বিশ্বাস হয়ে যাবে আপনি রতন সামন্ত নন, আপনি উত্তমকুমার।"

রোগীকে আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় রেখে সুধাকর বললেন, "উত্তমবাবু, এখন আপনি রতন। আপনি ডাকুন, রতন, কোথায় আছো রতন? এসো এখানে।"

আধশোয়া রোগী বললো, "প্রায়ই মাথা চুলকোতো।"

"বেশ তো, ভাল কথা। আপনিও আজ অরিজিন্যাল রতন সামন্ত মাথা চুলকোন।"

রোগীটি সহজ নয়। সে এবার উত্তমকুমারের নায়িকাদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। তারা না থাকলে, উত্তমকুমার হওয়াটাই বৃথা!

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "যখন যেরকম ভূমিকা সেরকম কাজকর্মের জন্যেই তো উত্তমকুমার বিখ্যাত। রতন সামন্তর জীবন তো স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত, তিনি তো এখনও ইয়ং, অবিবাহিত ইয়ংম্যান।"

ছেলেটা চটে উঠছে, "নায়িকা না থাকলে কোন দুঃখে সে উত্তমকুমার হতে যাবে?"

সুধাকর চ্যাটার্জি বলছেন, "সে বললে চলবে না। সামান্য রতন সামন্তর ভূমিকায় উত্তম অভিনয় করতে পারছেন না তা কেউ বিশ্বাস করবে না। আপনি উত্তমকুমার হয়ে উত্তমকুমারকে এভাবে ডোবাতে পারেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান, তবে অ্যাজ রিয়েল

উত্তমকুমার ফিরে আসুন সামনের শনিবার।"

এইভাবে সেশন শেষ হলো। রোগী বিদায় নিলো, সুধাকর চ্যাটার্জি ঘরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বেলে দিলেন, সহকারিণী রুমা সাহাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন।

বেসিনে হাত ধুতে-ধুতে ডাঃ সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "মনের ইচ্ছে চেপে রাখার চেষ্টা থেকেই মানুষের যত মানসিক অসুখ। যে যা হতে চায় তাকে তাই করবার স্বাধীনতা দিলে প্রায়ই উল্টো ফল হয়, সে আর এগোতে চায় না। কারণ চাপের সংসারে থাকতে-থাকতে তার প্রত্যাশা ছিল আপনজনরা তাকে চেপে রাখতে চাইবে, ফলে সে তাদের সঙ্গে লড়াই করে মজা পাবে।"

চা খেতে-খেতে অন্তর্যামীর কথা ফিরে এলো। ডাক্তার সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "স্ট্রেঞ্জ কেস মশাই, পৃথিবীতে বিরাট কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিবনাথ সমাদ্দারের গোপন ব্যাপারটা আপনি ফলো করতে আরম্ভ করুন। যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিই তেমন কিছু একটা ঘটে যায় তাহলে আপনি খোলাখুলি এ বিষয়ে লিখতে পারবেন, পৃথিবীর লোকদের বিশ্বাসও করাতে পারবেন।"

"ব্যাপারটা কী?"

সুধাকর গলা নামিয়ে বললেন, "এর সম্ভাবনা যে কত সুদূরপ্রসারী তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়, মশাই। একটা লোক যে বলে দিতে পারছে অন্য একটা মানুষের মনের ভিতরের কথা। যেমন ধরুন আমার নিজেরই কথা। আমি রোগীকে বললাম, তুমি এখান থেকে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমার চিন্তা থেকে যাবে। রোগী ঘচাং করে আমাকে পরীক্ষা করলো। তারপর বললো, তুমি আমার কথা চিন্তাই

করছো না। তুমি ভাবছো, আরও দুটো নতুন রোগী আজ আসবে তো?"

সুধাকর আমাকে ক্রমশই অবাক করে দিচ্ছেন। কী অদ্ভুত শক্তি মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। এক্স-রে আবিষ্কার করে মানুষ তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় পৌঁছতে পারেনি ভিতরে।

আমি বললাম, "কিছুটা পেরেছে গত শতাব্দীতে। একজন ফরাসী ডাক্তার ফুসফুস রোগের বিশেষজ্ঞ স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করলেন যা গলায় না ঝোলালে ডাক্তার হওয়ারই কোনো মানে হয় না। এই ফরাসী ডাক্তারকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন বিস্মিত আমেরিকান ডাক্তাররা। তাঁদের একজনের লেখা চমৎকার বর্ণনা কিছুদিন আগে কোথায় পড়েছি। স্টেথো শব্দটা গ্রীক, মানে বুক।"

সুধাকর খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। "দেবেন আমাকে ঐ লেখাটার কপি? নিজে পড়বো, শিবনাথ সমাদ্দারকে পড়াবো।"

আমার যতটুকু মনে ছিল বললাম। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার তাঁর দলবল নিয়ে হাসপাতালের রাউন্ডে বেরিয়েছেন। বুকের আওয়াজ শোনার পথ তিনি আবার আবিষ্কার করেছেন, প্যারিসের চত্বরে ছেলেদের বাঁশের চোঙা নিয়ে খেলতে দেখে। আসলে পথটা ছেলেরাই আবিষ্কার করেছে যাদের নাম আমরা জানি না, আর ব্যাপারটা সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন ফরাসী ডাক্তার। হাসপাতালের ওয়ার্ডে এক-এক রোগীর সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন ফরাসী ডাক্তার। সেই সময়কার এক মজার বর্ণনা আছে তরুণ ডাক্তাররা স্টেথো যন্ত্র দিয়ে রোগীর বুক পরীক্ষা করছে। কিন্তু তাদের সকলের লক্ষ্য এক সুন্দরী বালিকার দিকে। সব ছাত্রই

একবার তার বুকে স্টেথো বসাবার সুযোগ গ্রহণ করছে, আর সুন্দরীটি একটু লজ্জা পাচ্ছে।

ডাক্তার সুধাকর চট্টোপাধ্যায় আবার অনুরোধ করলেন, "স্টেথোসকোপ সম্বন্ধে যেখানে যত খবর আছে সংগ্রহ করে রাখুন। আপনার খুব কাজে লেগে যাবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি এবার শিবনাথ সমাদ্দারের ওপর আলোকপাত করলেন। "এই লাইনে মশাই এতোদিন আছি, এমন জটিল কেস কখনো আমি দেখিনি। ওর বাবার বিশেষ অনুরোধে আমি ওকে সেন্ট্রাল অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে দেখে এলাম। একেবারে সুস্থ সরল তরতাজা মানুষ। কোথাও কোনো গোলমাল খুঁজে পেলাম না। সত্যি কথা বলতে কী, যারা হাসপাতালের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শহরে তাদের মধ্যেই মানসিক অসুস্থতা বেশি। সেকথা বললাম ওই ছোকরা শিবনাথ সমাদ্দারকে। কিন্তু কী অদ্ভুত সিচুয়েশন—ছোকরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে মোটেই রাজি নয়। অথচ আপনি তো জানেন, মানসিক হাসপাতালে সবচেয়ে যা কষ্ট দেয় তা হলো রোগীরা কাতর অনুরোধ করে—আমাকে এখানে রাখবেন না, আমাকে বাইরে যেতে দিন।"

সুধাকর আমাকে কিছু খবরাখবর দিলেন। "ব্যাপারটা না বাড়িয়ে, মূল খবরগুলো জেনে রাখুন। পার্টির নাম : শিবনাথ সমাদ্দার। পুরুষ। বয়স : পঁচিশ। বাবার নাম : সত্যশরণ সমাদ্দার। উচ্চতা : ১৬৮ সেমি। রঙ : শ্যামবর্ণ। স্বাস্থ্য : রোগাটে। ওজন : আটান্ন কেজি। চোখের রঙ : কালো। মুখের আকার : ঘোড়া।"

শেষ আইটেমটা বুঝতে পারছিলাম না। সুধাকর হেসে বললেন, "ওটা টেকনিক্যাল কোড, আমারই আবিষ্কার। মানুষকে দু'রকম

ভাগ করেছি : ঘোড়া অ্যান্ড চিম্প বা শিমপাঞ্জি। যাদের মুখ লম্বাটে তারা ঘোড়া, আর যাদের মুখ আপনার মতন গোল তারা চিম্প।"

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি। সুধাকর কিন্তু ছাড়লেন না। "আপনি গোল মুখ ঘোড়া একটাও দেখেছেন? লম্বাটে মুখ ছাড়া ঘোড়া হয় না, একটু শার্প ফিচার। তাই ঘোড়ামার্কাদের ছবি তোলা খুব সহজ—ফটোতে ওদের ভাল দেখায়। শিমপাঞ্জি মুখ আপনি দু'রকম দেখবেন—উইথ গর্দান, উইদাউট গর্দান। যাদের গর্দান থাকে না, যেমন সত্যশরণ সমাদ্দারের, এরা গায়েগতরে একটু সমৃদ্ধ হলেই ডবল-চিন হয়ে যায়। যাদের থুতনি ডবল তাদের ছবি তোলা দায়, ফটোগ্রাফারদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন। এদের ক্লোজআপ নেওয়ার উপায় নেই, সব সময় দূর থেকে শট নিতে হয়।"

"আপনি কি ফটোগ্রাফিরও চর্চা করছেন?"

হাসলেন সুধাকর। "আমি করছি না। আমার এক রোগী আছে সে একসময় ফটোগ্রাফার ছিল। বড়লোকদের সামাজিক উৎসবের ছবি তুলতো। একবার এক বিয়েতে তার তিনটে রোলই গোলমাল হয়ে গেলো, ছবি উঠলো না। পার্টির কাছে লোকটা এমন গালাগালি খেলো যে পাগল হয়ে গেলো। বড়লোক তাকে উকিলের চিঠি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল মামলা করবে ক্ষতিপূরণের। অথচ দোষটা ওর নয় ছবির ফিল্মগুলোই খারাপ ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি ফটো সম্বন্ধে প্রায় এক্সপার্ট হয়ে গিয়েছি। এই রোগী মশাই, মেয়েদের মুখ দেখে ফলের কথা মনে করে। সব মেয়েরই মুখ নাকি কোনো না কোনো ফলের মতন। কেউ আম, কেউ বেদানা, কেউ আপেল, কেউ দার্জিলিং কমলালেবু, কেউ সরবতিয়া, কেউ পেঁপে। একজন মোটা মহিলাকে দেখে ওর তরমুজ বলে মনে হয়েছিল।

ওইখান থেকেই তো আইডিয়া নিলাম— পুরুষমানুষদের দু'ভাগে ভাগ করে ফেললাম। ডারউইনের পর কেউ এই দুঃসাহস দেখাতে সাহস পাননি।"

শিবনাথের বর্ণনা আবার শুরু করলেন সুধাকর চ্যাটার্জি। "শিবনাথের চোখটা দেখলেই বোঝা যায় একটু উদাসী, একটু অন্তর্মুখী। সংসারবিবাগীদের চোখ অনেকসময় ঐরকম হয়— ফোকাস বাইরের দিকে থাকে না, মনে হয় টর্চ জ্বেলেছেন, কিন্তু আলো বাইরে না এসে টর্চের ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। মানুষটা আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যেন পিছন ফিরে তাকিয়ে আছে।" সুধাকরবাবুর পরবর্তী ব্যাখ্যা : "চোখ হচ্ছে ক্যামেরার লেন্সের মতন। লেন্স দিয়েই ক্যামেরার বিচার।"

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "শিবনাথ সমাদ্দার সম্বন্ধে ওর বাবার ধারণা, এক সময়ে সে ড্রাগের খপ্পরে পড়েছিল। সব সময় একটু নেতিয়ে থাকা, ভাবের ঘোরে থাকা। আজকাল অসৎ সংসর্গে পড়াটা তো আশ্চর্য কিছু নয়। ওই সময় ওর বাবা এক আধবার আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। অনেক জেরা করেও তেমন কিছু বের করতে পারলাম না। বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বললো না। এই হয় মশাই। সমস্ত দুনিয়ায় দেখবেন, এক নেশাখোরের আনুগত্য অন্য এক নেশাখোরের দিকে। নিতান্ত বাধ্য না হলে আরেকজনকে ডোবাবে না। এক গেলাসের ইয়ার বলে একটা কথা খুব চালু ছিল, এখন বিদেশে এক সিরিঞ্জের ইয়ার! একটু-একটু করে ইঞ্জেকশন ভাগ করে নিচ্ছে তূরীয় আনন্দ পাবার জন্যে।"

শিবনাথ সমাদ্দার যে জেনেশুনে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশেছে

তা বিশ্বাস করছেন না সুধাকর চ্যাটার্জি। তার শরীর যে খারাপ হয়েছে তা ঠিক, পড়াশোনাতেও বিপর্যয় এসেছে। যে-ছেলে স্কুল ফাইনাল তরতর করে পাশ করে বেরিয়ে এসেছে সে-ছেলেই উচ্চমাধ্যমিকে ব্রেক কযেছে। ওখানে বছর নষ্ট হয়েছে অযথা। তারপর বি-এ। মিস্টার সমাদ্দারের ইচ্ছে, ছেলেকে গ্র্যাজুয়েট হতেই হবে, না-হলে সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে?

সুধাকর চ্যাটার্জি অবশ্য সত্যশরণ সমাদ্দারকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ছেলের ডিগ্রি নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না। মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী কারুর বি-এ ডিগ্রি ছিল না।"

কিন্তু সত্যশরণ সমাদ্দারের দুঃখ শেষ হতে চায় না। "আমাদের পারিবারিক ইতিহাসটা দেখুন। আমার প্রপিতামহ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট। আমার পিতামহ মেডিক্যাল কলেজের এম-বি। আমার বাবা বি. এস-সি। আমি নিজে বি-এ, বি. কম। আমার বড় ছেলে বি-টেক ফ্রম আই আই টি। আর আমার ছোটো ছেলেটার নামের পাশে দুটো অক্ষর থাকবে না?"

সুধাকর বুঝিয়েছিলেন, "রবিঠাকুর, রামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছাড়াই জীবন চালিয়েছেন।" সত্যশরণবাবুর দুঃখ তবু কমেনি।

এর ওপর যদি নেশাভাঙের কথা ওঠে তা হলে কেমন লাগে বাবা মায়ের? সুধাকর বললেন, "মশাই, এই ছেলেটার একদিন বাড়ি এসে ভীষণ অবস্থা। রামকেষ্ট দেবের মতন ঘন-ঘন সমাধি, ঘন-ঘন আনন্দলোকে উত্তরণ। সবাই ধরে নিলো ড্রাগের মাত্রা আচমকা বাড়িয়েছে এই শিবনাথ সমাদ্দার। নিন্দুকরা বললো, রাখো শিবের নামে ছেলের নাম। নেশাভাঙের বাজার নামে নাম রাখবে, আর

ছেলে ড্রাগের দিকে একটু নড়বে না তা তো হয় না।"

সুধাকর বুঝিয়েছিলেন, "আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের কষ্ট বাড়াবেন না, সত্যশরণবাবু এই তো আমার বন্ধু শংকরবাবু, থাকেনও শিবপুরে, কিন্তু যদ্দূর জানি নেশা নেই। ধরুন কবিরাজ শিবকালি ভট্টাচার্য—শুধু শিব নয় সেই সঙ্গে স্বয়ং মা কালী—কিন্তু বোতল, পুরিয়া, গুলি, কোনোদিকে টান নেই। তাছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে—গাঁজাফাঁজার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক থাকলেও, ড্রাগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি বিড়ি সিগ্রেটের সঙ্গে। পুজোর সময় কত প্যান্ডাল তো ঘুরেছেন, দেখেছেন কোথাও শিবের ঠোঁটে বিড়ি, সিগ্রেট, চুরুট এটসেটরা?"

সুধাকরবাবু এবার দুঃখ করলেন, "বাবাকে যখন এই সব বোঝাচ্ছি তখন একটা বকাটে ছোঁড়া সেখানে বসেছিল। সে ফোড়ন কাটলো, সিগ্রেট ধরাবে কী করে? জানেন না, ফায়ার ব্রিগেডের অর্ডারে, প্যান্ডালে নো স্মোকিং—ধূমপান নিষেধ? এই সব ছোঁড়ার সঙ্গে কে এঁড়ে তক্কো করবে যে ধূপ ধুনো ছাড়া পুজো হয় না, এবং এসবও একধরনের স্মোকিং। জার্মানিতে তুমি জ্বালাও না ধূপ—যদি-না হাজতবাস করায় তো আমার নামে কুকুর রেখো।"

শেষ পর্যন্ত সুধাকরবাবুর যা মনে হলো, শিবনাথ সমাদ্দার জেনেশুনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগফ্রাগ ধরেনি। আজকাল অজান্তেও ড্রাগের শিকার হওয়া যায়। কোথাও কলেজের সামনে মুখরোচক হজমিগুলি কিনে খেতো মাঝে-মাঝে। আজকাল কী নামে কী জিনিস যে বিক্রি হচ্ছে ঠিক নেই। একদিকে রয়েছে ভেজিটেবল স্টেক বা হ্যামবার্গার যার মধ্যে গোরুর মাংসও নেই শুয়োরের মাংসও নেই, নির্ভেজাল নিরামিষ। আবার অন্যদিকে

রয়েছে বিড়ি, সিগ্রেট, হজমি এটসেটরা যা আসলে ড্রাগ।

সেবারে যে সিরিয়াস আক্রমণ হলো, তার পিছনে রয়েছে, ঠাণ্ডা কোলা। বিশেষ এক দোকানে গিয়ে শিবনাথ ওই ঠাণ্ডা কিনেছে। ওখানে একনম্বর, দু'নম্বর সবরকম জিনিসই থাকে। মালিক কিছুক্ষণের জন্যে টয়লেট গিয়েছিল, সেইসময় অন্য একটা ছেলে দোকানে বসেছিল। সেইসময় শিবনাথ হাজির। ছোঁড়াটা না-বুঝে দু'নম্বরি জিনিস খুলে দিয়েছে। তারপরেই হাঙ্গামা। ডাক্তার বদ্যি হাসপাতাল।

আজকাল হাসপাতালের ত্রিসীমানায় যেতে নেই। রোগের চিকিৎসা কী হবে তা ভগবান জানেন. ডাক্তারের খপ্পর থেকে সোজা ট্রান্সফার হয়ে যাবেন পুলিশের খপ্পরে। প্রতিটি স্পেশাল কেসের রিপোর্ট থানায় চলে যাবে। তারপর আপনি রোগী সামলাবেন, না পুলিশ সামলাবেন। পুলিশ সামলাতে গিয়ে আপনাকে উকিলের খপ্পরে পড়তে হবে। তারপর তেমন অবস্থা হলে পুলিশ ও উকিল আপনাকে নিয়ে পিংপং খেলবে. যতক্ষণ-না আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মেন্টাল হাসপাতালে যাচ্ছেন, অথবা ব্যাক টু হাসপাতাল হচ্ছেন উইথ হার্টের ব্যামো। জানেন মশাই, যে সোসাইটি আমরা তৈরি করেছি সেখানে শ্মশানের ডাক্তার ও ডোম ছাড়া আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা থেকে অন্য কেউ রিলিফ দিতে পারবে না। অবশ্য মরার খরচ ইন্ডিয়াতে এখনও খুব কম, এ-ব্যাপারে দুনিয়ার কোনো দেশ আমাদের সঙ্গে কমপিটিশনে লড়ে যেতে পারবে না।

ড্রাগের প্রতি শিবনাথ নিজেই আসক্ত, না ড্রাগ রোগীর লক্ষণ তার অজান্তেই তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা বলা কঠিন।

এই সব সূক্ষ্ম বিশেষণ করেই বা লাভ কী? কেউ-কেউ তো বলবেই, ঠাণ্ডাপানির এতো দোকান থাকতে বেপাড়ার ওই দোকানেই বা শিবনাথ সমাদ্দারের যাওয়ার প্রয়োজন হলো কেন? ওই দোকানটা শিবনাথ চিনলোই বা কী করে?

যদি ওর পক্ষে বলতে হয়, তা হলে বলতে হয়, একটা-না-একটা কোনো দোকানে যেতেই হবে মানুষকে। তেষ্টা পেলে মানুষ অতশত ভাবে না, দোকানের ঠিকুজিকুষ্ঠি মিলিয়েও দেখে না। স্রেফ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বোতলের অর্ডার দেয়।

যারা সন্দেহপ্রবণ, তাদের বক্তব্য : জিনিসটা অত সহজ নয়, সাদা। আজকাল কোন দোকানে কী বিক্রি হয় তা জানতে কারও বাকি থাকে না। যে যেখানে যেতে চায় সে ঠিক সেখানেই পৌঁছে যায়। একটু চাপ দিলে পুলিশে একটু নাড়াচাড়া করলে ঠিক বেরিয়ে পড়বে ওই দোকানে শিবনাথ সমাদ্দার এই প্রথম যায়নি। আগেও সে গিয়েছে এবং কেউ না কেউ মালিকের সঙ্গে তার পরিচয় কমিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকে এবং দুষ্টচক্রে এটা ভীষণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার ; ওখানে কেউ ইনট্রোডাকশন করিয়ে না দিলে দোকানদার নরম হবে না। কখন কোথায় অজানা লোক সেজে সে ব্যবসার বারোটা বাজাবে তার ঠিক নেই।

সুধাকর চ্যাটার্জি বললেন, "ওসব তাত্ত্বিক ব্যাপারে আপনাকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। মোদ্দা কথাটা হলো, ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। আমি শেষ পর্যন্ত শিবনাথের চিকিৎসা করেছি। খুব সিরিয়াস এবং খুব পুরনো রোগ নয়, তাই শিবনাথকে খাড়া করতে সময় লাগেনি। তবে নজর রাখতে বলেছি।"

আরও কিছু খবর পাওয়া গেলো। শিবনাথের বাবা সত্যশরণবাবুর

দুশ্চিন্তার অবধি নেই, কারণ পুত্র পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে পারছে না।

সুধাকর চ্যাটার্জি এই ব্যাপারেও উপদেশ দিয়েছেন, উদ্বিগ্ন হতে বারণ করেছেন। কিন্তু সত্যশরণ জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ না-থাকলে এদেশে কোথাও প্রবেশ করা যায় না। "গেরস্ত অবস্থা থেকে একেবারে নিচু স্তরে নেমে যেতে হবে। বাবা দীর্ঘায়ু হলে তা নিজের চোখে দেখে যাবেন।"

সুধাকর বললেন, "সত্যশরণবাবুর আশঙ্কা, শেষপর্যন্ত ওই হাতুড়ে হোমিওপ্যাথি হয়ে ওকে জীবন কাটাতে হবে। ওই একটা ব্যাপারে ছোকরার একবার আগ্রহ হয়েছিল, বাড়িতে পৈতৃকসূত্রে একখানা মহেশ ভট্টাচার্যির বই ও একটা কাঠের মেডিসিন বাক্স আছে।"

এরপরেও সুধাকর চ্যাটার্জির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। লোকটির মধ্যে সাহিত্য প্রেম এবং সেই সঙ্গে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে ভালবাসা-মেশানো কৌতূহল আছে।

সুধাকরের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বললেন, "মানুষ যদি সত্যিই সর্বজ্ঞ হওয়ার পথ বের করতে পারে তা হলে কী ভীষণ ব্যাপার হবে একবার ভেবে দেখুন।"

একটু ভেবে সুধাকর নিজেই বললেন, "স্যরি, সর্বজ্ঞ শব্দটার মানে অনেক ব্যাপক। যে ভূতভবিষ্যৎ সবকিছু জানে সে সর্বজ্ঞ। আমরা শুধু মানুষের মনের কথা আলোচনা করছি। মানুষের বুকের মধ্যে একটা মানুষ সারাক্ষণ কথা বলছে। এর উৎস হয়তো ব্রেন, কিন্তু কথাটা শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধ শব্দে রূপান্তরিত হচ্ছে বুকের মধ্যে।"

নিস্তব্ধ শব্দ কথাটা অভিনব। সুধাকরকে এর জন্যে অভিনন্দন

জানালাম। সুধাকর বললেন, "এছাড়া তো এই অভাবনীয় ব্যাপারটার আর কোনো বর্ণনা আমি দিতে পারছি না, যদিও এর মধ্যে কনট্রাডিকশন বা স্ববিরোধ রয়েছে।"

"আজকাল স্ববিরোধ পাবলিকের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। স্ববিরোধের উল্টো যদি সমন্বয় হয় না তাহলেও জিনিসটা সমাজ থেকে উঠে যেতে চলেছে। এখন আমাদের কোনো ভাবনাই পরস্পরকে কাছে টেনে ধরে রাখছে না, সব কিছুই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অথচ এতো বড় সমাজ, এতো রকমের মানুষ, একটু চিটচিটে ভাব দরকার, না-হলে মুড়ি থেকে মোয়া হবে কী করে, মিহিদানা কেমন করে লাড্ডু হবে?" সুধাকরবাবু মানুষকে মুড়ির দানা আর সমাজকে মোয়া হিসেবে কল্পনা করছেন। লোকটির চিন্তায় বিশেষত্ব আছে।

সুধাকর চ্যাটার্জির পরবর্তী পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছি। তিনি বলেছিলেন, "ঘটনাটা রূপকথার স্টাইলে লিখুন। কেন মশাই শুধু নিজের দেশের লোকদের টানাটানি করবেন? এই ধরনের ঘটনা সব দেশেই সব সময়ে ঘটতে পারে। আপনি গোড়াতেই সোজাসুজি জানিয়ে দিন এখানকার চরিত্রদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এই ঘটনায়।" অতএব—

কোনো এক সময়ে কোনো এক দেশে মস্ত এক শহর ছিল। ধরা যাক সেই শহরের নাম 'মহানগর'।

মহানগরের এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে সরু এক গলিতে নায়ক শিবনাথ সমাদ্দারের বসবাস। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কায়দায় শিবনাথ সম্পর্কে ২৫/১৬৮/বিএ/৩০০০ বলতে পারলে খুবই সুখের হতো।

বিশেষ করে আনন্দ পেতেন সত্যশরণ সমাদ্দার ও তাঁর সহধর্মিণী সুনয়না সমাদ্দার। কিন্তু বয়স ২৫ ও উচ্চতা ১৬৮ সেমি হলেও শিবনাথের পক্ষে ডিগ্রিলাভ অথবা মাসিক তিন হাজার টাকা উপার্জন সম্ভব হয়নি। অথচ সুনয়নার স্বপ্ন ছিল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ডাক্তার হবে মেডিক্যাল কলেজ থেকে, যেমন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন তাঁর অপর পুত্র দেবনাথ সমাদ্দার। কিন্তু আজকাল ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া সহজ কথা নয়—বংশে একদা কেউ ডাক্তার ছিলেন বলে বাড়তি কোনো সুবিধাও নেই। যদিও বদ্যির পরিবারে বদ্যি হলে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সুবিধে হয়।

সত্যশরণ মুখে বলেন না, কিন্তু তাঁর ভীষণ দুঃখ, যে বংশে সেকালের নামকরা এম. বি ডাক্তার বেরিয়েছে সেখানে একজন হাতুড়ে হোমিও স্থান পাবে। সত্যশরণ সমাদ্দার কেমন করে ভোলেন যে এই বাড়িটি পিতামহের ডাক্তারি পেশার ফলশ্রুতি এবং তাঁর নাম এখনও শ্বেতপাথরে অঙ্কিত হয়ে গেটের কাছে মলিন অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

শিবনাথ এসব ব্যাপারে খেয়াল করে না। বাবার পিতামহের একটা আলমারি এবং সেখানে কিছু ডাক্তারির স্মৃতি এখনও কালের শাসন অমান্য করে শোভা পাচ্ছে। ডাক্তার দুঃখহরণ সমাদ্দারের ছবিও এখনও টাঙানো রয়েছে বসবার ঘরে। ছবিতে তাঁর গলায় একটি স্টেথো ডাক্তারের পৈতের মতন শোভা পাচ্ছে। সেযুগে স্টেথো ছাড়া ডাক্তার কল্পনাই করা যেতো না, যদিও স্টেথোটার আকৃতিটা ছিল অন্যরকম—স্টেথোসকোপ এখনকার মতন আধুনিক হয়নি, একটা চোঙার মতন ছিল।

এরপরের ঘটনা আকস্মিক। ঠাণ্ডাপানি খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে

শিবনাথকে কয়েকদিন ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে অবস্থান করতে হয়েছে। ডাক্তাররা চিকিৎসার সঙ্গে-সঙ্গে থানার সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছেন। থানার এক ছোট দারোগাবাবু কিছুক্ষণের জন্যে হাসপাতাল বেডের কাছে এসেছিলেন। তাঁর হাজার কাজ। সোজা বললেন, "মিনিস্টার এবং লিডার সামলাতে-সামলাতে প্রাণ আইঢাই, চোর ডাকাত ধরবো কখন মশাই? তার ওপর গোদের ওপর এই বিষফোড়া—ডাক্তারবাবুদের আর কি, একখানা কাগজ বোঝাই করে পাঠিয়ে দিলেন, এখন বুঝুক ঠেলা পুলিশ। পুলিশের তো মা বাবা নেই, ঘর সংসার নেই। খুন হলে মশাই কথা ছিল। কে কোথায় সরবত খেয়ে, ঠাণ্ডাই খেয়ে একটু বেসামাল হলো তার খোঁজখবর রাখতে হবে।"

শিবনাথ বলেছিল, "কষ্ট করে এলেন কেন?" দারোগা বললো, "একবার না এসে উপায় আছে? বলা নেই কওয়া নেই রোগী টেঁসে গেলে আমার ট্রান্সফার অবধারিত। ভাল ইনকাম এই থানায়, কোন দুঃখে পানিশমেন্ট পোস্টিং নিয়ে ধাধ্বাড়া গোবিন্দপুরে চলে যাবো? ডাক্তারেরা মশাই আজকাল ডেঞ্জারাস, কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না, সব কেসে লিখে দেয় রোগীর অবস্থা সিরিয়াস। মরলো বলে। পুলিশকে একটু শান্তি দেবে না এই হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তারগুলো।"

তারপর শিবনাথ ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে, কিন্তু পুলিশের হাত থেকে সহজে ছাড় নেই, সেখানে কেসটা সিঙি মাছের মতন জিওনো আছে, মর্জিমাফিক ডাক পড়া আশ্চর্য নয়।

শিবনাথ বাড়িতে একটু নিঃসঙ্গ। সবাই এখনও একটু সন্দেহের

চোখে দেখছে—ঠাণ্ডাই বোতলটা আকস্মিক না ইচ্ছাকৃত তা এখনও অনেকের কাছে বোধহয় স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ভাইপো ভোঁদুলালই একমাত্র শিবনাথের দিকে। ভোঁদুলাল বলাবাহুল্য একটি ডাক নাম, তার বয়স এখনও পাঁচ হয়নি। ভাল নাম শুভসুন্দর সমাদ্দার। ভোঁদুবাবুর সঙ্গে শিবনাথের একটু স্পেশাল সম্পর্ক—ভোঁদুলাল ঠাণ্ডাই বোতল রহস্য সম্পর্কে মোটেই চিন্তিত নয়।

শিবনাথ ছোট্ট ঘরে একলা থাকে। ভোঁদুলালের বাবা মা পাশের বড় ঘরে থাকেন। ভোঁদুলালের সব ভাল, শুধু কাক ডাকার আগে জেগে ওঠার অভ্যাস ছাড়া। অত ভোরে ভোঁদুর মা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেয়, আর ভোঁদুলাল হাজির হয় শিবনাথের কাছে।

সে-রাত্রে শিবনাথ সমাদ্দার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। চোখ বুজলেই মনে হয়েছে সমস্ত আকাশ বাজির আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কখনও বা চোখের সামনে আগুনের চরকি ঘুরছে। পরমুহূর্তে শিবনাথ ডুবে যাচ্ছে নিবিড় নীলিমায়। তখন বড় শান্তি—সমস্ত শরীরে তখন কে যেন মেনথল ঘসছে—শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত জ্বালানি কোথায় অদৃশ্য হচ্ছে।

ভোঁদুলাল সেদিন ভোরে ঘরে ঢুকেই দেখলো অন্যদিনের মতন কাকুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার প্রয়োজন নেই। কাকু জেগেই রয়েছেন।

ভোঁদুলাল গতকাল বল খেলতে গিয়ে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। দাদুর দাদু যে আলমারিটা রেখে গিয়েছিলেন তার একটা কাচ বলের ধাক্কায় ভেঙে ফেলেছে। সেখানে দাদুর-দাদুর একটা গ্রুপ ফটো ছিল—বহু বছর আগে ইডেন হাসপাতালের সামনে

তোলা। তখনকার দিকপাল ডাক্তাররা সেখানে চেয়ারে বসে রয়েছেন, দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাত্ররা, তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন দুঃখহরণ সমাদ্দার। এই দুঃখহরণ শুধু রোগীদের কষ্টহরণ করেননি, সংসারে দুঃখহরণ করেছিলেন দু'হাতে রোজগার করে। তার ফলভোগ এখনও করছে এই সমাদ্দার পরিবার।

দুঃখহরণের একটি সন্তান। নাম চিন্তাহরণ। সে বি. এসসি পাশ করে সায়েবাড়িতে চাকরিতে ঢুকেছিল। কম বয়সে সুলক্ষণা বধূর সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরেই দুঃখহরণের স্ত্রী কালব্যাধিতে পড়লেন। একবছর চিকিৎসা করেও কালাজ্বর সারাতে পারলেন না দুঃখহরণ। স্ত্রী চলে গেলেন জীবনসাগরের ওপারে।

দুঃখহরণ এরপর একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল—মন দিয়ে প্র্যাকটিশ করতেন না। এর বদলে শুরু করলেন তন্ত্রসাধনা। বিখ্যাত নগেন গুরুর শিষ্যত্ব নিয়ে সারাক্ষণই হ্রীং ক্রীং করতেন। পকেটে স্টেথো থাকতো, কিন্তু গুরুভাইদের চিকিৎসা ছাড়া তেমন ব্যবহার হতো না।

ঘোর অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে গুরুর গৃহে তন্ত্রসাধনা করতে-করতে দুঃখহরণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর স্টেথো সমেত মরদেহ এই বাড়িতে এসেছিল।

শিবনাথ লক্ষ্য করলো, ভোঁদুলালের গলায় একটা স্টেথো। সে ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখেছে, কাকুকে তিনি কীভাবে পরীক্ষা করেন তাও দেখেছে সে। এখন সে নিজেই ডাক্তারের ভূমিকায়। স্টেথোটি সে উদ্ধার করেছে দুঃখহরণের আলমারির কাচ ভাঙবার পরে। স্টেথোটি এতোদিনের অবহেলা সহ্য করে এখনও টিকে

রয়েছে, যদিও তার বয়স অনেক।

শিবনাথ আরও লক্ষকরলো, স্টেথোর গায়ে এখনও লাল-লাল দাগ—মনে হয় হোমের সময় তেল সিঁদুর লেগেছিল দুঃখহরণের জীবনের শেষ রাত্রে।

আর সকলে অবহেলা করলেও, কাকুর প্রতি ভোঁদুলালের টান যথেষ্ট। সে শিবনাথের তক্তপোষের ওপর উঠে পড়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো কাকুকে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর স্টেথো নামিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "তোমার খুব দুঃখু হচ্ছে কাকু?"

শিবনাথের অবাক হবার পালা। এইটুকু ছেলে কীভাবে বুঝলো শিবনাথ সমস্ত রাতই দুঃখ পাচ্ছে।

"বাঃ রে, তোমার বুকে কল বসিয়েই তো শুনতে পেলাম।"

কী বলে ছেলেটা!

ভোঁদুলাল আবার বুকে ডাক্তারি নল বসালো এবং একটু পরই বললো, "এখন দিদুর জন্যে দুঃখ হচ্ছে তোমার। তুমি বলছো, দিদু কেন তোমাকে ছেড়ে চলে গেলো?"

শিবনাথের বিস্ময় বেড়েই চলেছে। ছেলেটা অন্তর্যামী হয়ে উঠলো নাকি? ভোঁদুলাল এবার যন্ত্রটা কাকুর হাতে দিয়ে বললো, "তুমি শুনে দেখো।"

স্টেথোটা নিজের বুকে বসালো শিবনাথ। ভীষণ ডিস্টার্বেন্স। খারাপ রেডিওতে সাগরপারের রেডিও নিউজ যেমন শোনায়। কিন্তু শিবনাথ নিজেকে মনের কথা শুনতে পেলো—"মা বেঁচে থাকলে ভাল হতো। মা বেঁচে থাকলে ভালো হতো।"

এবার খেলাচ্ছলে ভোঁদুলালের বুকে স্টেথোটা বসালো শিবনাথ। ঘড়ঘড় শব্দ একটু কম—শিবনাথ শুনতে পাচ্ছে : "কাকু তুমি ভাল

হয়ে ওঠো। কাকু তুমি কষ্ট পেয়ো না। আমরা দু'জনে একটু পরে বল খেলবো। কাকু তুমি কাল আমাকে নিয়ে পার্কে খেলতে যাবে।"

আশ্চর্য স্টেথোটি ভাইপো কিছু না বুঝেই কাকার হাতে দিয়ে নিজে মায়ের ডাকে নিজের ঘরে চলে গেলো।

শিবনাথ এই মন্ত্রঃপূত স্টেথো নিয়ে খেলা করতে লাগলো। প্রায় একঘণ্টা পরে ভোঁদুলালকে আবার পাওয়া গেলো। শিবনাথ তার বুকে স্টেথো বসিয়ে দিলো। ঘড়ঘড় শব্দ, তারপর কানে এলো : "মা, কাকু আমাকে খারাপ করবে না মা। আমাকে কাকুর কাছে যেতে দাও।"

তাহলে যা সন্দেহ করা গিয়েছিল তাই! ভোঁদুলালের মায়ের মনে নানা ভয়। ছেলেকে কাকুর কাছে পাঠাতে চান না।

দুঃখ হলো, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছে না শিবনাথ। সংসারে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। ভোঁদুলালের মায়ের বুকে স্টেথো বসাতে পারলে হতো, সব কথা জানা যেতো। কিন্তু আচমকা বউদির বুকে হাত বাড়ালে হৈচৈ বাধতে বাধ্য।

দোতলা থেকে শিবনাথ একটু পরে একতলায় নেমে এলো। সামনের বস্তিবাড়ির এক বুড়ো স্টেথো দেখেই হাজির। তার অন্য কোথাও যাবার সামর্থ্য নেই। শিবনাথ বুকে যন্ত্র বসালো। আবার ঘড় ঘড় শব্দ! তারপর সে শুনতে পাচ্ছে : "ডাক্তারের কড়ি তো লাগবে না। কিন্তু ওষুধ? ওষুধ কিনবো কী করে?"

শিবনাথ জানে এই রোগের চিকিৎসা সে করতে পারবে না। তবু বললো, "ভয় পেয়ো না। ওষুধ দেবো আমি, পয়সা লাগবে না।"

এরপর বাবা ওপর থেকে ছেলের দৃশ্য দেখে ভেঙে পড়েছেন।

একটা ছাগলকে ধরে তার বুকে স্টেথো বসাচ্ছে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র। তারপর বউদিকে অনুরোধ করছে, "ওকে খেতে দাও, আটাগম যা আছে। ছাগলটা শুধু ভাবছে, কোথায় খেতে পাবো, কোথায় খেতে পাবো?"

বউদির ভয় বাড়ছে। দেওর এবার সত্যিই উন্মাদ হতে চলেছে।

সত্যশরণ অবস্থা সামাল দেবার জন্যে অসুস্থ অবস্থায় নিজে নেমে এলেন। নেশায় পড়ে ছেলে এবার খপ করে বাবার বুকে যন্তর বসিয়ে দিয়ে বললো, জোরে জোরে নিশ্বাস নাও। এই ছেলের বয়স পঁচিশ হয়েছে।

স্টেথো নামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলো শিবনাথ, বাবার বুকের ভিতরটা সে শুনতে পাচ্ছে। "কবে আমার মৃত্যু হবে? ওগো কবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে? কিন্তু এই ছেলেটার কী হবে? তুমি আগে চলে গেলে। কে ওকে দেখবে?"

ছেলে হঠাৎ বলে বসলো, "বাবা তুমি ভেবো না। আমি তো কোনো দোষ করিনি।"

সত্যশরণের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াতে লাগলো। আবার বাবার বুকে স্টেথো বসিয়ে দিলো শিবনাথ। ঘড় ঘড় আওয়াজ : "ছেলেটা কি পাগল? না রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণের মতন সাধকের লক্ষণ রয়েছে?"

বাবাকে বোঝাচ্ছে শিবনাথ। "আমি কেন পাগল হতে যাবো বাবা? পরীক্ষায় ফেল করেছি, ড্রাগ খেয়েছি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি রামপ্রসাদও নই বাবা, দেবতাদের আমি দেখতে পাই না। কালী, দুর্গা, শিব কেউ আমার কাছে আসে না। তুমি তো আমাকে ডাক্তার শিবনাথ সমাদ্দার দেখতে চেয়েছিলে।"

সত্যশরণের শরীর সত্যিই খুব খারাপ। তার ওপর বউমা এসব দৃশ্য দেখলে খুব ভয় পেয়ে যাবে। নিজের ছেলেটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে স্বামীকে না বলে বসে আলাদা হয়ে অন্য কোথাও চলো!

এরপর কোনো এক সময়ে শিবনাথ সমাদ্দার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ইচ্ছে ছিল বউদির মনের কথাটা কল বসিয়ে ভালভাবে জেনে নেয়। কারণ মুখে বউদি বলে যাচ্ছেন শ্বশুরকে, "আপনার ছোট ছেলের ভাল হোক, মঙ্গল হোক। ছোট দেওর, আমার আদরের, নিজের ছোট ভাইয়ের মতন।" স্টেথো বসালেই সব পরিষ্কার হয়ে যেতো, অথচ উপায় নেই ; এখনই ভেবে বসবে দেওর সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

শিবনাথ একসময় বাবাকে বলেছে, "কয়েকদিন মামার কাছে ঘুরে আসি।"

তার মানে মহানগর থেকে দূরে অন্য এক ছোট শহরে। সেখানে টেলিফোন নেই। বাবা সেই শুনে কিছু টাকা হাতে দিয়েছেন এবং বলেছেন, "ছাইপাঁশ কিছু কিনে খেও না যেন। সোজা ওখানে যাও, হাওয়া বদলালে মন বদলায়।" শিবনাথের অবশ্য ধারণা, মন বদলালে হাওয়া বদলায়।

বেরুবার আগে বাবা বলেছিলেন, "হিতেনের সঙ্গে একটু দেখা করো। হিতেনের চাকরি আমি নিজে অনেক কষ্টে আপিসের কোশ্চেন পেপার বের করে এনে করিয়ে দিয়েছিলাম। হিতেন এখন লেবার অফিসার হয়েছে। আমাকে বলেছিল, নিশ্চয় একটা কিছু করে দেবো, আপনি ভাববেন না।"

অতএব হিতেনের আপিস। কারখানার ডিসপেনসারি ও লেবার আপিস এক জায়গায়। ওইখানেই শিবনাথ স্লিপ দিয়েছে। হিতেনবাবুর কখন দয়া হবে।

আসলে হিতেনবাবু এখনও হয়তো হাজির হননি। কে যেন বলছিল, লাখ-লাখ লোক চাকরি নিয়ে কাজে যাবার জন্যে আইটাই করছে অথচ সুযোগ পাচ্ছে না। আর যারা চাকরি পেয়েছে তারা লেট করবার, কামাই করবার পথ খুঁজে বের করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজে যেতে তাদের ভাল লাগে না।

শিবনাথের কাজকর্ম নেই, সুতরাং শিবনাথ যতক্ষণ প্রয়োজন বসতে পারে. দুনিয়ার-সব চাকুরে তো গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে নেই. সুতরাং তাদেরও কাজ পাবার অধিকার আছে।

গলার স্টেথোটাই কাল হলো শিবনাথের। একজন ওয়ার্কার ভিতরে ঢুকে ডাক্তারবাবুদের কাউকে না দেখে ধৈর্য হারালো। তারপর নজর পড়লো স্টেথো সহ শিবনাথের দিকে। বললো. "বেশ মাল আপনি! ডিউটিতে এসে বেঞ্চিতে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। আর রোগীর প্রাণ বেরোবার দাখিল!"

রোগীব সঙ্গে আর একজন সঙ্গী ছিল। তার মন্তব্য : "এই জন্যেই তো ডাক্তাররা প্যাঁদানি খায়। ডাক্তারি পাশ করে সাপের পাঁচ পা দেখে বসে আছে।"

কিছু বলবার সুযোগ পায়নি শিবনাথ। রোগীর মাথায় নাকি ভীষণ যন্ত্রণা। অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে অন্ধকার দেখার মতন অবস্থা। "ডাক্তারবাবু আমি কাজ করবো কি, দাঁড়াতে পারছি না।"

বুকে স্টেথো বসালো শিবনাথ। ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর শিবনাথ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মনের কথা : "শালা আমার কিছু হয়নি। কাজ

ভাল লাগছে না। আমি দুপুরে একটু জুয়ো খেলতে বসবো। কোন শালা বদ্যি আমাকে আটকায়। দরকার হলে ইউনিয়নের গদাইদাকে ডেকে আনবো, ম্যানেজার এবং বদ্যির বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো।'

"ভীষণ যন্ত্রণা। তাড়াতাড়ি ছাড়ুন। বমি আসছে।"

"জুয়ো খেলতে ইচ্ছে করছে?" শিবনাথের কথায় তড়াং করে সোজা হয়ে বসলো লোকটা।

লোকটা ভীষণ ধাক্কা খেল। এক কথায় তার রোগ ছুটে যাচ্ছে। এই সময় অনেক ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন। লোকটা আর কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়লো।

হিতেন রাজরা সেই সময় হাজির হলেন। শিবনাথকে নিয়ে তিনি অফিস ঘরে গেলেন। ব্যাপারটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। স্টেথো নিয়ে ঘুরে বেড়াবার বিপদ কী তা তাঁর অজানা নয়। দুঃখু করলেন, "ওয়ার্কারদের ক্যারাকটার বলে কিছু থাকছে না। সবাই কোম্পানিকে গ্যাঁড়া দেবার জন্য উচিয়ে রয়েছে। ডাক্তাররাও ওদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, আমি কত সামলাবো?"

এরপর হিতেন হাজরা বললেন, "সত্যশরণদা কেমন আছেন? তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সুযোগ পেলেই হায়েস্ট প্রেফারেন্স দেবো। সত্যশরণদার ছেলে বলে কথা। তা এখন কি হাত গুটিয়ে বসে থাকা হচ্ছে? আমাদের জাতের ছেলেদের যেটা স্বভাব। অন্য রাজ্যের ছেলেদের দেখেও আমাদের শিক্ষা নেই, তারা টুকটাক টুপাইস কামিয়ে যাচ্ছে যে করেই হোক।"

শিবনাথের উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন হিতেন হাজরা। "তুমি হোমিওপ্যাথি করছো, খুব ভাল কথা। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের যে অধঃপতন হচ্ছে তাতে হোল ওয়ার্ল্ড শেষ পর্যন্ত না

হোমিওপ্যাথিকে হোমে ডেকে নেয়।"

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। হিতেন হাজরার কড়া ক্যাপশুল খেয়ে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চান্স পেয়ে সত্যশরণদার ছেলেকে দেখিয়ে নিতে চাইলেন।

বুকে স্টেথো বসালো শিবনাথ। ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর : "কেন যে ওই বুড়ো সত্যশরণ আমাকে জ্বালায়। আমি তো ওর অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।"

শিবনাথ : "একটা নতুন অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যাবো?"

হিতেন : "এটা নামকরা কোম্পানি। সত্যশরণদার ট্রেনিং—কাগজ এখানে নড়চড় হয় না।"

জোরে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে হিতেন হাজরাকে। বুকের ভিতর থেকে শিবনাথ শুনছে, "একটা চাকরি বেচলে শালা এগারো হাজার টাকা কাঁচা পাবো। আমি কোন দুঃখে সত্যশরণকে তেল দেবো?"

শিবনাথ : "বাবা বলছিলেন, কাউকে যদি কিছু দিতে হয়। বাবার আপত্তি নেই। তিনচার মাসেই তো ওটা উঠে আসবে।"

হিতেন : "ছি ছি। ওকথা মুখে আনতে নেই। এখানে সব কিছু যোগ্যতার ভিত্তিতে। শুধু তোমার ক্ষেত্রে ভালবাসার ভিত্তিতে, সত্যশরণদার কাছে কৃতজ্ঞতার ভিত্তিতে। তুমি আর চারটে হপ্তা একটু ধৈর্য ধরো।"

আরও জোরে নিশ্বাস নিতে বলছে হিতেন হাজরাকে। স্টেথো বসানো হচ্ছে বুকে। তারপর, "চার হপ্তা কেন, চল্লিশ বছরে তোমার কোনো চান্স নেই। কিন্তু লোককে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, মুখের ওপর না বলতে নেই।"

শিবনাথ : "আমি কি ধরে নেবো, চাকরি হবে না।"

হিতেন : "হতে বাধ্য। আমি সত্যশরণদার সঙ্গে দেখা করবো।"

স্টেথোর মধ্য দিয়ে শিবনাথের কানে তখন ভেসে আসছে, "আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ওই বুড়ো ভামের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ছেলে-ছেলে করে পাগল করে মারলো। আমাকে যদি আদৌ কাউকে বিনাপয়সায় কাজ করে দিতে হয় তা হলো রেখা দাসের ভাইকে। রেখা আমার বান্ধবী। রেখার সঙ্গে দেখা হবে না আজ? রেখার জন্যে মনটা চনমন করছে। রেখাকে খুশি না করলে সে আড়ি করে দেবে। তখন আমাকে ওই বুড়ি বউকে নিয়েই সুখী থাকতে হবে।"

শিবনাথ : "আজ আপনি বিশ্রাম নিন। আপিস থেকে চলে যান। শরীরে অস্থিরতা রয়েছে।"

হিতেন : "আপিস থেকে যাবো, কিন্তু এইসব পোস্টে না-মরা পর্যন্ত ছুটি নেই। ওয়ার্কারদের মতন আমরা মাথার যন্ত্রণা রিপোর্ট করতে পারি না।"

স্টেথো থেকে : "রেখা, সুইট রেখাকে আমি গাড়িতে তুলে নেবো। তারপর চলে যাবো কোম্পানির গেস্ট হাউসে।"

শিবনাথ : "আপনি ওষুধ খাবেন না। একটু পরেই সব ভাল হয়ে যাবে, আপনি খুশি হবেন।"

হিতেন : "খুশি হবার উপায় আছে? সিটি সেন্টারে মিটিং রয়েছে—ওখানে কোম্পানির জন্যে অনেক খবরাখবর জোগাড় করতে হবে।"

স্টেথোতে শোনা : "গাড়িটাকে এক জায়গায় রেখে রেখাকে কি ট্যাক্সিতে তুলে নেবো? না কোম্পানির খরচে লাক্সারি ট্যাক্সি করবো? রেখা বোধ হয় তাই পছন্দ করবে।"

শিবনাথ : "আপনি কি সিটি সেন্টারের দিকে যাবেন? ওদিকে আমারও দরকার ছিল।"

স্টেথো : "ওরে হারামজাদা, তুই আমার দু'দণ্ডের সুখে ছাই ফেলবি।"

হিতেন মুখে : "খুব খুশি হতাম ভাই। কিন্তু এখন মিটিংয়ে বসবো। কখন যে যাবো, আদৌ যাবো কিনা কিছুই ঠিক নেই।"

হিতেনের বিদায়কালীন উপদেশ : "রোগী পরীক্ষা করলে সবসময় একটা ওষুধ দেবে। ওষুধের দরকার নেই এটা কখনও বলবে না, এতে পসার কমে যাবে, রোগীও হতাশা বোধ করবে, ভাববে আমার এমন রোগ যার ওষুধই নেই।".

কাঁটাতলা থানা :

ছোটবাবু ফোন ধরলেন : "হ্যালো, কাঁটাতলা থানা স্পিকিং। ও আপনি রিপোর্টার নরেনবাবু? কেমন আছেন স্যর্? আপনার 'অন্যযুগ' পত্রিকা তো ফাটিয়ে দিচ্ছে, স্যর। আপনাদের কলমের এক খোঁচায় ডি এস পি সায়েব বদলি হলেন, আমরা তো কোন ছার! তবে স্যার যদি সত্যিকথা বলতে বলেন, গোলমালটা পাকালেন থানার ওসি, খাঁড়াটা পড়লো ডি এস পি সায়েবের ওপর!...হ্যাঁ...পুলিশ তো স্যর আপনাদেরই পাঁঠা, আপনারাই ঠিক করবেন মাথার দিকে কাটবেন, না ল্যাজের দিক থেকে কাটবেন।"

"হ্যালো, আপনি জিজ্ঞেস করছেন, বড়বাবু কোথায়? বড়বাবু স্যর, শালীর ছেলের মুখেভাতে খেতে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন, রাউন্ডে গিয়েছেন। কাউকে যেন বলবেন না, আপনি ঘরের লোক তাই বললাম।"

"কোনো খবর? খবর তো স্যার, আজকাল সব হেড কোয়ার্টারে। আমাদের তো মুখ বন্ধ। কী বললেন? বন্ধ মুখই বেশি খোলা পাওয়া যায়? একটা স্টোরি দিতে হবেই— আজকে খবরের বাজার খুব খারাপ—শহরে তেমন খুনোখুনি, লেঠালেঠি, বক্তৃতাবাজী কিছু হয়নি। এতো ভাল কথা। খবর তেমন নেই বলে একদিন শাদা কাগজ দিন না—ছেলেদের এক্সাইজ বুক পাওয়া যাচ্ছে না, কাজে লাগবে। পাবলিক খুব তারিফ করবে।"

"আচ্ছা স্যার, দিচ্ছি একটা গরম। একটু স্পেশাল টাইপের ঘটনা। শুধু একটা উপকার করতে হবে। মাঞ্জা চড়াবেন একটু, লিখবেন সংবাদ পাওয়া মাত্রই কাঁটাতলার থানার কর্তব্যপরায়ণ ছোটবাবু ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে আসামীকে গ্রেপ্তার করেন।"

"ওইভাবে লজ্জা দেবেন না স্যার, ছুটবো কোথা থেকে? বুকে একটু ব্যথা আছে—ওসি বলছে ভুড়ি কমাও। তা শালা আমার একটু শাঁসে জলে চেহারা তা তোর কী? আমার ভুঁড়ি আমি সামলাবো—তুই কে? আসলে স্যার কোনো ঘটনাস্থলেই ঠিক সময়ে যেতে পারি না। যাবো কী করে? সেপাইগুলো যা আড্ডাবাজ। ওদের জড়ো করতে সময় লাগে। জড়ো হলেও ড্রাইভার পাওয়া যায় না। যখনই খোঁজ করবেন শুনবেন চা খেতে গিয়েছে। আসলে নিজের প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা আছে, ওতে ব্যস্ত থাকে। ফাঁকি মারে না আমার সেপাইগুলোর মতন।"

"তা শুনুন কেসটা। ভীষণ সিরিয়াস। একটা লোক ডাক্তার সেজে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে রোগী পরীক্ষা করছিল। কোত্থেকে একটা স্টেথো পর্যন্ত যোগাড় করেছে! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার

ভাবুন—মেয়েদের ওয়ার্ডে পর্যন্ত ওই কারবার চালিয়েছে। ছুটে গিয়ে ধরে এনেছি—যদিও সত্যি কথা বলছি, স্যার, ছুটিওনি, ধরিওনি। ধরেছে হাউস সার্জেন, ওরাই পুলিশকে দিয়েছে। কিন্তু কী সিরিয়াস অবস্থা ভাবুন। অ্যাদ্দিন শুধু ওয়ার্ডে কুকুর এবং বিছানায় ছারপোকা ঘুরে বেড়াতো। এখন ডাক্তারও দু'নম্বরী। নিরাপত্তা বলতে কিছু থাকবে না।"

টেলিফোন নামিয়ে ছোটবাবু এবার আসামী শিবনাথ সমাদ্দারকে তাঁর সামনে আসতে বললেন। তাকালেন কাগজের দিকে, তারপর বললেন, "তুমি ফেঁসে গেলে বাছাধন। অন্তত এগারোটা চার্জ থাকবে তোমার বিরুদ্ধে। তুমি বিনা পারমিশানে নিষিদ্ধ এরিয়ায় ঢুকেছো, নিজেকে গভরমেন্ট সারভেন্ট বলে চালাবার চেষ্টা করেছো। লাইসেন্স ছাড়া ডাক্তারি করবার চেষ্টা চালিয়েছো, চিটিংবাজী করেছো রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে, সিরিয়াস রোগীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছো, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছো—তাদের বুকে হাত দিয়েছো— এটসেটরা, এটসেটরা, ঠিকমতন সাজাতে পারলে জেল থেকে যখন বেরুবে তখন বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশে পৌঁছে যাবে।"

শিবনাথ বললো, "আমি এসব কিছুই করিনি, আপনি কী বলছেন?"

"করেছো, করেছো, বুঝতে পারোনি। নেহাত আমি ভাল লোক, তাই রেপের চেষ্টার চার্জ আনবার কথা এখনও পর্যন্ত ভাবছি না। ওটি হলে পুরো ফেঁসে গেলে তুমি।"

ছোটবাবু এবার কাগজগুলো পড়ছেন। "তুমি হাসপাতালে প্রথমে গিয়েছিলে আউটডোরে? ওখানে রোগীদের বুকে টকাটক

স্টেথো বসিয়েছো। তুমি মাল একটি!"

"আমি কী করবো দারোগাবাবু? সব রোগী মুখে বলছে, ডাক্তারবাবু বাঁচান। আর স্টেথো লাগিয়ে দেখি অন্য কথা। বলছে, এতোগুলো কালাপাহাড় হাসপাতালে জড়ো হলো কী করে? এদের হাড় মাঝে-মাঝে কেন ভাঙে বুঝছি।"

"তুমি কি সর্বজ্ঞ নাকি?" ছোটবাবু ব্যঙ্গ করলেন। "অন্তর্যামীর মতন সব জেনে বসে আছো!"

"স্টেথো লাগালে সব বোঝা যায় স্যর", শিবনাথ বোঝাবার চেষ্টা করছে।

ছোটবাবু বললেন, "তুমি এরপর কেবিনে ঢুকেছিলে বলাই রক্ষিতের। বলাই রক্ষিতের ছেলেও একই সঙ্গে পাশের কেবিনে রয়েছে। দু'জনেই একসঙ্গে পথ দুর্ঘটনায় পড়েছে। ছেলে বলছে, "বাবা ভাল হয়ে উঠবেন তো?" তুমি অমনি ওর বুকে স্টেথো লাগালে আর খিলখিল করে হাসতে লাগলে। তারপর বললে, "তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে।"

শিবনাথের কোনো উপায় ছিল না। ছেলের বুকে স্টেথো লাগিয়ে সে শুনেছিল, "বুড়ো কবে মরবে, মরবে তো? একটা পয়সা হাতে দিতে দেয় না, যখের ধন আগলে বসে আছে।"

"তারপর তুমি বুড়ো রক্ষিত মশায়ের কেবিনে ঢুকলে এবং তাকে এগজামিন করতে লাগলে।"

শিবনাথ অপারগ। রক্ষিত মশায়ের পুত্রবধূ ততক্ষণে স্বামীর নির্দেশে এই কেবিনে এসে শ্বশুরকে নরম পাকের সন্দেশ খাওয়াচ্ছে, আর কড়াপাকের প্রশ্ন করছে। "বাবা, আপনার চাবিগুলো সাবধানে রাখতে হবে, যা চোরছ্যাঁচড় চারদিকে।"

বিজনেসম্যান বলাই রক্ষিত মুখে বলছেন, "যা বলেছো বউমা! চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশটা বোঝাই হয়ে গেলো। কিন্তু কোথায় যে চাবিগুলো গেলো মনে করতে পারছি না। মাথাটা একটু হাল্কা হলে আবার মনে আনার চেষ্টা করবো।"

এই সময় শিবনাথ বলাই রক্ষিতের বুকে স্টেথো বসিয়েছিল। ওখানে সে শুনতে পাচ্ছে : "এক নম্বর চোর তো তোমার স্বামী, যার এজেন্ট হয়ে তুমি এসেছো। চাবিগুলো আমি সুকুমারীর আলমারিতে লুকিয়ে রেখে এসেছি—সুকুমারী নিজেও জানে না। যদি আমাকে বে করে তবে জানবে। ভারি মিষ্টি মেয়ে সুকুমারী, টুকটুকে বউ হবে আমার।"

ছোটবাবু বকুনি লাগালেন, "আযাঢ়ে গপ্পো ফাঁদবার জায়গা পেলে না। কেন তুমি হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকলে? বদ মতলব না থাকলে কোনো লোক জেনানা ওয়ার্ডে ঢোকে না।"

"আমি ওখানে ঢুকিনি, স্যার। আমাকে হাতে-পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।"

শিবনাথ মিথ্যে কথা বলছে না। তখন ভিজিটিং আওয়ার। কোথাও কোনো ডাক্তার নেই, নার্সরাও টি-ভি দেখতে উধাও। সেই সময় স্টেথো গলায় দিয়ে পুরুষ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসছিল শিবনাথ। এক ভদ্রমহিলা জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন, "ডাক্তারবাবু দয়া করে একবার আসুন, গিয়ে দেখি এক বেডের রোগী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না।"

ওই দৃশ্য দেখে যে মহিলা শিবনাথকে ডেকে এনেছেন তিনিও মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা বলছেন, "আমার লক্ষ্মী প্রতিমা বউমা। স্টোভে জ্বালাতে গিয়ে কী হলো। ডাক্তারবাবু বাঁচবে তো?"

এই মহিলার পিঠে স্টেথো লাগালো শিবনাথ। তারপর সে শুনতে পেলো মনের কথা : "বউমা মাগী বড় জ্বালা জ্বালিয়েছে। মরবার সময় আবার ফাঁসিয়ে না যায়। আমি ওকে মরতে বলেছি। কিন্তু পরের কথায় যদি কেউ গায়ে কেরোসিন ঢালে তা আমি কী করবো?"

মহিলা তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, "বউমা, কোনো ভয় নেই, ঠাকুর তোমাকে রক্ষে করবেন। ঘরের লক্ষ্মীকে আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"

আরও দু-একটা কেস দেখেছে শিবনাথ। তারপরেই ধরা পড়েছে শিবনাথ।

তারও একই বক্তব্য : "ডাক্তার যদি না থাকে, আমাকে যদি জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি কী করবো? আমার নিজেরই তো মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। এমনি এক রকম শুনছি, স্টেথো লাগালেই আর একরকম কানে আসছে।"

ছোটবাবু বিশ্বাস করছেন না, জানতে চাইছেন সে ড্রাগ খেতো কিনা। "থানায় ধোলাই খেলে ছোটখাট নেশা বাপ বাপ করে পালাবে।"

ঠিক এই সময় হৈ-চৈ পড়ে গেলো। কাঁটাতলা থানা এলাকায় গোলাপ মিত্তিরের ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে। গোলাপ মিত্তির বুঝতেই পারছেন মিনিস্টারের শালা। একটা কিছু ব্যবস্থা না হলে শালাবাবু তো ফোন তুলে জামাইবাবুকে এক হাত নেবে। শালাবাবুর থানায় আসার সময় নেই। তাঁরা চামচা কেসটা তদ্বির করছে। ছোটবাবু জানেন এর অবধারিত ফল হোলসেল ট্রান্সফার—কাঁটাতলা থানার ইঁদুরগুলোকে পর্যন্ত বদলি করে অন্য ইঁদুর আনবার অর্ডার দেবেন

বড় সায়েব।

ছিনতাইয়ের ব্যাপারে দুটো লোককে অপহরণ করে এনেছে ইতিমধ্যে। তার মধ্যে একটাকে বিরাট এক থাপ্পড় লাগালেন ছোটবাবু। তবু সে বলবে না কোথায় শালাবাবুর ব্যাগ রেখেছে।

আর একটা থাপ্পড় পড়লো। তবু ফল হলো না। হঠাৎ বড়বাবু শিবনাথকে চান্স দিলেন। "খুব লেকচার দিচ্ছিলে মনের কথা শুনতে পাও। দেখাও দিকি বিদ্যেখানা।"

শিবনাথ এবার লোকটাকে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো।

স্টেথো : "মিনিস্টারের ব্যাগ আমি নিইনি। আমি এখনও এতো বড় চোর হইনি, হইনি।" আরও শব্দ আসছে।

শিবনাথ বললো, "লোকটা বাসন চুরি করেছে তিনদিন আগে দেশবিক্রম লেন থেকে।"

ছোট্রবাবু প্রথমে খুব সন্তুষ্ট হলেন না। দ্বিতীয় আসামীকে আনালেন এবং আক্রমণ করলেন। কোনো ফল হলো না।

আবার চান্স পেলো শিবনাথ আসামীর বুকে স্টেথো বসিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে বললো। লোকটা নিশ্বাস নিতে চাইছিল না। ছোটবাবুর ধমকানিতে কাজ হলো।

শিবনাথের ঘোষণা, স্টেথো বলছে : "শালাবাবুর ব্যাগ আমি নিয়েছি। রেখেছি লুকিয়ে কয়লার ডিপোয়।"

ছোটবাবু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তবু সঙ্গে-সঙ্গে কয়লার ডিপোয় লোক পাঠালেন উইথ আসামী।

আধঘণ্টা পরে ছোটবাবু খুব আদর করলেন, চা খেতে দিলেন শিবনাথকে। বসতে বললেন। কারণ সেপাই ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে

শালাবাবুর হারানো ব্যাগ সমেত। ছোটবাবু মা কালীকে নমস্কার করলেন। "মস্ত ফাঁড়া থেকে বেঁচে গিয়েছি, মা।"

ছোটবাবু এবার শিবনাথের স্টেথোটা ধরে নাড়লেন চাড়লেন, কিছু বুঝতে পারলেন না। নিজে একবার স্টেথোটা বগলে লাগিয়ে শিবনাথের বুকে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তিনি ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছাড়া কিছুই পেলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন, "বংশে কেউ তান্ত্রিক ছিলেন? দাদুর বাবার হিসট্রি শুনে কপালে হাত ঠেকালেন—তন্ত্র, মেডিসিন সব মিলে মিশে অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটেছে।"

ফিস ফিস করে তিনি বললেন, "তোমাকে আমি ট্রাব্‌ল দেবো না, অন কন্ডিশন যে আমাকে মাঝে-মাঝে তুমি একটু হেল্প করবে। আর শোনো ছোকরা, তোমার এই স্টেথোর ব্যাপারটা ভীষণ গোপন রেখো, না-হলে বিপদে পড়ে যাবে।"

ভাঁড়ের চা খাওয়া শেষ করে ছোটবাবু একবার নিজেকে পরীক্ষা করালেন, পুলিশকে কেউ এসব পরীক্ষা করে না, কিন্তু ছোটবাবুর হুকুম।

বুকে স্টেথো লাগিয়ে অনেকক্ষণ কথা শুনলো শিবনাথ। তারপর বললো, "বড়বাবু সম্বন্ধে ভীষণ দুশ্চিন্তা করছেন।"

ছোটবাবুর বিস্ময় বেড়ে চলেছে। "তুমি যখন জেনেই গিয়েছো, আমাকে একটু হেল্প করো। তোমাকে পাঠাচ্ছি ওঁর কাছে, উনি কী ভাবছেন দেখো।"

বড়বাবুর বুকে আচমকা স্টেথো বসানো যায় না। আবার হাঙ্গামায় পড়ে যাবে শিবনাথ।

ছোটবাবু বললেন, "তোমার তো সুবিধে রয়েছে। তুমিও তো

হোমিওপ্যাথ।"

শিবনাথ স্বীকার করলো, মহেশ ভট্টাচাজ্যির বই কিনেছে, কিন্তু এখনও পড়া হয়নি।

ছোটবাবু বললেন, "ওই হয়েছে। সব বই উকিল ডাক্তাররা পড়ে না, হাতের গোড়ায় রেখে দেয়, দরকার হলে দেখে নেয়।"

ছোটবাবু এবার থানার ওপরে বড়বাবুর কোয়ার্টারে চলে গেলেন। বড়বাবুর কাজের মেজাজ নেই। শালীর ওখানে ছ'খানা চিংড়িমাছ ভাজা খেয়ে পেটটা ইতিমধ্যেই ভুটভাট করছে।

"খুব ভাল হোমিওপ্যাথ স্যার, ভবিষ্যতে বিধান রায় হতে পারে।"

বড়বাবু : "তুমি একটা গবেট। বিধান রায় হোমিও ছিলেন না। হোমিওপ্যাথ ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বয়ং রামকেষ্টদেবের চিকিৎসা করেছিলেন। ছিলেন ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার, পি ব্যানার্জি (মিহিজাম)।"

একটু পরে শিবনাথ ফিরে এলো ছোটবাবুর কাছে। বড়বাবুর মুখে ছোটবাবু সম্পর্কে অতো মিষ্টি কথা। কিন্তু স্টেথোতে শোনা যাচ্ছে : "তোকে আমি এই থানা থেকে হটাবো, হটাবো। তোকে আমি বাঁশ দেবো, যতই ডাক্তার পাঠিয়ে মাখন লাগাও।"

ছোটবাবু আরও এক ভাঁড় চা অফার করলেন শিবনাথকে। বললেন, "দূর থেকে লোকের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা তুমি শুনতে পাও না?"

শিবনাথ বললো, "সেটা তো পরবর্তী পদক্ষেপ, তার জন্যে রিসার্চ করতে হবে। এখন এই স্টেথোটাই ভরসা।"

ছোটবাবু বললেন, "তোমার কেস আমি তুলে দিচ্ছি না। ওখানে

ওই ব্যাগ চোরের নামও জড়িয়ে দিচ্ছি। লিখে রাখছি ওকেও হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে মেয়েদের ইজ্জতে হাত দিতে দেখা গিয়েছে। তুমি আমার কথাবার্তা না শুনলে তোমার ওই কেস আমি গুবলেট করে দেবো কিন্তু যখন যা বলবো শুনতে হবে।" ছোটবাবু যেন বিশ্বাস করছেন, রিসার্চের কাজেই হাসপাতালে ঢুকে পড়েছিল শিবনাথ।

ছোটবাবু এবার ফোনে সি আই সায়েবকে ধরলেন। বিনয়ে বিগলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার খুকখুকে কাশিটা কেমন আছে স্যার? একজন নতুন ডাক্তারকে অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছি স্যার। আপনার কাছে পাঠাচ্ছি স্যার— একেবারে নতুন লাইন—তান্ত্রিক হোমিওপ্যাথ। ফ্যামিলিতে এম-ডি পর্যন্ত ছিল, মেডিক্যাল কলেজে না ঢুকে তান্ত্রিক হোমিও হয়েছে।"

শিবনাথ এইসব হাঙ্গামায় যেতে চায় না। সি-আইকে কী ওষুধ দেবে সে?

ছোটবাবু পরামর্শ দিলেন, "খুব সহজ। একটা নাম মুখস্থ করে নাও। পালসেটিলা ২০০। দাঁড়াও দাঁড়াও! শুধু ওই লিখলে তোমার প্রেসক্রিপশন জমবে না। তুমি লিখবে—হ্রীং ক্রীং বৃহৎ পালসেটিলা—মনে রাখবে তুমি তান্ত্রিক হোমিও। অর্ডিনারি হোমিওপ্যাথ তুমি নও।"

"হোমিওপ্যাথরা আমাকে হাজতে পাঠাবে, স্যার। ওটা এখন সায়েন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কিসসু ভেবো না। থানা মানে তো আমি। এখানেই তুমি আসবে, চা খাবে, থানা তো তোমার মামার বাড়ি এখন থেকে। বড়বাবুকেও তো লটকে দিয়েছি।"

শিবনাথ বললো, "আরও বিপদে পড়ে যাবে স্যার। বড়-বড় হোমিও দোকানে ওই প্রেসক্রিপসন তো সার্ভ করবে না।"

ছোটবাবুর মাথায় কথাটা ঢুকলো। "তোমাকে যত বোকা দেখায় তত বোকা তুমি তো নও। শোনো, প্রেসক্রিপসনটা মুখে বলবে। তারপর শুনিয়ে দেবে এটা কোনো দোকানে পাওয়া যাবে না। তুমি নিজে সাপ্লাই করবে। প্রথম ডোজটা সঙ্গে-সঙ্গে দিয়ে দেবে। নো অসুবিধে—তোমার গাঁটের কড়ি খরচ নেই। আমার কাছে গোটা পুরনো হোমিও শিশি পড়ে আছে, ওগুলো নিয়ে যাও।"

সি-আই সায়েবের ফোন ছোটবাবুকে। ইতিমধ্যে সি-আই সায়েবের স্টেথো রিপোর্ট শিবনাথের কাছ থেকে ছোটবাবু পেয়ে গিয়েছেন—"ছেলেটি ভাল, ছেলেটি ভাল...ও সি-র থেকে ভাল...অথচ এর নামে ডেলি কমপ্লেন করছে ওসি, বলছে ট্রান্সফার করাও ওয়্যারলেস সেকশনে।" এই ওয়্যারলেস হলো ওয়ার্থলেস সেকশন—একটা কাঁচা পয়সা নেই।

সি-আই সায়েব বলছেন "হ্যালো সুধাময়...তোমার ওই তান্ত্রিক হোমিওর ওষুধ খেয়ে ড্রামাটিক রেজাল্ট। খুকখুকে কাশিটা সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্টি চলে গিয়েছে। ভাবছি একবার ওঁকে মিনিস্টারের শালাবাবুর কাছে পাঠাবো কিনা। জানো তো গোলাপ মিত্তিরের একটা বিশ্রী মাথা ধরে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না।"

"ছেনতাই ব্যাগ ফেরতে পেয়ে উনি খুশি তো স্যার?"

"খুশি বলে খুশি! ওই ব্যাগে জরুরি সব কাগজপত্তর ছিল। সেসব যদি কাগজের লোকের হাতে পড়তো তা হলে খুবই বিপদ হতো।

তা তোমার নেকসট প্রমোশন কবে যেন ডিউ হচ্ছে?"

"আপনারা গুরুজন রয়েছেন, ওসব নিয়ে চিন্তা করি না, স্যার। এই কাঁটাতলা থানাকে পরিষ্কার করতে হবে, আরও পরিষ্কার করতে হবে স্যার। আমি এখন স্যার অন্য জায়গায় সি-আই হয়েও আনন্দ পাবো না।"

সি-আই সায়েব সব বুঝতে পারছেন। তিনি ইঙ্গিত দিলেন, কাঁটাতলা থেকে নড়ানো হবে না, ওখানেই সেজোবাবু হবেন সুধাময় পাল, আপনাদের ছোটবাবু।

"তান্ত্রিক হোমিও। একেবারে নিউ লাইন। রেভলিউশন বলা চলতে পারে। আগে অ্যালোপ্যাথ-হোমিও দেখেছি। সায়েন্সের নীতিবাগীশরা কী বললো তাতে কিছু এসে যায় না, জনগণের কীসে উপকার হয় সেটাই সবাইকে দেখতে হবে," মিনিস্টারের শালাবাবু জ্ঞান দিলেন।

তারপর শিবনাথকে বললেন, "সি-আই সায়েব আমার বিশেষ বন্ধু। এমন লোক হয় না। ভীষণ এফিসিয়েন্ট। যে ভাবে আমার ব্যাগ উদ্ধার করলেন ভাবা যায় না। ওয়াশিংটন পুলিশ অতো এফিসিয়েন্ট নয়। জেনেভাতে তো নয়ই। লন্ডনে তো ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে শুনলে পুলিশ খাতাই খুলবে না। এখানে সি-আই সায়েব আমার বহুদিনের প্রাণের বন্ধু। তাই।"

শিবনাথ এবার শালাবাবুর বুকে স্টেথো বসালো। ঘড়-ঘড় শব্দ।...বুকের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে... "বন্ধু না ছাই! জামাইবাবু মিনিস্টার না থাকলে তোমরা শালারা আমার দিকে তাকাবে না। জামাইবাবু থাকতে-থাকতে আমাকে গুছিয়ে নিতে হবে।"

শালাবাবু একটু কথা বলতে ভালবাসেন। শিবনাথকে বললেন, "রোগটা আমার মাথায়, আপনি কিন্তু পরীক্ষা করছেন বুক।"

"বুকটাই তো সব। পুলিশের কন্ট্রোল রুম।"

"জানেন ডাক্তারবাবু, জামাইবাবু নিজে আমার এই মাথা ধরা নিয়ে চিন্তিত। নিজে সাজেস্ট করলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধরে মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে দিচ্ছি, সরকারি হাসপাতালের সাতজন চীফ তোমাকে দেখুক। আমি ভাবলুম, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। তা যা বলছিলাম, আমার জামাইবাবুটির শালা অন্তপ্রাণ। এমন লোক হয় না।"

"জোরে নিশ্বাস নিন।" স্টেথো বসালো শিবনাথ।

ঘড়-ঘড় আওয়াজ। স্টেথোর মধ্য দিয়ে শিবনাথ শুনতে গেলো : "ভালো লোক না মুণ্ডু। ঘড়িয়াল দ্য গ্রেট। আমার থ্রু দিয়ে যা কামাই হচ্ছে তার সিংহ ভাগ নেবে—মিনিস্টারশিপ চলে গেলে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ রেখে চালাবে।"

শালাবাবু বললেন, "চিরকালই ব্রিলিয়ান্ট, আমার জামাইবাবু। দেখেই বুঝেছিলুম আমরা, তাই-না বাবা অমন জামাই করলেন। আমরা চিরকালই ভীষণ প্রগতিবাদী। প্রগ্রেসিভ আন্দোলনের জন্যই সব রকম ত্যাগ করেছি আমরা।"

শালাবাবুর বুকে বসানো স্টেথো থেকে অন্য কথা আসছে: "বাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না ওই বাউণ্ডুলের সঙ্গে দিদির বিয়ে দেন। কিন্তু উপায় ছিল না। দিদি তখন গোপন সম্পর্ক থেকে গোলমেলে কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে। বিয়ের পরও দিদি হাড়ে-হাড়ে জ্বলেছেন। স্বামী কুটোটি নেড়ে দুটো করেননি। দিদি ইস্কুল মাস্টারি করে সংসার চালিয়েছে। বাবা শেষ জীবন পর্যন্ত দুঃখ করেছেন,

একটা হতভাগার হাতে পড়ে মেয়েটার জীবন নয়ছয় হলো।"

শালাবাবু বলছেন, "আমার জামাইবাবুর জীবনটা ত্যাগের—ভোগকে তিনি সারা জীবন শতহস্ত দূরে রেখেছেন, সুখকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিয়েছেন।"

স্টেথো থেকে অবশ্য অন্য কথা শোনা যাচ্ছে : "সুখের স্বাদ পেয়ে জামাইবাবু এখন উপোসী ছারপোকার মতন হয়ে উঠেছেন। আমি তো নিমিত্তমাত্র—যেখান থেকে যা ওঁর নাম করে গুছোচ্ছি তার কড়াক্রান্তি হিসেব দিতে হবে ওঁর কাছে। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে জামাইবাবুর নয়—অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে সুখের স্বাদ চাইছেন জামাইবাবু।"

"বৃহৎ পালসেটিলা হ্রীং ক্রীং"—প্রেসক্রিপশন দিলো শিবনাথ। তারপর পকেট থেকে মোড়ক বের করে শালাবাবুকে দিলো।

পুরিয়া হজম করে শালাবাবু জানতে চাইলেন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ সম্বন্ধে শিবনাথের ধারণা কী রকম? জামাইবাবুর কাছে নিয়ে যাবে একদিন। সকালবেলায় মেজাজটা ঠিক থাকে না।

ঠিক এই সময় মিস্টার শেঠিয়া হাজির হলেন। শালাবাবুর বিজনেস পার্টনার।

শেঠিয়াজী বললেন, "টু হানড্রেড টোয়েন্টিফাইভ ইয়ার্স ধরে এই রাজ্যে আছি। আমি তো এখানকারই লোক।"

শেঠিয়াজীর একটু হাঁপ-এর সমস্যা আছে। তান্ত্রিক হোমিওপ্যাথির এমন দুর্লভ সুযোগ ছাড়া যায় না। শেঠিয়াজীর বুকে স্টেথো বসিয়ে ঘাবড়ে গেলো শিবনাথ, ওখান থেকে সে শুনতে পাচ্ছে : "দুশো পঁচিশ বছর আছি তো শালা কী হয়েছে? এখানকার লোকগুলো ওঁচাটে—কারু-না-কারু টাকার ভাগ নেবে। জোচ্চুরির, বদমাইসির

রাজা, কিন্তু রবিঠাকুর থেকে কোটেশন ঝাড়বে।"

"এই শালাবাবু আমার আপন ভাইয়ের থেকে বেশি," শেঠিয়াজী মৃদু হেসে শিবনাথকে বললেন।

আবার স্টেথো বসালো শিবনাথ। ওখান থেকে আওয়াজ : "তিন বছর আগে গোলাপ মিত্তিরকে চিনতাম না। কোন দুঃখে তুমি শালা আমার ভাই হতে যাবে? মিনিস্টার ভীষণ ত্যাঁদড়—তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে কোনো বিজনেস দেবে না, তাই তোমাকে পার্টনার করেছি।"

শালাবাবু এবার শিবনাথকে বললেন, "শেঠিয়াজী আমার দাদা, দেবতুল্য মানুষ। আমাকে পার্টনার করে আর একটা কোম্পানি স্টার্ট করবেন! আজ লেখাপড়া হবে।"

মিষ্টি হাসলেন শেঠিয়াজি।

ওঁর বুকে স্টেথো পরীক্ষা তখনও চলেছে। সেখানে এবার শোনা যাচ্ছে : "আমাকে যত বোকা ভাবছো আমি তত বোকা নই! কিছু কিছু দগদগে প্রমাণ রাখছি মন্ত্রীর স্বজনপোষণের। যেমন আজকের কনট্রাক্ট। ওটা আমার সঙ্গে করাচ্ছি না, করাচ্ছি অন্য পার্টির নামে। মন্ত্রী কখনও বেঁকে বসলে কাগজে সব খবর পাঠিয়ে দেবো, দলিলের ছবি সমেত 'অন্যযুগ' পত্রিকায় একটা আইটেমে চাকরি যাবে মন্ত্রীর।"

এবার শেঠিয়াজীকে ওষুধ দিলো শিবনাথ। ভাগ্যে অনেক কষ্টে আর একটা ওষুধের নাম মনে পড়লো—বৃহৎ ক্যালকেরিয়া ফস হ্রীং ক্রীং।

শিবনাথ আকারে-ইঙ্গিতে শালাবাবুকে বোঝালো, "আজ দিনটা ভাল নয়, তান্ত্রিক দিক থেকে। আজ সই না হলেই ভাল।"

শেঠিয়াজী ইতিমধ্যেই ভক্ত হয়ে উঠেছেন শিবনাথের। কাগজপত্তর যখন সই হচ্ছে না, তখন নতুন কর্মসূচির প্রয়োজন। তিনি ইতিমধ্যেই হাঁপের প্রকোপ কম বোধ করছেন।

শেঠিয়াজী বললেন, "চলুন আমার এক ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের কাছে। তাঁর প্রায়ই এক কপালে ব্যথা হয়। ভীষণ কষ্ট পান। ওঁকে একটু খাড়া করে দিন আপনার তান্ত্রিক হোমিওতে।"

শেঠিয়াজীর বুকে আর একবার স্টেথো লাগাবার লোভ সামলাতে পারলো না শিবনাথ। স্টেথোর মাধ্যমে সে শুনলো, "ফ্যামিলি ফ্রেন্ড না কচু। আমার রক্ষিতা শ্যামলী দাস, যাকে একবার সিনেমায় নামিয়েছিলেন। এখন একটু শ্যামলীর ওখানে যাবার জন্যে মনটা চনমন করছে। একটা ছুতো পাওয়া গেলো।"

শ্যামলী দাস তো ডাক্তারসহ শেঠিয়াজীকে দেখে অবাক। এমন ডাক্তার দুষ্প্রাপ্য তাই শেঠিয়াজী সুযোগ পেয়েই বিনা নোটিশে ধরে নিয়ে এসেছেন।

সুদেহিনীকে একটু পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তারবাবুকে প্রস্তুত হতে শেঠিয়াজী বাইরে যেতে চাইলেন। শিবনাথ ভদ্রতা করে বললো, "তেমন প্রয়োজন নেই।"

শ্যামলীর পিঠের দিকে স্টেথো লাগালো শিবনাথ। সেখানকার শব্দ : "শেঠিয়াজীর ঢং দেখলে মাথা ঘোরে।"

শ্যামলী এবার শিবনাথকে বললো, "শেঠিয়াজী আমার পারিবারিক বন্ধু—অভিভাবকের মতন।"

জোর করে নিশ্বাস নিতে বললো শিবনাথ। শ্যামলীর বুকের

খবর : "অভিভাবক না মুণ্ডু। মাসোহারা দেন, ইচ্ছে হলে আসেন, না-হলে আসেন না। আরও কোথায় কি বাধিয়ে রেখেছেন ঠিক নেই। একবার অন্য কাউকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, মুখের ওপরে বলে দিয়েছি, আমি ভাড়ার ট্যাক্সি নই। চটেছিলেন। তা চটলে আমার বয়ে গেলো!"

চিকিৎসা হয়ে যাবার পরে শেঠজী কিছুক্ষণ থেকে যাবেন ইঙ্গিত দিলেন। শ্যামলী বললো, "আজ আমার যা মাথা ধরেছে না! অজ্ঞান হয়ে না যাই।"

"জোরে নিশ্বাস নিন," শিবনাথ বললো। স্টেথোতে সে যা শুনছে তাতে বোকা বনে যাচ্ছে : "আমার মাথা ধরেছে না ছাই। ওই মাথা ধরার নাম করে তো বুড়োটাকে বিদায় করি যখন ওর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া, মিস্টার সুরেকার সঙ্গে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। বলা নেই কওয়া নেই, হুড়ুম করে এসে পড়লে হবে কী করে? এটা কি খাবারের দোকান যে সারাক্ষণ ঝাঁপ খোলাই আছে? হপ্তায় একদিনও দোকান বন্ধ হয় না?"

শেঠজী এবার শ্যামলীকে বললেন, "ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দেবেন এখনই ওষুধটা খেয়ে নাও।"

শ্যামলীর বুকে শিবনাথের স্টেথো লাগানোই আছে। ওখানকার রিপোর্ট : "হা ভগবান! এখন কী হবে? তান্ত্রিক ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া মানেই তো রোগ ভাল হয়ে যাওয়া। এখন আমি কী বলবো?"

শিবনাথ আর হাঙ্গামায় গেলো না। সে প্রেসক্রিপশন দিলো : বৃহৎ পালসেটিলা হ্রীং ক্রীং।

"ওটা কী ডাক্তারবাবু? আমার তো তিনটে মাদুলি আছে—হ্রীং

ক্রীং।"

শেঠিয়াজী ব্যাখ্যা করলেন, "এইটাই তো ওঁর বিশেষত্ব। অনেক কষ্টে সন্ধান পেয়েছি মিনিস্টারের থ্রু দিয়ে। আসলে ওষুধের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক চার্জ করা হয়। তুমি এখনই কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারো। আমি নিজে বসে থেকে দেখে যাবো তুমি ভাল হয়ে উঠেছো।"

শিবনাথ আর পারলো না। বললো, "এই ওষুধ মাথা ধরা অবস্থায় খাওয়া চলবে না। খেতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। ওষুধের দু'ঘণ্টা আগে ও পরে খালি পেটে থাকতে হবে।"

কৃতজ্ঞ শ্যামলী ডাক্তারের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলো। শেঠিয়াজী ঘর থেকে একটু এগিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলো, "ডাক্তারবাবু, আপনি কি অন্তর্যামী?"

উত্তর দিতে পারলো না শিবনাথ। শ্যামলী ওর টেলিফোন নম্বর জানতে চাইলো। টেলিফোন নেই, তাই নিজের নম্বরটা দিয়ে ওকে আবার টেলিফোন করতে অনুরোধ জানালো শ্যামলী। "আপনাকে আমার খুব দরকার, ডাক্তারবাবু।"

ওই দিনেই টেলিফোন করেছিল শিবনাথ। শ্যামলী নাছোড়বান্দা, আজকেই আসতে হবে, শ্যামলীর কাছে।

শিবনাথ যখন আবার শ্যামলী দাসের ফ্ল্যাটে পৌঁছলো মিস্টার সুরেকা তখনও বিদায় নেননি। তবে বিশ্রামপর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। জামাকাপড় পরে ফিটফাট হয়ে বেরুবার জন্যে রেডি।

শ্যামলী পরিচয় করিয়ে দিলো, ভূতপূর্ব বিজনেসম্যান ও বর্তমানে সমাজসেবী। বিখ্যাত সমাজসেবী হৃদয়চাঁদ সুরেকা। আগে জে. পি ছিলেন। শীঘ্র ডেপুটি মেয়র বা শেরিফ হতে পারেন।

মিস্টার সুরেকারও ক্রনিক ব্যাধি আছে। শ্যামলীর অনুরোধে নিজেকে একটু পরীক্ষা করিয়ে নিতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন সুরেকাজী।

বিশিষ্ট রুগীকে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হলো শিবনাথ। ইতিমধ্যে শ্যামলী বললো, "ওষুধটা আমি খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু যন্ত্রণাটা যেন বাড়ছে।"

চিন্তিত হয়ে উঠলো শিবনাথ। প্রথমে শ্যামলীকেই সে পরীক্ষা করতে লাগলো।

শ্যামলী লম্বা নিশ্বাস নিচ্ছে শিবনাথের নির্দেশমতন, আর শিবনাথ স্টেথোর মধ্য দিয়ে শুনতে পাচ্ছে : "অ্যাদ্দিন আমার মাথা ব্যথা, মাইগ্রেইন ব্যথা কিছু ছিল না, স্রেফ কাউকে বিদায় করবার জন্যে ছাড়া ব্যথার কথা উঠতো না। আজ আমার কিছু সত্যিই মাথা ব্যথা করছে। মিস্টার শেঠিয়া আচমকা এসে অনিচ্ছুক ভাবে ফিরে গেলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না, বড্ড কৃপণ, সব ব্যাপারে দরদস্তুর না করে সুখ পায় না। লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি, মিস্টার সুরেকা সেদিকে অনেক দিলদরিয়া লোক। কিন্তু সুরেকাজী কি আমাকে বেশি দিন রাখবেন?"

পকেট থেকে আর একটা ডোজ বের করে দিলো শিবনাথ। কাল খেয়ে নিতে হবে। শনি ও মঙ্গল ছাড়া এই তান্ত্রিক হাইডোজ চলে না।

সুরেকাজী সারাদিনের সুমধুর সান্নিধ্যে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে আছেন। জানালেন, তিনি এখন ব্যবসা বাণিজ্য কিছু করেন না। সারাক্ষণ ভগবতী ট্রাস্টের সেবা করেন—সোস্যাল ওয়ার্কার ছাড়া তাঁর অন্য

কোনো পরিচয় নেই। ব্যবসা চলে গিয়েছে জামাইদের হাতে। ভগবতীদেবী যে তাঁর সদ্যপ্রয়াতা স্ত্রী তাও জানা গেলো।

সুরেকাজীর রোমশ বুকে স্টেথো বসালো শিবনাথ। ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর শোনা গেলো : "জামাইকে সামনে রেখে ব্যবসার কলকাঠি সব আমিই নাড়ছি। একটু সোস্যাল ওয়ার্ক না করলে মিনিস্টার এবং গভর্নরের কাছে যাওয়া যায় না, বিজনেসের খুব অসুবিধা হয়। ওই শালা, শেঠিয়াজী কী ছিল? এই ক'দিনে কী হলো? স্রেফ ওই মিনিস্টারের দয়ায়। শালাবাবুকে এমন কব্জা করেছে।"

সুরেকাজী একটু কাশলেন। মিষ্টি হেসে বললেন, "আমার এই ভগবতী ট্রাস্টের স্বপ্ন হলো মেয়েদের মঙ্গল করা। আমার ওয়াইফ চাইতেন মেয়েরা জেগে উঠুক। তাই মেয়েদের আমি সব সময় সামনে রাখছি। শ্যামলীকে আমি অ্যাডভাইসার রেখেছি, মেয়েদের প্রবলেম ওর মতন কে বুঝবে?"

লজ্জা পেলো শ্যামলী। বুকে স্টেথো লাগালো শিবনাথ। স্টেথোর খবর : "শ্যামলীকে মাসে-মাসে যে টাকা দিচ্ছি সেটা নিজের পকেট থেকে দিতে হচ্ছে না, ট্রাস্ট দিচ্ছে। মেয়ে-জামাইয়েরও কোনো সন্দেহ হচ্ছে না। একটা উড়োখবর গিয়েছিল বোধ হয়—মেয়ে কান্নাকাটি করে হাঙ্গামা বাঁধাবার তালে ছিল। এই ভগবতী ট্রাস্ট দেখিয়ে মানসম্মান রক্ষে করা গিয়েছে।"

শ্যামলী বললো, "সুরেকাজীর বাঁ-চোখটা মাঝে-মাঝে নাচে। যন্ত্রণা নেই, কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেন। এখানে আসার পরে বাঁদিকে একটু মলম লাগাই, তবে চোখ নাচা কমে। অ্যালোপ্যাথিতে এর চিকিৎসা নেই, ডাক্তারবাবু।"

শিবনাথ স্টেথো লাগালো সুরেকাজীর বুকে। ওখানকার মেসেজ : "স্রেফ ধাপ্পা, পাছে শ্যামলী বলে আজ আসবেন না। শ্যামলী আমার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে ভাল লাগে। ওর নরম হাতটা বড় মিষ্টি। ও নিজেও খুশি হয়, ওর যত্নে আমি ভাল হয়ে যাই বলে।"

শ্যামলী এবার সুরেকাজীকে আশ্বাস দিলো, "আপনার এই রোগ ডাক্তারবাবু ঝপ করে ভাল করে দেবেন। এই দেখুন না, আমার এক কপালে যন্ত্রণা সত্যিই কমে আসছে।"

শ্যামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হচ্ছে শিবনাথের। স্টেথো লাগালেই ধরা পড়বে : "শেঠিয়াজী? সুরোকাজী? কোন ঘোড়াটা আমার পক্ষে নিরাপদ!"

সুরোকাজীকে লম্বা নিশ্বাস নিতে বলে বুকের আওয়াজ শুনে খুশি হচ্ছে না শিবনাথ।

স্টেথো বলছে : "শ্যামলী চালাক মেয়ে, ভগবতী ট্রাস্টের ট্রাস্টি হতে চাইছে। তা হলে আমি বাঁধা পড়ে যাবো। তা হচ্ছে না। কাল আমি নীলিমাকে দেখতে যাবো—শুনেছি ভেরি সুইট মেয়ে। ম্যারেড মহিলা—স্বামী থাকা অবস্থায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে অনেক হাঙ্গামা কম। তাছাড়া..."

স্টেথোটা আরও ভালভাবে বুকে ঠেকালো শিবনাথ। একটা বেয়াড়া শব্দ আছে, ভীষণ রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে। "তা ছাড়া শ্যামলীর ভাই আমাকে জোচ্চোর বলেছে। শ্যামলী ক্ষমা চেয়েছে, কিন্তু আমার আপিসের অন্য লোক শুনেছে। নীলিমাকে যদি পছন্দ হয়, যদি সে আগ্রহ দেখায়, তা হলে..."

"কালী করালী নাক্স ভমিকা হ্রীং ক্রীং"—প্রেসক্রিপশন দিলো শিবনাথ। পকেট থেকে ওষুধ বের করলো সুরেকাজীর জন্যে।

শ্যামলীর প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ বোঝালো, অনেক কষ্ট করে এই ওষুধ জোগাড় করতে হয়। অমাবস্যার রাতে কালীমূর্তির সামনে এই নাক্স ভমিকা ডাইলিউট করতে হয়।

সুরেকাজী এবার বিদায় নিলেন। তারপর শ্যামলী এসে ডাক্তারের সামনে বসলো। শিবনাথ নিজে থেকেই বললো, "দুটো ঝুড়ি থাকলে একটা ঝুড়ি ফেলতে নেই।"

শ্যামলী অবাক। আবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি অন্তর্যামী?"

কোনো উত্তর দিলো না শিবনাথ। এবার শ্যামলী বললো, "আমার ভাইকে একটু দেখুন দয়া করে। ওকে আপনি ভাল করে দিন ডাক্তারবাবু।"

শিবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "কাউকে কি আপনার ভাই কটু কথা বলেছিল?"

"ওমা। আপনি জানলেন কী করে? ওকে তো অনেক কষ্ট করে সুরেকাজীর অপিসে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন মালিককেই বলে কিনা জোচ্চোর, লম্পট, হতভাগা।"

শ্যামলীর চোখে জল। "তখনই তো রোগটা ধরা পড়লো। মাথার ব্যামো—পাগলামি। অনেক কষ্টে মেন্টাল ওয়ার্ডে ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু নিজের ভাই বলে কথা। ক'দ্দিন কষ্ট পাবে? আপনি একটা ভাল ওষুধ।..."

আজ সারাদিন শ্যামলী খবরের কাগজটা ভাল করে পড়তে পারেনি। "গেস্ট থাকলে কোনো কাজই করা যায় না ঠিকমতন!...ওমা...আজ কী ডেনজারাস খবর। আজেবাজে লোক হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে রোগী পরীক্ষা করছে! হাসপাতালগুলোকে

কেউ দেখবার নেই।"

শিবনাথ ভাবলো, শুধু হাসপাতাল কেন? এই দুনিয়ায় কেউ কাউকে দেখবার নেই।

শিবনাথের কথাটা এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন মনস্তাত্ত্বিক সুধাকর চ্যাটার্জি।

"জানেন মশাই, ওই শ্যামলীর রিকোয়েস্টে শিবনাথ তো মেন্টাল ওয়ার্ডে ওর ভাই মানবেন্দ্র দাশকে দেখতে গেলো। ওখানে, ওই পাগল বলে কিনা, 'তুমি সুরেকার কাছ থেকে আসেনি তো? লোকটা জোচ্চোর, লম্পট...!' মানবেন্দ্রর বুকে স্টেথো লাগিয়ে বিরাট ধাক্কা খেলো শিবনাথ। স্টেথো থেকেও ওই একই কথা শোনা যাচ্ছে।..."সুরেকা জোচ্চোর, লম্পট।"

গত এক দিনের অভিজ্ঞতায় শিবনাথ ভেবেছিল, মুখের কথা আর বুকের কথা এক হয় না। আর একজন পাগল বলছিল, "আমি বাড়ি যাবো না, যাবো না।" তার বুকে স্টেথো লাগিয়ে শিবনাথ শুনলো একই কথা : "আমি বাড়ি যাবো না, যাবো না।"

একটু থামলেন সুধাকর চ্যাটার্জি। জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা আপনি কী বুঝছেন?"

"অবশ্যই তাজ্জব ব্যাপার। এই ম্যাজিক বলুন, ভৌতিক বলুন, তান্ত্রিক বলুন, স্টেথোর কী অসীম সম্ভাবনা আপনি বেবেছেন ডাক্তার চ্যাটার্জি? কোটিপতি হয়ে যাবে আপনার ওই শিবনাথ সমাদ্দার অ্যান্ড ফ্যামিলি। ইন্ডিয়াও তার সমস্ত বিদেশি মুদ্রা ঘাটতি মিটিয়ে ফেলবে ওই সুপার হাইটেক স্টেথোর জোরে। এখনই ওটা পেটেন্ট করিয়ে নিতে হবে গোপনে-গোপনে, ব্যাপারটা জানাজানি

হয়ে যাবার আগে। যতদূর মনে হচ্ছে মেকানো-ইলেকট্রো কেমিকো-বায়োটেকো-তান্ত্রিকো কমবিনেশন, যা জাপানী বা জার্মানের বাপও মাথায় ঢোকাতে পারবে না। শুধু ব্যাপারটা সুপার সিক্রেট রাখতে হবে।”

“যত দেশ তাদের প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে পাঠাবে আলোচনার জন্যে কৌশলে তাদের বুকে স্টেথো বসাতে হবে এবং শিবনাথবাবুর রিপোর্ট পাওয়ার পরে ওদের মন বুঝে আলোচনায় বসাতে হবে। বিজনেস টাইকুনরাও ওই স্টেথো রিপোর্টের জন্যে ছটফট করবেন কঠিন বিজনেস নেগোশিয়েশনের আগে। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীর বুকেও এই স্টেথো বসাতে চাইবে আড়তদার থেকে মজুতদার সবাই। ট্রেড ইউনিয়নও চাইবে এই স্টেথোর সার্ভিস—মালিক দ্বিপাক্ষিক মিটিং-এ দরদস্তুর করতে বসবার সময় কত টাকা পর্যন্ত আসলে দিতে প্রস্তুত তাও জানা যাবে।”

সুধাকর চ্যাটার্জি আমার কথা শুনছেন, আর তাঁর চোখ আরও বড় হয়ে উঠছে। আমি বললাম. “খবরের কাগজের সাংবাদিকরা তো এই স্টেথো সার্ভিস পেলে চাঁদ হাতে পাবেন। বড়-বড় লোকের বড়-বড় বক্তব্যের পাশাপাশি এই স্টেথো রিপোর্ট ছাপিয়ে কাগজের সার্কুলেশন লাখ-লাখ বাড়িয়ে ফেলতে পারবেন।”

সুধাকরের চোখ আরও বড় হচ্ছে। আমি বললাম, “এই ধরুন আই-এম-এফের কর্তার বুকে স্টেথো বসিয়ে আমরা বুঝে নিতে পারবো, ওঁদের কী কী মতলব আছে। আসলে, সমস্ত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে পড়বে। স্টেথো সব ফাঁস করে দেবে।”

আমি বললাম, “শুধু একটা মুশকিল হবে, ব্যাপারটা তো বেশিদিন চাপা থাকবে না। তখন লোকে মরে গেলেও কোনো

ডাক্তারকে বুকে স্টেথো বসাতে দেবে না। সমস্ত স্টেথো নিষিদ্ধ করার দাবি উঠতে পারে ইউনাইটেড নেশনস এ, সিকিউরিটি কাউন্সিলে।"

"আর কিছু?" সুধাকর প্রশ্ন করলেন।

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সমস্ত সমাজব্যবস্থাই না ভেঙে পড়ে—সবাই তো সবার মনের স্টেথো রিপোর্ট পেয়ে যাবে। ঘর সংসার ভাঙবে, প্রেমে ভাঁটা পড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্যে গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সব কথা জানতে পারবে—অর্থাৎ প্রাইভেসীর বিপর্যায় ঘটবে।"

সুধাকর চ্যাটার্জি মন্তব্য করলেন, "কিন্তু আবিষ্কারকে, বিজ্ঞাপনকে তো কেউ চিরদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মানুষের ব্রেন যদি আমরা স্ক্যান করতে পারি তা হলে মনও বা স্ক্যান হবে না কেন?"

আমি বললাম, "যারা এই স্টেথো পছন্দ করবে না তারা বলতে পারে এটা এক ধরনের আড়িপাতা—টেলিফোনে আড়িপাতা থেকে সহস্র গুণ বিপজ্জনক এই স্টেথো দিয়ে আড়িপাতা।"

সুধাকরের পরবর্তী মন্তব্য : "আপনি বলছেন এই যন্ত্র পেলে ইন্ডিয়া বাজিমাত করবে, দুনিয়ার কেউ আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না?"

আমি বললাম, "পরবর্তী পদক্ষেপটা আপনি ভেবে নিন না। এখন স্টেথো বুকে বসিয়ে মনের কথা শুনতে হচ্ছে। দু'দিন পরে নিশ্চয়ই রিমোট কন্ট্রোল বেরিয়ে যাবে, মানে বুকে যন্তর না বসিয়ে বেতার স্টেথো দিয়ে আপনি অপরের মনের সব কথা শুনে নেবেন। তখন কী ভীষণ ব্যাপার হবে আপনি আন্দাজ করে নিন।"

সুধাকর চ্যাটার্জি খুব উৎফুল্ল উঠলেন। 'ইস্ আপনার সঙ্গে

আগে একটু কথা বললাম না কেন? শিবনাথের বৃদ্ধ বাবা সত্যশরণ সমাদ্দারের কান্না যদি দেখতেন। ছেলেকে বহু কষ্টে ওই মেন্টাল হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সারাক্ষণ সে অন্যের বুকে স্টেথো লাগাতে চাইছে। স্টেথো লাগাবার পরেই আবার উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। বলছে, তোমাদের মনে এক মুখে আর এক কেন?"

মেন্টাল হাসপাতালে গেলেই শিবনাথ সুস্থ হয়ে উঠছে। ওখানেও সে স্টেথো লাগাচ্ছে। "কিন্তু পাগলদের নাকি মুখেও যা মনেও তা।"

দুঃখ করলেন সুধাকর। "কী সিচুয়েশন বুঝুন! একটা মানুষ পাগলদের মধ্যে সুস্থ থাকছে, আর সুস্থদের মধ্যে এলেই পাগল হয়ে যাচ্ছে, ওই একটা অপয়া স্টেথোর জন্যে।"

আমি বললাম, "শিবনাথকে সুস্থ করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা ভীষণ প্রয়োজন। দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে। পরের বছর যদি সত্যশরণবাবুর ছেলে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যায় তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নয়।"

সুধাকর চ্যাটার্জির অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, ওঁর সঙ্গেই যেতে হলো মেন্টাল হাসপাতালেব অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে, পাকাপাকিভাবে পাগল ডিক্লেয়ার হবার আগে যেখানে রোগীদের রাখা হয়।

সুধাকর বললেন, "প্রশ্নটা বেশ জটিল। যে-লোক পাগলদের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে অথচ তথাকথিত সুস্থ লোকের মধ্যে এলেই পাগল হয়ে যায় সে সুস্থ না অসুস্থ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই তান্ত্রিক হোমিওপ্যাথিটা জিনিয়াসের লক্ষণ না পাগলের লক্ষণ? বড়-বড় চিন্তাবীর ও আবিষ্কারকদের পৃথিবীর লোক প্রথমে পাগল বলেছে।"

প্রথম প্রশ্নটি জটিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমি ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা না করে বলতে পারবো না। পৃথিবীতে কতকগুলো জিনিসের সমন্বয় হয়, কতক গুলো জিনিসের সমন্বয় বা সহাবস্থান সম্ভব নয়—যেমন সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার, ভালবাসা ও ঘৃণা, ন্যায় ও অন্যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওই রোগীটির খবর কী? শ্যামলী দাসের ভাই মানবেন্দ্র দাশ না কী নাম? যাকে চিকিৎসা করতে এসে শিবনাথের এই অবস্থা হলো।"

"আছে। ওইখানেই আছে। দু'জনে খুব ভাব হয়েছে, কেউ নাকি কাউকে ছাড়তে চাইছে না।" সুধাকর বললেন।

হাসপাতালের দরজার গোড়ায় এসে আমি বললাম, "আপনার এখন মস্ত দায়িত্ব সুধাকরবাবু। দেশের কথা ভেবে, নোবেল প্রাইজের কথা ভেবে আপনাকে ওই শিবনাথ সমাদ্দারকে বের করে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে ওই দুর্লভ স্টেথোসকোপটা, ওর পুরো হিসট্রিও আপনাকে তৈরি রাখতে হবে। ইনক্লুডিং শিবনাথের দাদুর বাবা দুঃখহরণ সমাদ্দার কার কাছে তন্ত্রসাধনা করছিলেন, এবং কেনই বা তিনি এই স্টেথো গলায় রেখে মারা গেলেন। অদ্ভুত কিছু ঘটেছিল কিনা সেই সময়ে?"

আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সুধাকর চ্যাটার্জি মেন্টাল হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন, "আপনি আসুন এখনই। স্টেথোটা ওর কাছে দেখতে পাচ্ছি না।"

আমি গিয়ে দেখি একটা ঘরের মধ্যে শিবনাথ সমাদ্দার ও তার রোগী মানবেন্দ্র দাশ গলা জড়জড়ি করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

মুখে তাদের কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। কিন্তু শিবনাথের সমস্ত গায়ে ছোট ছোট আঘাতের চিহ্ন। কিছুটা রক্ত বেরিয়েছে।

সুধাকরকে দেখে শিবনাথ খোসমেজাজে বলছে, "বাঁদর এসেছিল একটা। বাঁদরটা দাঁত খিঁচোচ্ছিল। মানবেন্দ্র মতলব দিলো, ওর বুকটা একবার পরীক্ষা করে দেখো। যেমন আমি ওই বাঁদরের বুকে স্টেথোটা লাগিয়েছি অমনি ভীষণ রেগে গেলো বাঁদরটা। আমাকে থাপ্পড় মেরে আঁচড়ে দিয়ে স্টেথোটা নিয়ে লাফ মেরে চলে গেলো। আর পাত্তা নেই বাঁদরটার। যদি কাল আসে ফেরত দেয় স্টেথোটা ভাল কথা।"

"আর যদি না দেয়!" কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বলে উঠলেন সুধাকর চ্যাটার্জি।

শিবনাথের বাবা সত্যশরণ সমাদ্দার কাছাকাছি ছিলেন। তিনি বললেন, "ওই তান্ত্রিক স্টেথোটা থেকেই আমার ছেলের অসুখটা বেড়ে গেলো। কাল আবার কাঁটাতলা থানা থেকে পুলিশ এসেছিল। বাঁদরটা আর ওই স্টেথোটা না-ফেরাই ভাল ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটা তা হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারবে।"

যাদের নিয়ে এতো সব আলোচনা, সেই শিবনাথ সমাদ্দারের কিন্তু কোনো খেয়ালই নেই। মানবেন্দ্র দাশের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে নিজের খেয়ালে মনের আনন্দে হেসেই চললো! আমার দিকে তারা আর তাকালো না।

আজব আপ্যায়ন

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এবং সুশীতল চট্টরাজ কলকাতার এই দুই নাগরিককে নিয়েই এবারের প্রথম গল্প। এঁদের দু'জনের সঙ্গে আমি নিজেও আছি—তবে এবারের হাঙ্গামায় আমি না থাকতে পারলেই সুখী হতাম।

বয়স বাড়ছে, নিজের শরীরস্বাস্থ্য এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা চিন্তায় সারাক্ষণ জর্জরিত হয়ে আছি—এ-সময় অত্যধিক উত্তেজনা সহ্য হয় না। নাটকীয় কোনো ঘটনার রিপোর্ট পরের দিন ভোরে সংবাদপত্রে পড়তে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হবার মতো স্নায়বিক সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, কিছু অস্বাভাবিক এবং উত্তেজক ঘটনা চোখের সামনে এবং সেই অভিজ্ঞতা আমাকে এখনও শান্ত হতে দিচ্ছে না এবং আজ আমাকে লিখতে বসিয়েছে।

লেখক হিসেবে আমার একটা অলিখিত নীতি আছে—যাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সখ্যতা আছে, যাঁদের বাড়িতে আমি আতিথেয়তা নিয়েছি তাঁদের পারিবারিক কোনো ঘটনা সম্পর্কে আমি গল্প লিখি না।

এক্ষেত্রেও গল্প লেখা ঠিক নয়। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন না, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন,

"ব্যাপারটা নিয়ে তুমি একটা গল্প লেখো। যে-কাগজে তুমি লিখবে তার একশ কুড়িখানা কপি আমি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে নেবো ফর প্রাইভেট সার্কুলেশন। তবে, অন ওয়ান কন্ডিশন, যার জন্যে এই স্পেশাল আপ্যায়ন তার নামটা পাল্টাতে পারবে না। ওই লোকটা সম্বন্ধে কাগজে, ম্যাগাজিনে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত খবরই তো বের হয়, ওই সব রঙিন সাক্ষাৎকারের সঙ্গে আসল খবরটাও জানা হয়ে যাক পাবলিকের।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আরও বলেছিলেন, "আমার এই শরীরে নীল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। বুঝতেই পারছো, পাবলিক কথাটার ওপর আমার কখনো তেমন ভরসা বা শ্রদ্ধা ছিল না। পাবলিক বললেই পি ডবলু ডি বা পাবলিক ইউরিন্যালের কথা মনে পড়ে যেতো—ইংরেজ আমলেও এ-দুটো খুব পরিষ্কার জায়গা ছিল না।"

"এসব কী বলছেন?" বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীকে আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছি। "পি ডবলু ডিতে অনেক ভাল লোক আছেন, ভাল কাজও হচ্ছে, কাগজে তার রিপোর্টও বেরোয়।"

"রাখো রাখো!" সস্নেহে ধমক লাগিয়েছিলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। নিজের ভারী শরীরটি নাড়িয়ে বিশ্বনাথ বলেছিলেন, "পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পাবলিক সার্ভেন্ট, পাবলিক উয়োম্যান—ভাল-ভাল মেটিরিয়াল এই পাবলিক কথাটার কুসংসর্গে দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। সেই মান্ধাতার আমল থেকে এইরকম হয়ে এসেছে। ইদানীং কিন্তু একটা পরিষ্কার কথা কানে আসছে। কতদিন যে কথাটা পরিষ্কার থাকবে তা অবশ্য জানি

না—জনগণ। আজকাল যখন খুব মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তখন যে-কথাটা বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় তা হলো—জনগণই শেষ কথা বলবেন।”

অ্যাভারেজ জনগণ থেকে ওজনে বেশ ভারী বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটু থেমে আমাকে বলেছিলেন, “তুমি আমার এই ঘটনাটা জনগণকে জানাতে পারো। আমি একটুও রাগ করবো না, বরং খুশি হবো।”

কিন্তু সুশীতল চট্টরাজের কথাও আমাকে ভাবতে হবে। হাজার হোক, একডাকে চেনা যায় এমন একটি নাম এই সুশীতল চট্টরাজ। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, বিবিধভারতী ইত্যাদির কল্যাণে সুশীতলের খ্যাতি এখন বেড়েই চলেছে। আর্টের লাইনে, ফ্যাশনের লাইনে, অপসংস্কৃতিবিহীন গ্রুপ থিয়েটারের লাইনে মস্ত এক উঠতি তারকা এই সুশীতল চট্টরাজ। কাগজের বিজ্ঞাপনে ওঁর নাম নজরে না পড়বার কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে বড় টাইপ বিজ্ঞাপনের মাথার ওপর ঘোষণা থাকে : ‘সুশীতল চট্টরাজের সৌজন্যে, সুশীতল চট্টরাজ পরিকল্পিত ও প্রযোজিত শিল্প প্রদর্শনী আজ আকাদেমিতে’। কিংবা, ‘সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত অমুক শিল্পগোষ্ঠীর নাট্য নিবেদন অমুক’।

সুশীতল চট্টরাজ নিজেই আমাকে বলেছিলেন, “ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান এরিয়ায় নাম করতে কারও বেশিক্ষণ সময় লাগে না। ঘটে একটু বুদ্ধি এবং মানিব্যাগে সামান্য কিছু টাকা প্রয়োজন, এই যা!”

চোখ বুজে সুশীতল বলেছিলেন, “এই যে আমার নাম হচ্ছে,

লোকে যে এখন আমাকে একডাকে চিনতে পারছে, এর পিছনে রয়েছে সিম্পল একটি পলিসি। আমার অফিস-ম্যানেজার সেবাব্রত রক্ষিতকে বলে দিয়েছি কোনো বিজ্ঞাপনে আমার নাম ৬০ পয়েন্ট টাইপের কমে থাকলে সে বিজ্ঞাপনের বিল পাশ করবে না।"

সুশীতল চট্টরাজ আরও মন্তব্য করলেন, "আমার ম্যানেজার সেবাব্রত রক্ষিত ছেলেটি খুবই ডাইনামিক। ও সেই সঙ্গে অর্ডার দিয়েছে, যেকোনো বিজ্ঞপ্তিতে সবার ওপরে সুশীতল চট্টরাজের নাম থাকবে—শম্ভু মিত্র, সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর, মৃণাল সেন যেই থাকুক সে নাম সুশীতলের নামের তলায় ছোট টাইপে ছাপা হবে। আমার একটু লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। কিন্তু সেবাব্রত রক্ষিত মনে করিয়ে দিলো, এ-দেশে চিরকালই তাই হয়েছে, স্যর। তাজমহল কে পরিকল্পনা করেছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু তাজমহলের খরচ যিনি বহন করেছিলেন সেই সাজাহানের কথা সবার মুখে মুখে। সিনেমার পোস্টারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়ের মাথার ওপরে চুন-সুরকির বিজনেসম্যানদের নাম বারবার ছাপা হয়েছে, কেউ আপত্তি করেনি, বরং খুশি মনে মেনে নিয়েছি।"

সুশীতল চট্টরাজ যা-কিছু বলেন তা জোরের সঙ্গে বলেন। ওঁর মুখোমুখি বসলে, ওঁর সব বক্তব্য বিনম্রচিত্তে মেনে নিতে ইচ্ছে করে। এইটাই সুশীতলের ব্যক্তিত্ব—এ-বিষয়ে কোনো দ্বিধার সম্ভাবনা নেই।

সুশীতল চট্টরাজের কথায় আমাকে যথাসময়ে আসতে হবে। সত্যিকথা বলতে কী, তিনি এবং বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এঁরা দু'জনেই

হলেন আমাদের প্রধান চরিত্র। এঁদের মধ্যে কে যে এক নম্বর এবং কে যে দু'নম্বর তা আপনাদেরই স্থির করতে হবে। আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলে সবকিছু গোলমাল করে ফেলি। কখনও মনে হয় এই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীরই গল্প। আবার কখনও মনে হয়, গল্পটা সুশীতল চট্টরাজেরই। নায়ক হিসেবে কারও নাম যদি ৬০ পয়েন্ট টাইপে ছাপাতে হয় তিনি অবশ্যই সুশীতল চট্টরাজ।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমার অতি প্রিয় গিনিদির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শ্বশুরবাড়ির নানা আত্মীয়তার শাখাপ্রশাখা পেরিয়ে গিনিদির দেওর হলেন এই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। সেই সুবাদেই কবে যেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল।

আমার এক বন্ধু বলে দিয়েছিলেন, অন্য কিছু জানা না থাকলে দুনিয়ার সমস্ত রায়চৌধুরীকে এক্স-জমিনদার বলে ধরে নেবে। রায়চৌধুরীরা কখনও হেঁজিপেঁজি লোক হয় না। যেমন ধরো দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়চৌধুরী।

"সত্যজিৎ রায় আবার রায়চৌধুরী হলেন কবে?"

আমি ভুল খবরের ক্যাচ লুফে নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু বন্ধু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "এসব রিসার্চ চালিয়ে বের করতে হয়! রায়চৌধুরী ছাড়া অমন খাসা প্রতিভা কী করে হবে?"

অবিশ্বাসে আমার মুখ কুপিত হচ্ছে দেখে বন্ধু বললেন, "যাঁর ঠাকুরদার নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তিনি সত্যজিৎ রায়চৌধুরী না হয়ে যান না।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বয়স আমার থেকে দু'এক বছর বেশি। চেহারাটি জমিদারসুলভ—যেমন ভারি, তেমন দীর্ঘ। চার-পাঁচ

পুরুষ শিকারি না-হলে অমন গোঁফ, অমন চোখের তীক্ষ্ণতা এবং হাতের অমন বাইসেপ হয় না। বিশ্বনাথ চৌধুরী নিজে পালোয়ান নন, কিন্তু পারিবারিক পালোয়ানীর অদৃশ্য ছায়া রয়েছে তাঁর চলনে, বলনে এবং প্রকৃতিতে। আর শিকারের সঙ্গে ওঁর কী ধরনের সম্পর্ক তা আমার জানা না-থাকলেও, চেহারা দেখলেই মনে হয় একটা সদ্য শিকার হওয়া বাঘকে পায়ের গোড়ায় রেখে বন্দুক হাতে ছবি তোলাবার দেহ অবশ্যই বিশ্বনাথ চৌধুরীর আছে।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর কোনো পেশা নেই। যদিও বাড়ির সামনে নেমপ্লেটে লেখা আছে : বি এন রায়চৌধুরী বি এ বি এল। বাড়ির নাম ডোমজুড় হাউস। নিশ্চয় কোনো এক সময় ডোমজুড়ে ওঁদের জমিদারী ছিল। পেশায় ঢোকবার মতো বিদ্যে তাঁর আছে এই প্রমাণের জন্যেই বিশ্বনাথ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ডিগ্রি জোগাড় করেছিলেন, কিন্তু নাক বেঁকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আমি কি বেশ্যা যে আমার পেশা থাকবে?"

ডোমজুড় হাউস আজ কিছুটা বিবর্ণ এবং হতশ্রী। অনেকদিন এই সুন্দর বাসগৃহ কোনো যত্ন পায়নি। বাংলার জমিদারী সভ্যতা এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ছাপ এই গৃহের সর্বাঙ্গে। কিন্তু বাড়িটা কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে—আশেপাশে বেশ কয়েকটা পায়রা-খোপের মতন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। নতুন এই সব ব্যারাকের জঙ্গলে একখানা মাত্র প্রকৃত বাড়ি অবশিষ্ট আছে, তার নাম ডোমজুড় হাউস।

বাড়িটার চারধারে আরও কয়েকটা ছোট-ছোট আউট-হাউস আছে। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও তেমন আশাপ্রদ নয়। কিন্তু

কলকাতায় বাড়িঘরদোরের অত্যধিক অভাবে এই সব বাড়িও কৌলীন্য অর্জন করেছে এবং শোনা যায় সেখানকার মাসিক ভাড়া থেকেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীকে অনেকেই নানা অর্থনৈতিক উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, গেটের কাছে অত জায়গা রয়েছে, দোকান করো। কেউ বলেছেন, বাড়ির নিচে ছোট কারখানা বসাও। কেউ বলেছে, পেট্রোলপাম্পের আবেদন করো, অনেক খোলা জায়গা রয়েছে। বিশ্বনাথ চৌধুরী করজোড়ে উত্তর দিয়েছেন, "আমি মুদিও নই, কুলিকাবারীও নই, যে পাম্প বসিয়ে তেলের ব্যবসা করবো। আমরা হচ্ছি খানদানি জমিদার, ল্যান্ডলর্ড হিসেবেই আমার এই চ্যাপ্টার শেষ হবে।"

অবশ্য বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সংসারে কোনো অভাব নেই। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী এবং বিধবা মা আছেন। একখানা লাল রঙের ইটালিয়ান ফিয়াট গাড়ি আছে। এই গাড়িখানার খুব যত্ন করেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ইদানীং একটা মোটর সাইকেলও কিনেছেন বিশ্বনাথ। বন্ধুরা স্কুটার কেনবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ বলেছিলেন, "ওর থেকে পায়ে হাঁটা ঢের ভাল, ঠিক যেন ইঁদুরের ওপর চড়েছি মনে হয়।" এই মোটর সাইকেলের পৌরুষ আছে, গর্জন আছে—বিশ্বনাথের বাহন বৃষ বলেই মনে হয়!

বিশ্বনাথ অভিজাত ক্লাবের মেম্বার। এই সব ক্লাবের নতুন সদস্য উঠতি ধনীদের সম্বন্ধে বিশ্বনাথের অবশ্যই একটু তাচ্ছিল্য আছে। সবিনয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, "চারপুরুষ ধরে তাঁরা এই ক্লাবের

মেম্বার। আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার যখন এই হল্-এ বসে ফ্রেঞ্চ কনিয়াকের অর্ডার দিচ্ছেন তখন ওই লোকটার ঠাকুর্দা জয়পুর থেকে সদ্য এসে বড়বাজারে কানাগলিতে নর্দমার সামনে উঁচু হয়ে বসে লোটা মাজছে।"

বিশ্বনাথ কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র মানুষ। অপমানিত না হলে কখনও ফোঁস করে ওঠেন না। মুখে সর্বদা অমায়িক হাসিটি লেগেই আছে। এই যে জমিদারী প্রথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে উঠে গেলো, এই যে শতাব্দীর রাজকীয় মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কলকাতা নগরী হঠাৎ বৈশ্যযুগের রক্ষিতা হয়ে উঠলো তার জন্য কোনো অভিযোগ নেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর। যখন যে ঋতু আসবে তা মেনে নেবার মতো মনোবল আভিজাত্য তাঁর রক্তে রয়েছে।

এই বিশ্বনাথের বাড়িতে অনেক পুরনো বাংলা বই ও সাময়িক পত্র ছিল। বিশ্বনাথ আমাকে সেসব দেখবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এমনও বলেছিলেন, "তোমার যা যা প্রয়োজন তা উপহার হিসেবে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারো। তোমার কাছে থাকলে ওসব বই ভাল থাকবে। আমাদের বংশে সরস্বতী বেচা নিষেধ।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী দু'একবার আমাকে তাঁর ক্লাবে নিয়ে গিয়েছেন। অভিজাত এই ক্লাব কলকাতার সাকসেসফুল নাগরিকদের মিলনতীর্থ। এখানে সভ্য হওয়ার জন্যে কত ধনপতি সদাগর বছরের পর বছর অধীর আগ্রহে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে আছেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমাকে বলেছিলেন, "রায়চৌধুরী বংশের জমিদারী বলতে এইটুকু স্পেশাল অধিকার টিকে আছে! নাতি,

তস্য নাতি এই ক্লাবে প্রায় অটোমেটিক মেম্বার হয়ে যাবে—কারণ লালুদের সঙ্গে ঝগড়া করে স্যর নগেন মিত্তির যখন এই ক্লাব স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আমার দাদু অভয়প্রসন্ন রায়চৌধুরীই স্যর নগেনকে জমি দিয়েছিলেন নিরানব্বুই বছরের লিজে। চুয়াল্লিশ বছর হয়েছে, আরও পঞ্চান্ন বছর পরে এই জমি আবার বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর কাছে ফিরে আসবে, অবশ্য তখন যদি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এবং ক্যালকাটা সিটি বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে!"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ওখানে ফরাসি কনিয়াক অর্ডার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বংশের নির্দেশ : হুইস্কি নামক ফায়ার ওয়াটার স্পর্শ করবে না। তাই কনিযাকের ওপরেই লাইফটা চালিয়ে দিলাম। তবে একেবারে রেশন মাপা। ওই যে আবদার সেলিম আলিকে দেখছো, ওকেই বাবা বলে গিয়েছিলেন. খোকাবাবুকে কখনও দুটোর বেশি পেগ সার্ভ করবে না। সেই নির্দেশ এখনও মানা হচ্ছে। শুধু বাবা পেগের সাইজ বলে যাননি সেলিমকে ; সেই সুযোগে বড়া পেগ অর্ডার দিলেও ও কিছু বলতে পারে না।"

আমার জন্যে একটা মিকস্‌ড জুস ককটেল অর্ডার দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "এমন সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক কোথাও পাবে না—স্বয়ং লেডি কারমাইকেল আমার দিদিমার জন্যে এই রেসিপি বানিয়েছিলেন। সেই রেসিপি আমার দাদুর কাছে শিখেছিল ওই সেলিমের দাদু! তারপর বুঝতেই পারছো—সেই ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে! খেয়ে নাও, কারণ বেশিদিন এসব ফরমুলা বেঁচে থাকবে না। সেলিমের ছেলেটা গেস্টকিনে লোহা কাটতে ঢুকেছে,

আর সেলিমের নিজের পেটে রয়েছে ডায়োডেনাল আলসার।"

"চিয়ার্স," এই বলে ফরাসি কনিয়াকের গেলাশ মৃদু চুম্বন করেছিলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "অনেকে ভাবে মাল খেয়েই আমি এই হেভী শরীর করেছি। একদম বাজে কথা—এই শরীর বংশের ফিকস্‌ড্ অ্যাসেট। ঐরাবত কখনও ইঁদুরের জনক হয়? সায়েব পেন্টারের আঁকা আমার বাবার অয়েল পেন্টিংখানা তোমাকে দেখাবো।"

একটু হেসে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বলেছিলেন, "লোকে যতই আমাকে বেকার আখ্যা দিক, আসলে আমিও সেলস্ লাইনে আছি। তোমার একটা গল্পের ওই লাইনটা খুব ভাল লেগেছিল—পৈতৃক সম্পত্তি এক-একখানা বেচছি আর খাচ্ছি! সুপার সেলসম্যান ছাড়া আমি কি? বলো? বিখ্যাত টায়ার কোম্পানির ইংরেজ বড়সায়েব একবার বছরের শেষাশেষি সমস্ত ব্রাঞ্চ অফিসে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, যতটা সম্ভাব বেচার চেষ্টা করুন। তারপর দেখা গেলো, একজন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জানাচ্ছেন, গুদোম সাফ—নিজেদের আন্ডারওয়ার এবং গেঞ্জি ছাড়া আমার ছেলেরা সব বেচে ফেলেছে!"

কনিয়াকের গেলাশে আর একটা চুমু খেয়ে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বলেছিলেন, "ওই রকম সেলস্ করেছিলেন আমাব মামাতো ভাই। বরিশাল থেকে বিতাড়িত হয়ে রিফিউজী খাতার নাম লিখিয়ে এখন বাঘা যতীন কলোনিতে থাকেন। ভাইপোটা সর্বহারার মহান নেতা হবার আশায় পার্টিতে যোগ দিয়েছে। দিক! কি বলো?

কনিয়াকের জন্যে প্রাণ না কাঁদলেই হলো!"

এই ক্লাবেই একদিন সুশীতল চট্টরাজের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী সবে প্রথম পাত্র শেষ করে কনিয়াকের দ্বিতীয় পাত্রের দিকে নজর দিয়েছেন এমন সময় বললেন, "ঐ যে সুশীতল আসছে। ডোমজুড়ের ওধারের লোক। রাইজিং বিজনেসম্যান বলতে পারো। সুশীতলের খুব শখ হয়েছিল এই ক্লাবের মেম্বার হবে। তা টাকা থাকলেই তো এখানে নাক গলানো যায় না, তা হলে তো বড়বাজারের প্রত্যেক গদির শেঠজীর তো এখানে মেম্বারশিপ পাওয়া উচিত। এখানে মেম্বার হতে হলে চাই সামথিং এলস্, অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদা, যা ওই সুশীতল চট্টরাজেরও অভাব ছিল। সুশীতলের খুব মুখ মিষ্টি। আমাকে ওই ডোমজুড়ের সুবাদে এসে ধরে পড়লো, লতায় পাতায় কী একটা অতিদূর সম্পর্কও দেখিয়ে দিলো। বললো. আমি আপনার ছোট ভায়ের মতো। আমি বলে ফেললুম, এটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যুগ, বেশি ভাইটাই না-হওয়াই ভাল। কিন্তু সুশীতল কিছুতেই শুনলো না।"

কনিয়াকের গেলাশে আর একটা সুখচুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "নামে সুশীতল, কাজেও সুশীতল—কিছুতেই চটে না। আর কম স্পিডে লাইফের পাখা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমাদের রেগুলেটার সব সময় তেতে আগুন হয়ে আছে। তা যা বলছিলাম, সুশীতল ধরে পড়লো, কুঁজোরও চিত হয়ে শোবার শখ হয় মাঝে-মাঝে! দাদা, আমাকে ক্লাবে ঢুকিয়ে দিন। তা অনেক কষ্টে মেম্বার

করিয়ে দিলাম।"

সুশীতল চট্টরাজ এবার আমাদের সামনাসামনি এসে পড়লেন। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীকে দেখে তিনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "এক পেগ স্কচ হয়ে যাক।"

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে জানালেন, "হুইস্কি খাওয়া গুরুদেব এবং পিতৃদেব দু'জনেরই নিষেধ। ওটা মদ নয়, ওর নাম আগুনের জল!"

সুশীতলের সঙ্গে আমারও আলাপ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, "আমাকে দাদার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বলতে পারেন। ওঁদের বাড়িতে আমার নিয়মিত যাতায়াত—বউদি, কাকিমা সবাই আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন।"

বিশ্বনাথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুশীতল বললেন, "অনেকদিন ডোমজুড় হাউসে যাওয়া হয়নি। বউদি কেমন আছেন?"

বিশ্বনাথ হেসে উত্তর দিলেন। "বউদি এখন নিজের দাদা, বউদি এবং ভাইঝিকে নিয়ে হইহই করছে। ওরা আমাদের ওখানে এসেছে ক'দিনের জন্যে। তারপর দাদা বউদি চলে যাবে ট্রান্সফার হয়ে পুনায়। মেয়েটার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা ক'মাস পরেই—আমাদের কাছেই থেকে যাবে। একদিন সময় করে এসো, সুশীতল।

সুশীতল চট্টরাজ এবার কিছুটা দূরে সরে গেলেন। কনিয়াকের গেলাশে চুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "ছেলেটি উদ্যমী আছে। বাপের ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকান ছিল। সেটা অনেক বাড়িয়ে এখন কীসব কোম্পানির ডিসট্রিবিউশন নিয়ে ক্লথকিং না হোক

ক্লথ উজীর হয়েছে। ডোমজুড়ে একটা সরষের তেলের কল খুলেছে—আমারই জমিতে। একটা ফার্টিলাইজার এজেন্সিও নিয়েছে—ওতে নাকি আজকাল টু'পাইস হচ্ছে। ওই এজেন্সি নেবার সময় সুশীতলের অত রমরমা ছিল না। গ্যারান্টি পেপারে এমন একজনের সই দরকার যার কলকাতায় বড় বাড়িঘরদোর আছে। সুশীতল এসে কেঁদে পড়লো। আমার গিন্নিও বললেন, লোকটা নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে—আমাদের সাহায্য করা উচিত। এসব অবশ্য অনেক বছর আগের কথা, তখন সুশীতল এই ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি।"

সুশীতল চট্টরাজকে বয়সের তুলনায় কমবয়সী দেখায়। বেশ ফর্সা, ছোট্টখাট্টো, টাইট মানুষটি। চোয়ালটা একটু ভারী— শুনেছি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকেরা অমন চোয়ালের মালিক হন।

সুশীতলের চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। কাচগুলো ম্যাজিকের মতো, আলোর উজ্জ্বলতা অনুযায়ী মিনিটে-মিনিটে রঙ পাল্টায়। সুশীতল চট্টরাজ আজ পরেছেন গোলাপফুলের ছাপ মারা বুশশার্ট এবং দুধসাদা লেটেস্ট ফ্যাশনের টেরিলিন ট্রাউজার। তবে সুশীতলের যা শরীর তাতে ধুতি-পাঞ্জাবিও ভাল মানাতো।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন দেখলে সুশীতল চট্টরাজকে?"

"বেশ 'পলিশ্‌ড়্' লোক।" আমি নির্দ্বিধায় আমার মতামত জানিয়ে দিই।

"আগে এতো পালিশ-টালিশ ছিল না। স্রেফ কাপড়ের গুদোম এবং তেলকল নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। ইদানীং দেখছি ওর চকচকে

ভাবটা বাড়ছে।"

"চকচকে হওয়াটা খারাপ নয়," আমি মন্তব্য করি। "বিশেষ করে হাই সোসাইটিতে মিশবার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছেন।"

বিশ্বনাথ আমার কথায় আমল দেননি। "আমাদের সাতপুরুষ তো স্রেফ ওইসব নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন—ওই সাবজেক্ট তাই আর আমার ভাল লাগে না," কনিয়াকের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিয়ে বলেছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। ওঁর হাতের সিগার জ্বলে উঠেছে। অমন ভারী চেহারায় রোগা টিকটিকে সিগারেট স্টিক মানায় না—মোটা সিগার এবং বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী যেন মেড ফর ইচ আদার।"

সুশীতল চট্টরাজের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছে। সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত কোনো এক বিখ্যাত সংস্থার প্রথম অভিনয় রজনীতে তিনি আমাকে বিশেষ নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রসদনে নাটকের শেষে সুশীতল চট্টরাজ আমাকে ক্লাবে টেনে নিয়ে গেলেন।

বড় একটা হুইসকি অর্ডার দিয়েছেন নিজের জন্য। আমি এখনও মদ ধরিনি শুনে খুবই হতাশ হয়েছেন সুশীতল চট্টরাজ। "ড্রিংকসের সঙ্গে যোগ না-থাকলে রাইটার হওয়া যায় না, শংকরবাবু", সুশীতল আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। "মাতাল হবেন না, কিন্তু মদ খাবেন না কেন?" কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন সুশীতল।

সুশীতল আরও বলেছেন, "প্রথম জীবনে আমিও বোকামি করেছি। স্রেফ কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছি—তারপর বুঝলাম স্রেফ

কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার মতো বোকামি পৃথিবীতে নেই। কাজকর্মের সঙ্গে ফুর্তিটুর্তি একটু না মিশলে লাইফের কোনো মানে হয় না।”

লক্ষ্য করলাম, সুশীতল চট্টরাজ নিজের কথা বলে যেতেই ভালবাসেন। অন্য কাউকে তিনি মুখ খুলবার তেমন সুযোগ দেন না। আরও দেখলাম, সেলফ-মেড ম্যান হিসেবে নিজের পর অত্যধিক বিশ্বাস তাঁর। সুশীতল চট্টরাজ সমাধান করতে পারেন না এমন সমস্যা যেন সংসারে নেই।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, প্রত্যেকটি সমস্যা এক একটা বন্ধ তালার মতো—প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা চাবি আছে। কিন্তু সুশীতল চট্টরাজ তৃতীয় পেগ হুইস্কির শেষে বললেন, “একদম বাজে কথা। তাহলে তো মশাই, এক বস্তা চাবি নিয়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হতো। দুনিয়ার সমস্ত তালা খোলবার জন্যে একটা মাস্টার ‘কী’ আছে এই সুশীতল চট্টরাজের!”

“ভাবছেন সেটা কী?” বেশ স্টাইলের সঙ্গে নিজেই প্রশ্ন তুললেন সুশীতল চট্টরাজ। “ক্যাশ, মশাই ক্যাশ! নাসিক ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা সরকারি নোট ঢোকে না এমন কোনো তালার ফুটো ভগবান এখনও সৃষ্টি করেননি!”

সুশীতল নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন। এইসব লোক অনেক সময় অতীতকে ভুলবার জন্যে নানা রকম উল্টোসিধে কথা বলে থাকেন। সেসব ধৈর্য ধরে শুনে যাওয়াই ভাল।

সুশীতল চতুর্থ পেগের স্বাদ নিতে-নিতে বললেন ; “ওই যে আপনাদের...অমুক মিত্তির—অত বড় বিপ্লবী থিয়েটার নট—যার

পার্ট শুনে কত ছেলে বিপ্লবী হয়ে গেলো, তিনিও মশাই মাত্র থার্টি থাউজেন্ড রুপিজ ক্যাশের জন্যে এই অধমের কথায় উঠছেন, বসছেন!"

সুশীতলের ঠোঁটে চাপা হাসির ঝিলিক। "...অমুক ঘোষ আপনাদের। ব্ল্যাক হোল, ব্ল্যাক মার্কেটে, ব্ল্যাক মানির বিরুদ্ধে সারা জীবন স্টেজে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছেন—কিন্তু এই অধমের কাছে কাতর আবেদন, ভাউচার সই না-করিয়ে অর্ধেক পয়সা দিন!"

"দিচ্ছেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"অবশ্যই দিচ্ছি—না-হলে বনের বাঘ পোষ মানবে কেন? এই যে সার্কাসের বাঘ নিয়ে দিনের পর দিন খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি সে তো ওই ক্যাশ মাইনাস ভাউচারের জোরে!" মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন সুশীতল চট্টরাজ।

"কী বুঝছেন?" অভিজ্ঞ একজামিনারের মতো এবার প্রশ্ন করলেন সুশীতল চট্টরাজ।

"সত্যিকথা বলতে কী সমাজের সব রহস্য বোঝবার মতো ব্রেন আমার নেই, মিস্টার চট্টরাজ।"

আমার অসহায় স্বীকারোক্তি বোধ হয় সুশীতলের মনে একটু করুণার উদ্রেক করলো। মৃদু হেসে তিনি উপদেশ দিলেন, "সে বললে তো চলবে না। গল্প লেখার লাইনে যখন এসেছেন তখন সমাজের রহস্যলহরী তো আপনাকে বুঝতেই হবে!"

"উত্তরটা আমার হয়ে আপনিই বলে দিন", সুশীতল চট্টরাজকে আমি অনুরোধ জানাই।

সুশীতল চট্টরাজ মিটমিট করে হেসে বললেন, "কমরেড মাও

বলেছিলেন, বন্দুকের নলই হলো শক্তির উৎস। আমি একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই, মানিব্যাগই হলো সমস্ত শক্তির উৎস!"

দার্শনিক তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ না করে আমি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করি। "আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

সুশীতল সেবার যে রকম শ্রদ্ধাবনত ছিলেন এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেলো না। বললেন, "গিয়েছিলাম, ওঁদের তো আবার স্পেশাল রয়াল টেম্পার! গেলে দেখা হবে, কিন্তু উনি নিজে কখনও আমার বাড়িতে আসবেন না।"

"আছেন কেমন?" আমি জানতে চাই।

সুশীতল বললেন, "চমৎকার আছেন। প্রাত্যহিক দু'পেগের প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বউদিও খুব ব্যস্ত। ভাইঝি বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বিশ্বনাথবাবুও বউদির হুকুম মতো চলেছেন। এ-রকম দায়িত্ব তো কখনও পাননি। বিষ্ণুপ্রিয়ার মা-বাবা পুনায় চলে গিয়েছেন, লোকাল গার্জেন বলতে এখন ওঁরাই।"

এর পরেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একদিন আমার বাড়িতে হাজির হয়েছেন। চেয়ারে বসেই বিশ্বনাথ বললেন, "একটা উপকার করতে হবে ভায়া। ঝপ করে দু'পাতার মধ্যে শরৎকালের ওপর একখানা রচনা লিখে ফেলো তো। আমি ততক্ষণে একটা চুরুট শেষ করে ফেলি।"

"কী ব্যাপার, মিস্টার রায়চৌধুরী?" আমি অবাক হয়ে যাই।

"আর বোলো না। বুড়োবয়সে খুব বিপদে পড়া গিয়েছে। আমার শালার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া—সামনেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। মেয়েটা অর্ডার দিয়ে গেলো, 'পিসেমসাই আমি কলেজে যাচ্ছি, ফিরে এসে যেন রচনাটা পাই।' বোঝো আমার অবস্থাটা! ওর বাপি নাকি ওই রকম হুকুম মতো রচনা লিখে দিতো। কিন্তু আমার যে একেবারে অন্য কেস। গল্পের বইটই দু'একখানা পড়ি, কিন্তু বাংলায় কলম ধরা! দেড় ঘণ্টা বৃথা চেষ্টা করে যখন ঘেমে নেয়ে উঠছি, তখন খেয়াল হলো, হাতের গোড়ায় তুমি থাকতে আমার চিন্তা কি? বিষ্ণুপ্রিয়াকে আজ একেবারে চমকে দেওয়া যাবে।"

এরকম অনুরোধ আজকাল বড় একটা আসে না। তাছাড়া ইস্কুল কলেজের মাস্টারমশায়দের পছন্দমতো 'এসে' লেখা গল্প-উপন্যাস লেখার থেকে অনেক শক্ত কাজ। কিন্তু বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী অনেকবার আমাকে আদরযত্ন করেছেন, তাঁকে না বলা যায় না।

আমি এই বুড়ো বয়সে শরৎকালের ওপর প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছি, আর বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একমনে সিগার টেনে চলেছেন।

এক ফাঁকে বিশ্বনাথ বললেন, "ভাগ্যে বেশ কিছুদিন আগে জন্মেছিলাম। এখন জন্মালে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কোনো পরীক্ষায় আমি পাশ করতে পারতাম না। তোমার এখান থেকে বেরিয়ে একবার সাউথ ক্যালকাটায় পোয়েট পি লালের কাছে ছুটতে হবে। একখানা ইংরিজী রচনার অর্ডারও আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। আমার শালার চুল ক্রমশই কেন উঠে যাচ্ছিল তা এবার আমি বুঝতে পারছি!"

কথাবার্তায় বুঝতে পারছি, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী তাঁর শালার মেয়েটির স্নেহডোরে বাঁধা পড়েছেন। বললেন, "অল রাউন্ডার মেয়ে বলতে যা বোঝায়! দেখতে শুনতে মা লক্ষ্মীর মতন। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে, চণ্ডালিকায় নেচেছে, সেকেন্ডারি পরীক্ষায় দুটো লেটার। ছবি যা আঁকে তোমায় কী বলবো! আমার একখানা স্কেচ করেছে—দেখে তো আমি তাজ্জব। আমি এখন বলছি, এসব তো তোর বাপের সুপারভিশনে হয়েছে। এখন তুই হায়ার সেকেন্ডারিতে অন্তত তিনটে লেটার না পেলে পিসেমশায়ের মুখ থাকে না।"

আমি শরৎকাল সম্পর্কে মাস্টারপাঠ্য রচনা লিখে চলছি, আর বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বলে চলেছেন, "মায়ের আমার হাতের লেখা মুক্তোর মতো। রূপেগুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী! স্বভাবটিও বড় মিষ্টি। এখনও খুব কচি আছে। আগে এতোটা বুঝিনি, এখন নিজেদের খুব কাছে পেয়ে সব ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি।"

বুঝছি, বেশি বয়সে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী মায়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "ওর বাপমায়ের সঙ্গে আমাদের কর্তাগিন্নীর কম্পিটিশন লেগে গিয়েছে। ভগবানের দয়ায় হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ভাল করলে আমরাই জিতবো। গিন্নী এবং আমি তো তাই উঠেপড়ে লেগেছি!"

আমার লেখাটা নিয়ে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "খুব উপকার করলে ভায়া। শালার মেয়ের কাছে মুখ রাখার জন্যে লেখাটা নিজের নামেই চালাতে হবে—কিছু মনে কোরো না। প্রফেসর পি লালকেও ওই কন্ডিশন দিতে হবে। তারপর ওঁর

লেখাটা নিয়ে আমি ক্লাবে চলে যাবো। ওখানে নিরিবিলিতে বসে বাংলা ও ইংরিজি রচনা দুটো আমি নিজের হাতে টুকে ফেলবো ; তারপর সোজা বাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠিক চারটের সময় ফিরে আসবে আজ।”

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর লাল ফিয়াট রেসিং গাড়ির স্টাইলে প্রচণ্ড গর্জন করে অন্য অনেক পথচারীকে ডোন্টকেয়ার করে প্রফেসর পি লালের সন্ধানে বেরিয়ে গেলো। বুঝলাম বুড়ো বয়সে ভরত রাজা হরিণ শিশুর প্রেমে পড়েছে।

কয়েকদিন পরে হরিণ শিশুটিকেও দেখেছি আমি। লাল ফিয়াট ড্রাইভ করে চলেছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, আর পাশে বসে আছে একটি ফুটফুট নবযৌবনা। মেয়েটির মুখটি বেশ সরল—কোথাও মলিনতার ছোঁয়া নেই। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী হাত তুলে ইঙ্গিত বললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি কলেজে পৌঁছতে যাচ্ছেন। বুঝলাম, বিনামাইনের বেশ ভাল চাকরি পেয়েছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিষ্ণুপ্রিয়া যতক্ষণ না পুনায় বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে ততক্ষণ বিশ্বনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রীর একদিনও ছুটি নেই।

এই ভাবেই গল্প শেষ হলে আমার পক্ষে ভাল হতো। দেখানো যেতো, রুদ্র মেজাজের বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটি কিশোরীর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে পরিণত বয়সে কেমন সম্পূর্ণ কোমল হয়ে গেলেন। সেরকম নানা পয়েন্টও ছিল। যেমন একদিন ক্লাবে ওঁর সঙ্গে দেখা হলো। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী একটা বড় সাইজের লেম্বু-

সোডা পান করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। একটু দূরেই হুইস্কি নিয়ে বসেছিলেন সুশীতল চট্টরাজ। তিনি ফিক করে হেসে জানতে চাইলেন, "কিছু বুঝলেন?"

মৃদু হেসে সুশীতলই বললেন, "দুর্লভ দৃশ্য। বাঘে ঘাস খাচ্ছে। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর হাতে কানিয়াকের বদলে লেম্বুপানি। উপায় নেই। বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে কর্তা গিন্নী এখন আদর্শ স্থাপন করছেন! মিসেস রায়চৌধুরীর বাপের বাড়ি শিক্ষিত আদর্শবাদী পরিবার—কেউ প্রফেসর, কেউ প্রিন্সিপ্যাল, হার্ড ড্রিংকস্ ও-বাড়িতে এখনও জাতে ওঠেনি।"

বুঝলাম, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী সম্পর্কে অনেক খবরাখবর সুশীতল চট্টরাজের মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

সুশীতল হেসে বললেন, "ও-বাড়িতে আমার অবাধ গতিবিধি। অলমোস্ট এ মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি বলতে পারেন। কিন্তু ডোমজুড় হাউসের লাগোয়া জমিটা আমাকে ক'বছরের জন্যে দিতে বলছি, রাজি হচ্ছেন না। বললুম বিশ্বনাথবাবুকে, পার্টনারশিপে আসুন, কিছু একটা করা যাক— তাতেও উৎসাহ দেখালেন না।"

এরপর ঠোঁট বেঁকালেন সুশীতল চট্টরাজ। "না দিক—কিসস্ আমার এসে যায় না। ভগবানের দয়ায় ইনকাম আমার বেড়েই চলেছে। সিনেমা থিয়েটার কলমে প্রত্যেকদিন আমার নাম দেখেছেন তো!"

না দেখে উপায় আছে? বড় বড় আর্টিস্ট, বড় বড় লেখক, বাঘা বাঘা ডিরেকটরের মাথার ওপর বিরাট বিরাট টাইপে লেখা থাকছে

'সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত।'

বেশ খুশি হয়ে সুশীতল বললেন, "এ লাইনে টাকা যথেষ্ট—বাড়তি লাভ এই নামটা। তেল চিনি নুন সিমেন্ট স্টিল এটসেটরায় পয়সা হয় কিন্তু নাম হয় না, বরং বদনাম। আর্ট কালচারের লাইনে মস্ত লাভ এই সুনামটুকু। তাছাড়া..."

সুশীতলের উত্তরের শেষ অংশটা শুনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। "কী হলো, থামলেন কেন?"

"দু'চারজন সুন্দর সুন্দর লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, বুঝতেই পারছেন। এদেশের কত ছেলেমেয়ে যে আর্টিস্ট হবার জন্যে ছটফট করছে আপনাকে কী বলবো?"

সুশীতল চট্টরাজ এরপর অর্থের অনন্ত শক্তি সম্পর্কে আর একখানা বক্তৃতা দেবার জন্যে প্রস্তুত হাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছি। যাদের টাকা আছে তাদের মুখে টাকার মাহাত্ম্য সম্পর্কে বাণী আমার ভাল লাগে না। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিজেও একবার বলেছিলেন, "নতুন বড়লোক এবং বনেদী ভদ্রলোকের মধ্যে ওইখানেই তফাত। নতুন হাঁড়িতে রাখলে টাকা সবসময় গোখরো সাপের মতো ফোঁস ছাড়ে এবং বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করে।"

কয়েক সপ্তাহ পরেই নাটকটা যে এমনভাবে জমে উঠবে তা কল্পনাও করিনি। বাড়িতে বসেই হঠাৎ বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর স্বহস্তলিখিত নিমন্ত্রণপত্র পেলাম। "রবিবার দুপুরে অতি সামান্য কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে ডোমজুড় হাউসে মধ্যাহ্নভোজে

ডাকছি। বিশেষ আকর্ষণ, মধ্যাহ্নভোজের পরবর্তী ছোট্ট অনুষ্ঠান। তোমাকে আসতেই হবে, আশ্বাস দিচ্ছি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত এই অনুষ্ঠান তোমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

দু'দিন পরেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন। "আসছো তো ব্রাদার? হাতে গোনা সামান্য কয়েকজন গেস্ট, একজন না এলেই চেয়ার খালি থাকবে।"

"আপনি ডেকেছেন, গিনিদির আদরের দেওর আপনি, আসতেই হবে।"

গিনিদিও আসছেন কিনা জানতে চাইলাম। শুনলাম, গিনিদির ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে, তাই নেমন্তন্ন করতে গিয়েও নেমন্তন্ন করেননি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "ফিজিক্যাল ফিটনেস না-থাকলে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত পোস্টলাঞ্চ অনুষ্ঠানটা ভাল না লাগতে পারে, তাই গিনি বউদিকে বাদ দিলাম।"

"কী ব্যাপার, মিস্টার রায়চৌধুরী? সুশীতল চট্টরাজের হাওয়া আপনার গায়েও লাগলো নাকি? 'বিশ্বনাথ চৌধুরী নিবেদিত' কথাগুলো আপনি যেভাবে পুনরাবৃত্তি করছেন।"

"থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভাই। খুব ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। সুশীতল চট্টরাজকেও চিঠি পাঠিয়েছি বাই হ্যান্ড ডেলিভারি। নিশ্চয় সে পেয়েছে। কিন্তু ওর ফোনটা খারাপ। তোমাকে একটা উপকার করতেই হবে। সুশীতলের বাড়িতে চলে যাও, লক্ষ্মীসোনা ভাই। ওকে বোলো, সুশীতল না-এলে পুরো অনুষ্ঠানটাই নষ্ট হবে যাবে। সুশীতল আসছে কিনা খবরটা ফিরে এসে জানিও আমাকে। সুশীতলকে বোলও, মনে রাখবার মতো

লানচ পার্টি হবে এটা। সত্যিকথা বলতে কি, ওয়ান অফ মাই লাস্ট পার্টিজ।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছুটেছি পূর্ণদাস রোডে সুশীতল চট্টরাজের নিজস্ব বাটিতে। তেতলা বাড়িটা বছরখানেক হলো কিনছেন সুশীতল চট্টরাজ। তার পর থেকেই নানারকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন চলেছে। এর জন্যে অজস্র টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সুশীতল চট্টরাজ এখন টাকার তোয়াক্কা করেন না। "আগে 'কমফর্ট' তারপর তো টাকা, কী বলেন?" সুশীতল তাঁর একতরফা বাণী শুনিয়েছেন আমাকে।

ভক্তবৃন্দপরিবৃত অবস্থায় সুশীতল চট্টরাজ তাঁর এয়ার কন্ডিশন স্টাডিতে বসেছিলেন। সেই ঘরে বিখ্যাত এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সুশীতলের ছবি টাঙানো রয়েছে। এই অভিনেত্রীর পারিবারিক নাম ধরে সুশীতল বললেন, "মিসেস...অমুক নিজেই সই করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছবিটা পাঠিয়েছেন। ভীষণ সেনসিটিভ আর্টিস্ট, যদি খবর পান ছবিটা আমি ডিসপ্লে করিনি তাহলে খুব কষ্ট পাবেন। তাই এই স্টাডিতে টাঙিয়েছি। আর ওই ছবিটা তো দেখছেন, চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনারত এই অধম—গভর্নমেন্টের ফটোগ্রাফার অবনী বিশ্বাস পার্সোনাল উপহার পাঠিয়েছে।"

ভক্তদের একজন জানালেন, "সামনের মাসে আর একখানা ছবির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনারত সুশীতল চট্টরাজ। ওই ছবিটা কিন্তু কালারে তোলা হবে সুশীতলদা।"

"জনগণ যা চাইবে তাই হবে," চোখ দুটো অর্ধেক বুজে স্পেশাল স্টাইলে বললেন সুশীতল চট্টরাজ। "আর্টের লাইনে জনগণই তো শেষ কথা বলবেন। এই যে আমি টেক্সটাইল বিজনেস থেকে সময় করে আর্টের লাইনে আসছি, তার কারণ, নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের সুযোগ করে দিতে হবে। টাকার আমার অভাব ছিল না, এটাকে বলা চলতে পারে একটা সামাজিক দায়িত্ব। সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি অফ বিজনেস কথাটা সি-এম, পি-এম, ডি-এম, এ-ডি-এম সবাই আজকাল বলছেন। এ-ডি-এম মানে আমাদের ডোমজুড়ের অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট। ওখানে অনেক প্রপার্টি এবং বিজনেস কনসার্ন রয়েছে আমার, সুতরাং জুনিয়র অফিসারকেও অবজ্ঞা করবার এক্তিয়ার নেই।"

সুশীতল চট্টরাজ আমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবার জন্যে ভক্তবৃন্দকে ঘর থেকে বিদায় করলেন। দু'নম্বর এয়ারকুলারটা চালিয়ে দিয়ে সুশীতল বললেন, "সামাজিক দায়িত্ব-ফায়িত্বর রেফারেন্স দিই বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আর্ট কালচারের মাধ্যমে টুপাইস আসেও। কলকাতাকে আপনারা যতই দরিদ্র বলুন, অকাজে পয়সা উড়োতে এ-শহরের লোকদের জুড়ি নেই। থিয়েটার, সিনেমা, নাচগান যতই টিকিট করুন সব বিক্রি হয়ে যায়—হুজুগে পয়সা উড়োবার জন্যে এখানকার লোকরা সারাক্ষণ উসখুস করছে, এই নির্জলা সত্যটা এতোদিনে আমি বুঝতে পারছি।"

এবার আমি বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বার্তা দিলাম। সুশীতলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "হ্যাঁ চিঠি পেয়েছি। আমি যে এতো

ইমপর্টান্ট হয়ে উঠেছি জানতাম না। আমি না গেলে মধ্যাহ্নভোজন বন্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার মনে হয়?"

"সেইরকমই তো শুনলাম, মিস্টার চট্টরাজ। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ওপরে আপনার প্রভাব যে প্রচণ্ড তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।"

মিটমিট করে হাসলেন সুশীতল চট্টরাজ। "দু'একটা ছোটখাট সার্ভিস দিই। বিশ্বনাথবাবুর লাল ফিয়াট সেদিন সকালে স্টার্ট নিচ্ছিল না আমিই নতুন অ্যামবাসাডরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কলেজে পৌঁছে দিলাম।"

আমি দেখলাম পকেট থেকে বহুমূল্যবান বিদেশি পারফিউম বের করে হাতের চেটোতে একটু ঠেকিয়ে নিলেন সুশীতল চট্টরাজ। বিখ্যাত এক বম্বে ফিল্মস্টারের নাম করে বললেন, হাই সোসাইটিতে এখন এইটাই ফ্যাশন। পুরুষমানুষের শরীর দিয়ে নাকি কত মিনিট অন্তর অপ্রীতিকর গন্ধ বেরুচ্ছে, ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা তা কমপিউটর যন্ত্রে মেপে দেখেছেন এবং বহু বিখ্যাত মহিলা তারকার সঙ্গে পরামর্শ করে এই বহুমূল্য পারফিউম অতি সামান্য কয়েকজন পুরুষের ব্যবহারের জন্য বের করেছেন। বম্বের তিনজন বিখ্যাত স্টার ছাড়া একমাত্র সুশীতল চট্টরাজই ইন্ডিয়ার চতুর্থ ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি এই পারফিউম সরাসরি প্যারিস থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

"কাস্টমসে ধরে না?" আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করি।

"বাঙালি গৃহবধূদের জন্যে গল্প লিখে-লিখে আপনার ব্রেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে!" মধুর অভিযোগ করলেন সুশীতল

চট্টরাজ। "সেদিন আপনাকে বললাম কী? মানি ব্যাগই হচ্ছে শক্তির উৎস। ক্যালকাটা, বম্বে, দিল্লীতে কত লোক রয়েছেন যাঁরা ইমপোর্টেড গাড়িতে ঘুরে বেড়ান, ইমপোর্টেড জামাকাপড় ছাড়া পরেন না, ইমপোর্টেড ক্রকারিতে তাঁরা খাওয়া দাওয়া করেন, ইমপোর্টেড বিছানায় আধশোয়া হয়ে ইমপোর্টেড সিগারেট এবং ইমপোর্টেড ড্রিংকস-সহ ইমপোর্টেড টি ভি ও টেপ প্রোগ্রাম দেখেন। লোডশেডিং হলে তাঁদের ইমপোর্টেড জেনারেটর চালু হয়ে যায়। হিন্দুস্থানী দিলটুকু ছাড়া আর সব কিছুই তাঁদের ইমপোর্টেড। কাস্টমসের লোকরা এসব জানে না ভাবছেন?"

এরপর আর কী বলার থাকতে পারে আমার? আমি আবার পুরনো কথায় ফিরে এলাম। "বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ডোমজুড় হাউসে আগামী রবিবার আপনার তাহলে পদধূলি পড়ছে?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "ঐদিন সকালে রবীন্দ্রসদনে আমি খুব ব্যস্ত। সি-এম, এফ-এম, এইচ-এম এবং আই-এম চারজনে একসঙ্গে অ্যাপিয়ারেন্স দিচ্ছেন, রেয়ার অকেশন।"

"সি-এম বুঝলাম চিফ মিনিস্টার। কিন্তু বাকিগুলো?"

"শুধু গল্প লিখলে হবে না, চলতি ল্যাংগুয়েজটা ইমপ্রুভ করুন," সুশীতল চট্টরাজ মৃদু বকুনি লাগালেন। "সি-এম-এর সঙ্গে থাকবেন যথাক্রমে ফিনান্স মিনিস্টার, হেলথ মিনিস্টার, এবং ইনফরমেশন মিনিস্টার। একেই বলে চতুর্বজ্র সম্মেলন। সুশীতল চট্টরাজ নিবেদিত অনুষ্ঠান ছাড়া কোথাও এরকম সম্মেলন দেখতে পাবেন না। এর পরেই আমি চলে যাবো ডোমজুড় হাউসে।

আফটার অল পুরনো ল্যান্ডলর্ড—এখানে যত খারাপ অবস্থাই হোক, ওঁদের সম্মানটা রাখা উচিত আমার।"

সুশীতল বললেন, "আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন লাইন ঠিক হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি নিজেই ফোন করে দেবো ডোমজুড় হাউসে। টেলিফোন ঠিক হওয়ার জন্যে দু'দিন ক্যালকাটা টেলিফোনসের জি-এম-এর ওপর নির্ভর করেছিলাম, কোনো ফল হয়নি। এক ঘণ্টা আগে স্রেফ মানিব্যাগের ওপর নির্ভর করেছি, হাতে-হাতে ফল পেয়ে যাব আধ ঘণ্টার মধ্যে!"

"সুশীতলবাবু, আপনি তো ডোমজুড় হাউসের খুব কাছের লোক। হঠাৎ এই নেমন্তন্ন কেন? কোনো স্পেশাল অকেশন-টকেশন আছে নাকি?" আমি এই সুযোগে ভিতরের খবরটা জানবার চেষ্টা করি।

"আপনি ভাবছেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর বিবাহবার্ষিকী? সে গুড়ে বালি! ওঁদের বিয়ের দিনেই কে যেন মারা গিয়েছিলেন, তাই নো বিবাহবার্ষিকী ওই বাড়িতে!" কিন্তু সুশীতল চট্টরাজ স্বীকার করলেন, "খোদ ডোমজুড় হাউসে মধ্যাহ্ন ভোজনপর্বটা রীতিমতো স্পেশাল ব্যাপার, কারণ বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী প্রতিবারই ক্লাবে সুশীতলকে খাইয়েছেন, এই প্রথম বাড়িতে নিমন্ত্রণের সৌভাগ্য।"

"সেকালের জমিদার বাড়িতে প্রাইভেট অতিথি আপ্যায়ন, নিশ্চয় এলাহি ব্যাপার কিছু হবে," আমার মনের আশাটা সুশীতলের কাছে চেপে রাখলাম না।

সুশীতল ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি স্পেশাল

আপ্যায়ন আশা করছেন?”

আমি বললাম, “মস্ত এক সাহেবের প্রাইভেট পার্টিতে গিয়েছিলাম একবার। শুনলাম, ওই ভোজের জন্য স্পেশাল চিংড়ি এসেছে কোচিন থেকে, তিতির পাখি এসেছে জয়পুর থেকে, আম এসেছে বোম্বাই থেকে এবং কুলফি এসেছে খোদ রাজধানী দিল্লী থেকে। কলকাতার আইটেম বলতে কেবল চিকেন এবং দহি!”

সুশীতল বললেন, “ভাল একটা পার্টি দিতে গেলে একটু আধটু মাথা খাটাতে তো হবেই। আজকাল বাঙালি বাড়িতে তো নেমন্তন্ন খাবার উপায় নেই। দু'খানা কেটারিং কোম্পানির একঘেয়ে মেনু জাতটার জিভ প্যারালিসিস করে দিলো। আমি তো, ফর এ চেঞ্জ, নিরামিষ খাবার জন্যে ল্যাংড়া মহারাজ এবং ইংলিশ ডিশের জন্যে স্কাইরুমের ওপর নির্ভর করছি।”

সুশীতলের প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করলাম, খুব নামকরা বনেদী পরিবারে মধ্যাহ্ন ভোজের অভিজ্ঞতা নেই আমার। একবার কেবল এক পাকাদেখার নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম, পাত্রীর বয়স একুশ এবং পাত্রীর গার্জেন গুনে গুনে একুশ রকমের ডিশ পরিবেশন করলেন আমাদের। এইটাই আমার লাইফে আপ্যায়নের এভারেস্ট! মেয়ের বয়স আঠাশ হলে আমাদের কী অবস্থা হতো তা এখনও মাঝে-মাঝে হিসেব করি।

সুশীতল জিজ্ঞেস করলেন, “খেয়েছিলেন কী ভাবে?”

“কার্পেটের আসনে বসে কাচের প্লেটে।”

করুণায় ঠোঁট উল্টোলেন সুশীতল চট্টরাজ। “এই জন্যে হাই-সোসাইটি সম্পর্কে আপনার লেখা অতো জোলো হয়! জয়নগরের

কুমার রাজার বাড়িতে আমরা তিনবার খেয়েছি—প্রতিবারই আলাদা বাসনপত্তর। প্রথমবার শ্বেতপাথর, দ্বিতীয়বার পিংক পাথর, তৃতীয়বার জয়পুর ব্লু। আমরা খেতে বসেছিলাম দশজন। নুনের পাত্র থেকে জলের গেলাস পর্যন্ত সব একই ধরনের পাথর। শুধু জয়নগরের কুমাররাজা একখানা খাগড়াই কাঁসার বাসনে খেলেন, ওঁর ঠাকুমার কী এক নির্দেশ আছে। কোথাও নেমন্তন্ন করলেও, ওই খাগড়াই বাসন আগাম পাঠিয়ে দিতে হয় কুমার রাজাকেও!"

সুশীতল চট্টরাজের ওখান থেকে ফেরবার আধঘণ্টা পরেই বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ফোন এসেছিল। সুশীতল অন্য এনগেজমেন্ট সত্ত্বেও ডোমজুড় হাউসে আসছেন জেনে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী আশ্বস্ত হলেন। বললেন, "রবিবারেও একটু খাটতে হবে, ব্রাদার। সুশীতলকে সঙ্গে নিয়ে আসবার দায়িত্ব তোমার। তুমি দেখো বিশেষ ফাংশনটা যেন মাঠে মারা না যায়।"

সুযোগ বুঝে বললাম, "অনুষ্ঠানের কারণটা যদি একটু বলেন, মিস্টার রায়চৌধুরী।"

"কেন? সুশীতল কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি?" জানতে চাইছেন বিশ্বনাথ।

"না. কৌতূহলটা আমার দিক থেকে। কোনো একটা শুভকারণ হলে সামান্য কিছু উপহার-টুপহার নিয়ে যাওয়া দরকার।"

হাহা করে হেসে উঠলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "খিদেটা ছাড়া সঙ্গে অন্য কিছু আনতে হবে না. ব্রাদার! তবে অবশ্যই এসো। অনেক অভিজ্ঞতা তোমার, কিন্তু এরকম লাঞ্চের পার্টি যে তুমি

অ্যাটেন্ড করোনি তা প্রায় জোর করেই বলতে পারি।"

কথাটা আমার মনে লেগে গেলো। রবিবার দুপুরে সুশীতল চট্টরাজকে নিয়ে ডোমজুড় হাউসে যেতে-যেতে ব্যাপারটা ওঁকে বললাম।

ঠোঁট বেঁকালেন সুশীতল চট্টরাজ। 'টপ কিছু করবার মতো মুরোদ তো এইসব জমিদারী হাউসের আর নেই। হয়তো কিছু রুপোর বাসন আছে, সেগুলো বিক্রি করে দেবার আগে একবার দেখাবে আমাদের। কিন্তু তাতে কী এসে যাবে? সেদিন মিস্টার দয়ারাম সিংহানিয়ার বাড়িতে এই অধমের নেমন্তন্ন ছিল। ওঁদের হল্যান্ড রিপ্রেজেনটেটিভ সেদিন সকালের ফ্লাইটে সাত রকমের চিজ নিয়ে এলেন কলকাতায়। নিউ ভ্যারাইটির ব্যাঙের ছাতা এলো ফ্রান্স থেকে, আর কী একটা স্পেশাল ইঁচড় এলো চায়না থেকে ভায়া কানাডা! ভেজিটারিয়ান ফ্যামিলি— এখনও নিউজিল্যান্ডের মাখন ছাড়া ব্যবহার করেন না। ভীষণ স্বদেশি মাইন্ডেড মানুষ এই মিস্টার সিংহানিয়া—সায়েবদের সমস্ত ব্যবসা থেকে তাড়িয়ে তবে এঁরা ছাড়বেন।"

আমি বললাম, "বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর ওপরেও আপনার প্রভাব পড়েছে। বলেছেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর 'বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত' বিশেষ অনুষ্ঠান। এই নিবেদন কথাটা আমাদের ছোটবেলায় শোনা যেতো না। যাঁর ফাংশন এবং যে হল-এ অনুষ্ঠান এই দুটোই প্রচারিত হতো।"

সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "যাঁর টাকায় আর্টিস্টদের এতো লপচপানি তাঁর নাম থাকবে না তা কেমন করে হয়? এখন বরং

কে অভিনয় করবেন বা গান গাইবেন তার থেকে অনেক ইম্পর্টান্ট কে নিবেদন করছেন। তা বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী কী আর নিবেদন করতে পারেন? হয়তো কোনো আনকোরা শখের ম্যাজিসিয়ানকে প্রেজেন্ট করবেন। আগেকার দিন হলে বা কথা ছিল! নতুন কোনো বাঈজীকে উপস্থিত করা হলো। কিন্তু সেওতো সন্ধ্যাবেলা—সূর্য না ডুবলে তো বাঈজীদের সঙ্গ পাওয়া যেতো না।"

বিশ্বনাথ চৌধুরীর বাড়িতে ড্রিংকস-এর ব্যবস্থা থাকবে না তা বুঝেই সুশীতল চট্টরাজ বেরুবার আগে ঝটপট স্পেশাল 'আহ্নিক' সেরে নিয়েছেন। আহ্নিক ঝটপট হলেই হুইস্কি মাথায় চড়ে বসে! সুশীতল তাই একটু-আধটু বেফাঁস কথা বলছেন।

ওঁর টাকার গর্ব নতুন হাঁড়িতে রাখা কেউটে সাপের মতোই ফোঁস-ফোঁস করছে।

গাড়িতেই সুশীতল মনে করিয়ে দিলেন, "ইন্ডিয়াতে টাকাই ভগবান। এদিক ওদিক চাঁদি ছুড়তে পারলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে বাজারের বেশ্যা পর্যন্ত সবই আপনার বশংবদ হয়ে থাকবে!"

সুশীতল চট্টরাজের এইরকম লেকচার শুনতে-শুনতেই আমি ডোমজুড় হাউসে পৌঁছে গেলাম। অন্য কয়েকজন অতিথি ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের দু'জনকে দেখে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

"না এলে খুব অসুবিধে হতো—শিবহীন যজ্ঞ হয় না," বিশ্বনাথের এই প্রারম্ভিক মন্তব্য শুনে খুব খুশি হলেন সুশীতল

চট্টরাজ।

ফিস ফিস করে সুশীতল আমাকে বললেন, "মনে হচ্ছে আমিই গেস্ট অফ অনার! এত খাতির করছেন কেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো শিগগির কোনো ধারটার চাইবেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।"

"চাইলেই দিতে হবে এমন কোনো মানে নেই," আমি আশ্বাস দিই একটু রঙিন-হয়ে থাকা সুশীতল চট্টরাজকে।

সুশীতল আজ একেবারে জামাইসাজে এসেছেন। চুনোট করা দিশি ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম লাগানো, হাতেও মহামূল্যবান দু-একখানা আঙটি। আর সেই স্পেশাল ফরাসি পারফিউমের গন্ধ যা কয়েক মিনিট অন্তর তিনি বাঁ হাতের চেটোতে ঘষে যাচ্ছেন।

সুশীতল বললেন, "নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালিদের জন্যে গল্প লিখে লিখে আপনার ঘটের বুদ্ধি কমে যাচ্ছে! জেনে রাখবেন, আমরা যে লেভেলে উঠে গিয়েছি সেখানে কেউ মুখ ফুটে চাইলে কিছু দিতে হয়। আরও জানবেন, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ রেখে যেতে চাই আমি—বাংলায় যাকে বলতে পারেন কার্যকর সম্পর্ক। সুতরাং উনি বড়মুখ করে কিছু ধার চাইলে আমি না বলতে পারবো না।"

"হতে পারে," সুশীতলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি স্বীকার করি হাই সোসাইটির তেমন কোনো খবর আমি রাখি না।

সুশীতল ফিস ফিস করে বললেন, "বুঝতে পারছেন না? আমাকে প্লিজ করবার জন্যে আমার দু'একজন আত্মীয়কেও বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী এখানে ইনভাইট করেছেন। ঐ দেখুন, আমার

শালা অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ দু'জনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ঐ দেখুন আমার শ্যালিকা, বেঢপ মোটা হবার আগে আমার ওয়াইফও ঐ রকম তন্বী ও অ্যাট্রাকটিভ ছিল।"

আমি ভাবছি, বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী কেন সুশীতলের স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করেননি? চান্স পাওয়া মাত্র গোপনে জিজ্ঞেস করলাম ওঁকে। তিনি বললেন, "আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার বউদি কিছুতেই রাজি হলেন না। মেয়েদের মন বোঝা ভার।"

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর আরও দু'একজন বন্ধু নিমন্ত্রিত হয়েছেন এঁরা সকলেই দেখলাম সুশীতলকে চেনেন।

বিশ্বনাথবাবু আমাকে বললেন, "আজ সকালেও গিনি বউদিকে ফোন করেছিলাম। নিচের প্রেসারটা এখনও ১১০-এ রয়েছে, তাই আসতে বললাম না।"

"এলে তো ভালই হতো, একটু রিল্যাক্সসেশন হতো।" গিনিদির জন্যে আমার মন কেমন করছে।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "আমাদের যে ওই স্পেশাল ফাংশানটা রয়েছে খাওয়া দাওয়ার পর।"

রঙিন মেজাজে সুশীতল চট্টরাজ এবার আমাকে কাছে ডেকে পাঠালেন। "কোথায় উড়ে-উড়ে" বেড়াচ্ছেন, মশাই? শুনুন আমার কথা। মানি ব্যাগে টাকা এবং ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলে ইন্ডিয়াতে করা যায় না এমন কাজ নেই।"

"তাই বুঝি?" গৃহস্বামী বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বিশিষ্ট অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা সফ্‌ট ড্রিংকস্ এসে গিয়েছে। হাতে একটা

গেলাস তুলে নিয়ে সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "খরচাপাতি করলে এদেশে, মরামানুষ জ্যান্ত হয় এবং জ্যান্তমানুষ মরা হয়।"

আমাদের চুপচাপ দেখে সুশীতল একটু বিরক্ত হলেন।

"বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনুন তবে। মড়া লোকের সম্পত্তি সেদিন কিনে ফেললুম—অন্য একটা লোক জ্যান্ত মালিক সেজে বেমালুম রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে সই করে এলো। পিওন থেকে সায়েব পর্যন্ত সবাই জানে—কিন্তু চাঁদি গলিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"কী বুদ্ধি তোমার, সুশীতল। তোমার কোনো তুলনা নেই।" তারিফ করলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।

ইতিমধ্যে টেবিলে খাবার পরিবেশিত হয়েছে। মস্ত বড় দুটো তপসে মাছ সুশীতলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, "টেস্ট করে দেখো—তোমার জন্যে স্পেশালি আনিয়েছি উত্তরপাড়া থেকে। তুমি তো তপসে মাছের ভক্ত।"

এরপর এলো স্পেশাল চিংড়ি। বিশ্বনাথ বললেন, "এই চিংড়ি এসেছে ক্যানিং থেকে—আমার এক বন্ধু এক্সপোর্ট করে, সেই পাঠিয়েছে স্পেশাল রিকোয়েস্টে। সুশীতল তুমি তো ক্লাবে চিংড়ি মাছ ছাড়া অর্ডার দাও না!"

ফিক করে হেসে সুশীতল আর-একখানা চিংড়ি তুলে নিলেন। বললেন, "দাদার নজরই অন্যরকম—এর নাম টাইগার প্রন। বিলিতি কোম্পানিগুলো মাঝে-মাঝে বড়-বড় কর্তা ব্যক্তির বাড়িতে এক আধটা প্যাকেট পাঠায়।"

খাওয়া দাওয়া বেশ জমে উঠেছে। এবার এলো ইলিশ। বিশ্বনাথ

বললেন, "বড় পেটি দু'খানা সুশীতলের প্লেটেই দাও।"

সুশীতল বললেন, "করেছেন কী দাদা?"

বিশ্বনাথ নরম স্বরে জানালেন, "এই ইলিশ বরফ কাকে বলে জানে না! শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপার আমার অনেকদিনের বন্ধু—ওখানে গাড়ি পাঠিয়ে, জেলেদের স্পেশাল রিকোয়েস্ট করে দু'খানি মাত্র ইলিশ পাওয়া গিয়েছে। নান্টু বলছিল, যখন থলেতে পুরছে তখনও ইলিশ জোড়া নড়ছে।"

"বোধহয় কর্তা গিন্নি ছিল—বলডান্স প্র্যাকটিশ করছিল।" রসিকতা করলেন সুশীতল চট্টরাজ।

এরপর পারসে মাছ। বড় দু'খানা পারসে মাছ সুশীতলের প্লেটে দিতে দিতে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী বললেন, "ভেড়ি কিং বিজয় ঘোষের নাম শুনেছো তো? আমাদের ক্লাবের পুরনো মেম্বার। ওঁকেই বলেছিলাম অন্তত সাড়ে সাত ইঞ্চি সাইজের পাঁচ ডজন পারসে পাঠিয়ে দিতে বাই ট্যাক্সি। রাত সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে ভোর সাড়ে চারটেয় এখানে ডেলিভারি দিয়ে গিয়েছে।"

"কী রকম লাগছে, সুশীতল? বিজয় ঘোষকে টেলিফোন করে তোমার মতামতটা জানাতে হবে।"

সুশীতল বললেন, "বড্ড ডেলিকেট মাছ এই পারসে। ভেড়িতে আর এক ঘণ্টা পড়ে থাকলে এর টেস্ট পালটে যেতো। ওবেরয়তে সেবার পারসে ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল—কিন্তু হার মানছি দাদা, সে টেস্ট আর এ টেস্ট আকাশ পাতাল তফাত।"

আমার এবার একটু অস্বস্তি শুরু হয়েছে। সুশীতল ছাড়াও আমরা কয়েকজন অতিথি রয়েছি—কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন।

মিসেস রায়চৌধুরী তাঁদের অ্যাপায়ন করছেন বটে, কিন্তু গৃহস্বামীর সমস্ত নজরটা একজনের ওপরেই।

পারসে মাছের পর এলো রুই মাছ। বিশ্বনাথ বললেন, "সুশীতল, এ মাছের টেস্ট তোমার অজানা থাকবার কথা নয়।"

মাছ খেয়ে সুশীতল বললেন, "চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অথচ ধরতে পারছি না।"

"হাই লেভেলে উঠে গেলে অনেক সময় এইরকম হয়, সুশীতল। এই মাছ ডোমজুড়ের রায়চৌধুরীদের খিড়কি পুকুরের। প্রতিবছর এই পুকুরে একসময় একশ ঘড়া গোলাপ জল ঢালা হতো নিশ্চয় মনে আছে তোমার?"

"আহা! কী টেস্ট!" সুশীতলকে স্বীকার করতেই হলো। "এই পুকুরের মাছই পঞ্চাশ যাট বছর আগে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে খাওয়ানো হয়েছিল না?"

"উঃ সুশীতল। প্রিন্স টিন্স সবাইকে তুমি এবার টেক্কা দিতে পারবে। কাটবার পরে একশবার গোলাপ জলে ধোয়া হয়েছে এই মাছ—না-হলে এর স্পেশাল টেস্ট পাওয়া যায় না।"

এরপর চিকেন। এবারেও স্পেশাল হিসট্রি। রাঁচির কাছে নবাব এমদাদ খাঁয়ের নাতি এই চিকেন প্রতিপালন করেন।

"এই চিকেনের বৈশিষ্ট্য হলো, এঁরা পিওর গোবিন্দভোগ চাল খেয়ে বড় হন, সেই সঙ্গে পুকুরের মাছ। এই গোবিন্দভোগ যায় তোমার বউদির বাপের বাড়ি বর্ধমান থেকে। রাঁচি থেকে বাইপ্লেনে পাঁচটি মুরগি আজ সকালে পৌঁছেছেন। ট্রেনে বা ট্রাকে আনলে এঁদের টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়।"

তারপরেও কত আইটেম। এবং প্রত্যেকটির এক একটি হিসট্রি। মিষ্টিরও অঢেল সাপ্লাই। কোনোটা এসেছে উত্তর কলকাতা থেকে, কোনোটা বড়বাজার, কোনোটা কেষ্টনগর, কোনোটা জনাই থেকে। দইটা এসেছে হাতিবাগান পেরিয়ে 'অমৃত' থেকে। এদের প্রত্যেকটিরই ইতিহাস যা শোনা গেল তা আমি ডাইরিতে লিখে রেখেছি, এখানে সবিস্তারে বলতে গেলে ছোটখাট উপন্যাস হয়ে যাবে।

খাওয়া দাওয়া সেরে, ডিনার টেবিল ছেড়ে আমরা এবার নরম সোফায় এসে বসলাম। সুগন্ধী মশলা তুলে নিলেন রুপোর আধার থেকে সুশীতল চট্টরাজ।

সেই মশলা বেশ তারিফ করে চিবোচ্ছেন সুশীতল চট্টরাজ, সেই সঙ্গে তাঁর পা দুটোও নাচছে! আমি একটু ঝিমিয়ে পড়েছি। যথেষ্ট খেয়েছি, কিন্তু বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী যেন সমস্ত অতিথিকে সমান চোখে দেখলেন না। আতিথেয়তার আইনে এটা নিয়মবিরুদ্ধ। আমার বাবা বলতেন, খাবার আসনে সবাইকে সমানভাবে দেখবে, গৃহস্বামীর এটাই প্রাথমিক কর্তব্য।

স্পেশাল আপ্যায়ন পেয়ে স্পেশাল ভোজের পর ফুলে ফেঁপে উঠেছেন সুশীতল চট্টরাজ। নিচুগলায় আমাকে বললেন, "বিশ্বনাথ যদি কিছু লোন চায় এখন আমার পক্ষে না বলা শক্ত হবে। লোকটা আমার মন জয়ের জন্য খুবই আদর আপ্যায়ন করেছে।"

এবার সুশীতল তাঁর ফেভারিট বিষয়, মানিব্যাগ থেকে শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। বড় এলাচ ও ভাজা

মশলা চিবোতে-চিবোতে সুশীতল চট্টরাজ বললেন, "টাকার লোভে মরা মানুষ বেঁচে ওঠার কথা বলেছি। আবার টাকার জোরে জ্যান্ত মানুষও খাতায় কলমে মরে যায়! বিশ্বনাথদা, আপনি দুঃখ করবেন না, আমার ডেথ সার্টিফিকেট পকেটে করে আমিই ঘুরছি।"

"সে আবার কী ব্যাপার?" আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠি।

দাঁত বের করে হেসে উঠলেন সুশীতল চট্টরাজ। "সেবার গাড়ি চড়ে ওড়িশায় শিকার করতে গিয়ে বনের মধ্যে একটা লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে বসলাম। এমনই রোগা প্যাং-পেঙে লোকটা যে সামান্য ধাক্কা সামলাতে পারলো না, হাসপাতালে মারা গেলো। তারপর বুঝতেই পারছেন, পুলিশের হাঙ্গামা। অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট করে মামলা-টামলা বাধিয়ে বসলো। বুদ্ধি করে কেবল কলকাতায় ঠিকানা না-দিয়ে ডোমজুড়ের গ্রামের ঠিকানা দিয়েছিলাম।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।

"তারপর আর কি? খুব টেঁটি ম্যাজিসট্রেট—বড় একটা হাঙ্গামায় ফেলতো আর কি। কলকাতায় এসে মোটা টাকা খরচ করে বাঘা উকিল পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। বললাম, যত টাকা লাগে লাগুক, কিন্তু আমাকে যেন হুট করে ওই উৎকট আদালতে ছুটতে না হয়। উকিল বললো, ক্যাশ একটু বেশি লাগবে। আমি বললাম, তা লাগুক। জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে, ক্যাশ একটু বেশি না-ঢাললে চলবে কেন? তারপর আমার উকিল সরেজমিনে সব তদন্ত করে এলো। বললো, খুব ডিফিকাল্ট্ কেস, ওই ম্যাজিসট্রেট আমাকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়বে। তখন আমার উকিল মোক্ষম দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করলো।"

"দাওয়াইটা কী?" বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন।

"টাকা ফেললেই কিনতে পাওয়া যায়! ওই কোর্টে ডোমজুড়ের কাছাকাছি এক গ্রামের ডেথসার্টিফিকেট প্রোডিউস করা হলো, আসামী সুশীতল চট্টরাজ মারা গিয়েছে। বেমালুম মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে গতকাল। অবশ্য টেন থাউজেন্ড রুপি টোটাল লাগলো। আমার পকেটেই আমার ডেথ সার্টিফিকেট রয়েছে।"

খুব হাসছেন সুশীতল চট্টরাজ, আর ওঁর অন্তহীন ক্ষমতার কথা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

সুশীতল চট্টরাজ এবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। একটু পরেই আকাদমি না রাজভবনে ওঁর স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

"বিশেষ অনুষ্ঠান যে বাকি রয়েছে," মনে করিয়ে দিলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।

"সে আরেক দিন হবে, হাতে আমার সময় নেই তেমন," বললেন সুশীতল চট্টরাজ।

"বেশি সময় লাগবে না—এখনই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। নিবেদন করবে বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী।"

এবার মেয়েদের দিকে তাকালেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। বললেন, "আপনারা ইচ্ছে করলে পাশের ঘরে চলে যেতে পারেন। সবাই ওখানে একটু বিশ্রাম নিন।"

মেয়েরা অন্য ঘরে চলে যেতে সুশীতল ফিক করে হেসে উঠলেন। "মেন ওনলি অথবা অ্যাডাল্টস ওনলি অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে।" খুশ মেজাজে সুশীতল এখনও ঠ্যাং নাড়াচ্ছেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরীর এবার উঠে দাঁড়ালেন। "এবার বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী নিবেদিত স্পেশাল ফাংশন শুরু হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানই আসল, খাওয়া দাওয়াটা নিমিত্ত মাত্র। আপনাদের পাঁচজনকে না-পেলে এই ফাংশনের কোনো মূল্যই থাকতো না। তা হলে ফাংশন শুরু করা যাক? আপনারা অনুমতি দিন।"

সুশীতল চট্টরাজ খুশ মেজাজে স্পেশাল স্টাইলে পা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "সকলের হয়ে আমিই পারমিশন দিচ্ছি।"

এবার অবাক কাণ্ড। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী হঠাৎ তাঁর কোমরের মোটা চামড়ার বেলট্ খুলে ফেললেন। বিশ্বনাথের চোখদুটো এবার বাঘের মতো জ্বলে উঠলো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে সুশীতল চট্টরাজকে সোফা থেকে তুলে নিয়ে শূন্যে কয়েক পাক ঘুরিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলেন। তারপর আবার তুলে দাঁড় করিয়ে কানটা ধরে বিরাশি সিক্কার এক চড় লাগালেন।

কী হচ্ছে তা আমরা ঠিক মতো বোঝবার আগেই দ্বিতীয় চড় লাগালেন মত্ত হস্তীর মতো হিংস্র বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। বললেন, "এই পাজি ছুঁচোটাকে আপনারা চিনে রাখুন। লোকজন সাক্ষী রেখেই এই ছুঁচোটার কোমর ভেঙে দেবো বলে আপনাদের আজ ডেকে এনেছি।"

সুশীতল চট্টরাজের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার তখন অন্দরের নারীমহলেও প্রবেশ করেছে। মহিলারাও অজানা কোনো বিপদের আশঙ্কায় হুড়মুড় করে এখানে ছুটে এসেছেন। বিশ্বনাথ তখন কোমরের চামড়ার বেলট্ খুলে পটাপট পেটাচ্ছেন ওই সুশীতল চট্টরাজকে।

সুশীতল যেমনি মেঝে থেকে ওঠবার চেষ্টা করছেন অমনি আবার চামড়ার শপাং করে আওয়াজ হচ্ছে। "পাজী, ছুঁচো, তুমি ভেবেছো টাকার জোর এবং উকিলের বুদ্ধিতে সব কাজ সারা যায়।"

মহিলাদের দু'এক জন কাতর আর্তনাদ করে উঠেছেন। আমারও বুক ধুকপুক করছে। এমন অদ্ভুত ভোজসভায় আমি জীবনে উপস্থিত থাকিনি। আমি কাতরভাবে বললাম, "করেন কী? করেন কী বিশ্বনাথবাবু? লোকটা যে মরে যাবে।"

"হাড় ভেঙে, কোমর ভেঙে, মেরে ফেলবার জন্যেই তো এই স্পেশাল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।"

বিশ্বনাথ এবার মহিলাদের দিকে তাকালেন। "মালক্ষ্মীরা শুনুন এই ছুঁচোর কাজ। আমার শালার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া, একেবারে কচি মেয়ে, তার বাবা আমাদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। এই ছুঁচোটা আমাকে দাদা বলে, বাড়িতে যাতায়াত করে। একদিন আমার গাড়ি খারাপ থাকায় ওর গাড়িতে কাচ মেয়েটাকে কলেজে পাঠিয়েছিলাম। এই ছুঁচোটা তারপর ছোট্টমেয়েটাকে কী সব ভজিয়েছে, দু'দিন লুকিয়ে-লুকিয়ে কলেজের গেটে দেখা করেছে। ওকে আর্টিস্ট করে দেবে, না কী সব করবে, এই লোভ দেখিয়ে একদিন কলেজ থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে। ছুঁচোটার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আর এই মেয়েটার ষোলো। ছুঁচোটার বাড়িতে বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। ভেবেছিল, আমি জানতে পারবো না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াই ওর পিসির কাছে সব বলেছে। আগামীকাল আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছে এই ছুঁচো। ছুঁচো মেরেই আমি হাত গন্ধ

করবো আপনাদের সামনে। ওর বড্ড বেশি বুদ্ধি, বড্ড বেশি টাকা, বড্ড উকিলের ওপর ভরসা। তাই সাক্ষীসাবুদ ডেকে এনে আমি নিগ্রহ করছি—ডোমজুড়ের রায়চৌধুরীদের রক্তটা কীরকম তার একটু টেস্ট পেয়ে যাক ওই ছুঁচো।"

আমি দেখলাম, ভয়ে কয়েকজন মহিলা কাঁদছেন। কিন্তু সুশীতল চট্টরাজের শ্যালকের স্ত্রী মোটেই কাঁদছেন না। তিনি বলছেন, "দাদা, ওকে ভালোভাবে একটু শিক্ষা দিয়ে দিন। আমার ননদের জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে। মানি ব্যাগের লোভ দেখিয়ে কত নিরীহ মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে, কেউ কিছু বলতে পারে না।"

বিশ্বনাথ চৌধুরী বললেন, "মানুষের জন্যে মানুষের আইন, আর ছুঁচোদের জন্যে ছুঁচোদের আইন—এই নিয়ম না-করলে সংসার যে ছুঁচোয় বোঝাই হয়ে যাবে!" বিশ্বনাথ চৌধুরী আবার পিটতে শুরু করলেন সুশীতল চট্টরাজকে।

আর সুশীতল সত্যিই ছুঁচোর মতো কুঁই কুঁই করতে লাগলেন, "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। আর কখনও ওই কাজ করবো না।"

"ছুঁচো, তোর মানি ব্যাগ, তোর উকিল এখন কোথায়?" প্রচণ্ড বেগে আবার একটা থাপ্পড় মারলেন বিশ্বনাথ।

চোখের সামনে মানুষ খুন হতে চলেছে সম্পূর্ণ আদিম পন্থায়। এর ফলাফল কী হতে পারে ভেবে আমি শিউরে উঠলাম।

"বিশ্বনাথবাবু প্লিজ, মানুষটাকে মেরে ফেলবেন না," আমি কাতর আবেদন জানাই।

"ছুঁচো মেরে ফেলবেন না তো কী করবেন?" সুশীতলকে আবার থাপ্পড় মারলেন বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী। "ছুঁচো, তুমি গোপনে গোপনে যা করবার করো। আর বাপের ব্যাটারা সাক্ষীসাবুদ রেখে ছুঁচোকে মারে।"

কী আশ্চর্য। সুশীতলের শ্যালকের স্ত্রী তখনও বলছেন, "ওর কোমরটা চিরকালের মতো ভেঙে দিন। আমার ননদ আপনাদের কাছে চিরকালের জন্যে ঋণী হয়ে থাকবে।"

সুশীতলের কোমরটা সত্যিই বোধ হয় ভেঙে গিয়েছে। কারণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি। ছুঁচোর মতো হামাগুড়ি দিয়েই সুশীতল চট্টরাজ এবার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী চামড়ার বেলট্টা কোমরে জড়াতে-জড়াতে হুঙ্কার ছাড়লেন, "আবার আপনাদের বলছি, সবার জন্যে এক আইন হলে এই পৃথিবী চলবে না। মানুষের জন্যে মানুষের আইন এবং ছুঁচোর জন্যে ছুঁচোর আইন নেই বলেই ভারতবর্ষের এত দুর্গতি।"

সেদিন নতমস্তকে ডোমজুড় হাউস থেকে ফিরে এসেছি। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই আজব আপ্যায়নের কথা আমার মনে থাকবে।

আজব টিকিট

বিভিন্ন ব্যাধির মতো এ-সংসারে ব্যাচেলর দু'রকমের। যাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম এবং বিবাহের তর সইছে না, তারা 'অ্যাকিউট' এবং বহুদিন ব্যাচেলর অবস্থায় থেকে-থেকে যাঁদের সহ্য হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহবন্ধনে এখন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, তাঁরা 'ক্রনিক' ব্যাচেলর। এই কাহিনীর নায়ক ইন্দুমাধব শ্যাম দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়েন।

ইন্দুমাধব সরকারি অফিসে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত, অফিসার না-হলেও ননগেজেটেড পে-স্কেলের সর্বোচ্চ মাইনে ড্র করছেন এবং ভাগ্য ভাল থাকলে পঞ্চাশের সীমান্তরেখা অতিক্রম করার আগেই গেজেটেড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেকটর হবেন।

ইন্দুমাধব সংসারবন্ধনে ধরা না-পড়েও বেশ সংসারী। সব কিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত। বলাবাহুল্য ইন্দুমাধবের নিজস্ব বাটী এবং ব্যাংকের সর্বোত্তম সুদে কিছু স্থায়ী আমানত আছে।

ব্যাচেলর ইন্দুমাধবের নামটা তাঁরই এক বন্ধু গোপনে জীবনলাল চ্যাটার্জিকে দিয়েছিলেন।

জীবনলাল চ্যাটার্জির বিস্তারিত পরিচয় এখন জানতে চাইবেন না। বিশেষ ব্যবসায়িক কারণে, খরচখরচা বাদ দিয়ে মাসের শেষে

যাঁদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এমন কিছু সচ্ছল লোকের তালিকা ওঁর প্রয়োজন। এ-সংসারে এ ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া এখন বেশ শক্ত। মাথা চুলকে-চুলকে সাহিত্যিক নির্মোক রায় যখন কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর গৃহিণী মালিনী বললেন, "তোমার বন্ধু ইন্দুমাধব শ্যামের ঠিকানাটা দাও না!" ইন্দুমাধবকে তো ঠিক সংসারী লোক বলা চলে না—সংসারে থেকেও সে সন্ন্যাসী। কিন্তু জীবনলাল চ্যাটার্জি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এর পরে জীবন চ্যাটার্জির সঙ্গে যখন নির্মোক রায়ের দেখা হয়েছে তখন তিনি বলেছেন, "ইন্দুমাধব শ্যাম আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। এর প্রতিদান যদি না দিই তো আমার নাম জীবন চ্যাটুজ্যে নয়।" আমার সব ভাল কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারি না। সামান্য ব্যাপার, একজন ভদ্রলোক বিজনেসের জন্যে আর একজন ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছেন—বিজনেস করবেন কি না সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু ভদ্র নম্র ব্যবহার অবশ্যই আপনার কাছে প্রত্যাশা করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত ইন্দুমাধব শ্যাম জবরদস্ত কায়দায় জীবনলালকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছেন। জীবনলালের প্রস্তাবে তাঁর নাকি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—প্রয়োজনও নেই।

জীবনলাল তখন থেকেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন এবং তা লক্ষ্য করে সাহিত্যিক নির্মোক রায় ও তাঁর স্ত্রী মালিনী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এই ইন্দুমাধবকে আজ সকাল থেকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। ছুটির দিনে, মধ্যবিত্ত সংসারে সকালবেলায় অর্থনৈতিক কারণে

নানা খিটিমিটি লাগে, পারিবারিক দুশ্চিন্তা অবশ্যই দেখা দিতে পারে, কিন্তু সংসার অরণ্যের একমাত্র সিংহ ইন্দুমাধবের মুখে কেন চিন্তার ছায়া?

চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং বহুপ্রচারিত সংবাদপত্রের কল্যাণে এখন গল্প-উপন্যাসে কেউ নায়কের সবিস্তারিত পরিচয় পাঠের ধৈর্য রাখেন না। বর্ণনা শুরু হলেই পাতা বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর অভিযোগে আক্রান্ত হন লেখক।

তবু ইন্দুমাধবের সামান্য পরিচয় বিশেষ প্রয়োজন যাতে তার ভাবমূর্তিটি পাঠকের হৃদয়ে মোটামুটি স্পষ্ট থাকে। এক নজরে ইন্দুমাধব এইরকম :

বয়স : ৪৬ (অফিস রেকর্ডে ৪৩)

রঙ : বাদামী

উচ্চতা : ৫ ফুট পাঁচ

চোখের রঙ : কালো

ওজন : ৬৭ কেজি

নাসিকা : সামান্য চাপা

কাঁধ : বেশ ঢালু

চুল : পাতলা তবে যত্নের সঙ্গে চিরুনি ব্যবহার করলে টাক এখনও ঢাকা যায়।

চামড়া : ঈষৎ তৈলাক্তভাবাপন্ন

বিশেষ লক্ষণ : অল্প উত্তেজনায় নাকের ডগা সামান্য ঘামে

চশমা : মোটা ব্রাউন শেল ফ্রেম

শরীর : মজবুত—মাঝে মাঝে সর্দিতে ভোগেন

প্রিয় খাদ্য : পার্সে মাঝের ঝোল ও সরু চালের ভাত

পছন্দ : সিনেমা ও গানের আসর

ভীতি : নারী সান্নিধ্য

স্বভাব : শান্ত, গুছনো ও সাবধানী

নিতান্ত প্রিয়জন : অতীতে মাতাঠাকুরানী, বর্তমানে কেউ নয়।

কোনোরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চান না বলেই ইন্দুমাধব দারপরিগ্রহ করেননি। ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনিবার্য হলেও কোনো পুরুষের পক্ষে তা মঙ্গলকর নয়। ইন্দুমাধবের দৃঢ় ধারণা, এদেশে পুরুষেরা মধ্যরাতের বাসরসজ্জাতেই বারে বারে তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা হারায়।

এই ধরনের মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা সাধারণত বিশেষ মনোবলের অধিকারী হন এবং ইন্দুমাধব শ্যাম অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই দৃঢ়-চেতা ইন্দুমাধব বেশ চিন্তিত হয়ে রয়েছেন। ব্যাপারটা যতই ভাবছেন ততই তিনি দিশেহারা হয়ে পড়ছেন এবং কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

এ-অবস্থায় নির্ভরযোগ্য কারুর কাছে গোপন পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু প্রিয়বন্ধু লেখক নির্মোক রায়ের কাছে যাওয়া ঠিক কিনা ইন্দুমাধব বুঝতে পারছেন না। নির্মোক অবশ্যই সারা জীবন তাঁর বন্ধুকে সুপরামর্শ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু সমস্যা তাঁর স্ত্রী মালিনী। নির্মোক এই রমণীরত্নের কাছে কিছুই গোপন রাখেন না এবং এই বয়সে ইন্দুমাধব মধ্যবয়সিনী মহিলামহলের গবেষণা ও কৌতূহলের বিষয়বস্তু হতে একেবারেই প্রস্তুত নন।

আজকের সমস্যাটি এইরকম—প্রভাতের চা-পর্ব শেষ করে ইংরিজি পত্রিকার ষোলোটি পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করছিলেন ইন্দুমাধব, এমন সময় ভৃত্য মধুসূদন মণ্ডল খামটি টেবিলের উপর রাখলো। গতকালই খামটি ডাকবাক্সে পড়েছিল মধুসূদন তা উদ্ধার করতে ভুলে গিয়েছিল। সাধারণত চিঠিপত্র এলে ইন্দুমাধব খুশি হন, নিজের হাতে প্রতিটি চিঠির উত্তর লেখেন সযত্নে। কিন্তু আজ মেজাজ অন্যরকম। টাইপ করা খামে ইন্দুমাধবের নাম ঠিকানা লেখা, ভিতরে কোনো চিঠি নেই—শুধু একটি ফাংশনের টিকিট।

অনুষ্ঠানটি ভাল জায়গায় হচ্ছে, শীতাতপ মণ্ডপে গীতানুষ্ঠান—বিনা পয়সায় এই টিকিট পেলে সকলেরই আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু ইন্দুমাধবের মুখমণ্ডল ক্রমশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগলো।

সৌজন্য টিকিটটি বারবার দেখতে লাগলেন ইন্দুমাধব। তারপর একবার টিকিটটি টুকরো টুকরো করে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কথাও ভাবলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজের হাতদুটিও বিদ্রোহ করলো, মনের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তারা টিকিট ক্ষতবিক্ষত করতে পারলো না।

আপনারা যারা সন্দেহ করছেন ইন্দুমাধব কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত তাঁরা অকারণে সুস্থ সতেজ ইন্দুমাধবের প্রতি অবিচার করছেন। ইন্দুমাধবের দেহে বর্তমানে কোনোরকম ব্যাধির উপস্থিতি নেই।

সামান্য একখানি ফাংশনের টিকিট—এর মধ্যে কী এমন বিপদের ইঙ্গিত থাকতে পারে? কিন্তু ভৃত্য মধুসূদন লক্ষ্য করলো,

বাবুর নাকের ডগায় শিশিরবিন্দুর মতো ঘাম জমতে শুরু করেছে।

ইন্দুমাধব আরও এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা শুরু করলেন। ব্যাপারটা এইরকম : সপ্তাহকয়েক আগে অফিসের ডাকে ইন্দুমাধব অকস্মাৎ একখানি টিকিট পেয়েছিলেন। ফাংশনটি খুবই আকর্ষণীয়, কাগজে যথেষ্ট বিজ্ঞাপনও হয়েছে, দেশের বাঘা বাঘা শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন। ইন্দুমাধব ভাবলেন, অফিস থেকে অনেক স্যুভেনিরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—তাদেরই কেউ দ্রুত বিল নিষ্পত্তির আশায় খোদ ইন্দুমাধবকে স্মরণে রেখেছেন।

ইন্দুমাধব সরল মনেই শহরের বিখ্যাত হলের ১৩এ সীটটি যথাসময়ে অধিকার করে বসেছিলেন।

সেদিন হলে তিল ধারণের জায়গা নেই, কিন্তু পাশের ১৩বি সীটটি তখনও খালি। সুতরাং ইন্দুমাধব তাঁর অফিস অ্যাটাচি কেসটি ওই খালি সীটে বসিয়ে রেখেছিলেন। গান শুরু হয়ে যাবার কিছু পরে ১৩বি সীটের অধিষ্ঠাত্রী হাজির হলেন। অন্ধকারে শাড়ির রঙ তখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আকারে ঈষৎ বিপুলা এই মহিলা প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভিতরে ঢুকলেন এবং একটু রুক্ষ স্বরেই ইন্দুমাধবকে ব্যাগ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। সামান্য ব্যাপার, মিষ্টি করে বললেই হতো, পৃথিবীতে কোন হলে নিজের ব্যাগ রাখবার জন্যে আর একটা খালি সীট পাওয়া যায়? কিন্তু এই মহিলার স্বরে ইন্দুমাধবের জন্য একটুও কোমলতা নেই।

স্বভাবত উগ্র মেজাজের ইন্দুমাধব একবার ভাবলেন বলেন, গান শুরু হয়ে যাবার পরে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ কেন? দেরি হলে, প্রথম

বিরতি পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করাই নিয়মসঙ্গত। কিন্তু সে-কথা এই জবরদস্ত মহিলাকে শুনিয়ে কোনো লাভ হবে না।

প্রেক্ষাগৃহের নিবিড় অন্ধকারে ইন্দুমাধবের চোখ তেমন কার্যকরী না-হলেও নাসিকার মাধ্যমে তিনি বিশেষ একটি মূল্যবান সেন্টের গন্ধ পেলেন। সুগন্ধের মাত্রা নারীসান্নিধ্যে-অনভিজ্ঞ ইন্দুমাধবের পক্ষে একটু অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো।

সেন্টের উৎস কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্য হাঙ্গামা বাধালেন—নিজস্ব দস্ত থলিকা থেকে পোটাটো চিপসের সুবৃহৎ প্যাকেট বার করে মুচমুচ শুরু করলেন। সুরেলা গানের সময় কোনোরকম বাড়তি আওয়াজ ইন্দুমাধবের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়। দু'একবার আড়চোখে পাশের দিকে তাকালেন ইন্দুমাধব এই আশায় যে পাশের মহিলা পরিস্থিতি বুঝে একটু সাবধান হবেন, নিজেকে সামলে নেবেন, কিন্তু ঘন অন্ধকারে ইন্দুমাধবের তীর্যকদৃষ্টি বোধহয় পাশের সীটের নজরে পড়লো না।

প্রথম বিরতি পর্যন্ত মুখ বুজে সব সহ্য করলেন ইন্দুমাধব—গানের আসরে চীনাবাদাম, পপকর্ন ও পোটাটো চিপসের নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে লিখবেন তিনি। আলো জ্বলবার পরে কিন্তু মুচমুচে আলুভাজার মড়মড় শব্দ বেড়ে গেলো। বিরক্ত ইন্দুমাধব এইসময় টয়লেটের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইন্দুমাধব অদৃশ্য হওয়া মাত্রই অকুস্থলে উপস্থিত হলেন ছোটখাট সাইজের জীবনলাল চ্যাটার্জি। ১৩বি সীটের এই মহিলা যে তাঁর অপরিচিতা নয় তা বোঝাচ্ছে। কুমারী সুহাসিনী

সেন—কেন্দ্রীয় অফিসে হেড অ্যাসিসটেন্টরূপে সগৌরবে সরকারী কার্য পরিচালনা করছেন। কাজের ব্যাপারে তাঁর নাম বাঘিনী সেন। বাঘিনী সেনের ব্যক্তিগত খবরাখবর এইরকম :

পিতার নাম : স্বর্গত সুধীর সেন

উচ্চতা : পাঁচ ফুট তিন

বয়স : ৪৩ (অফিসের খাতায় ৪৩$^{১}/_{২}$)

বর্ণ : উজ্জ্বল শ্যাম

চোখ : পদ্মলোচনা

দাঁত : উজ্জ্বল মুক্তোর মতো

চশমা : সোনার ফ্রেম

ওজন : বাষট্টি কিলো

চিনে নেবার চিহ্ন : বাঁ গালে একটি টিপসাইজের তিল।

বেশবাস : হাল্কা ফিকে নীল রঙের টাঙাইল শাড়ি।

অলঙ্কার : গলায় হায়দ্রাবাদী মুক্তোর মালা। হাতে ইউনিক গোল্ডেন কাঁকন—চোরডাকাত দুষ্ট লোকের ভয় ভীষণ।

স্বভাব : মিষ্ট—কিন্তু অপমানিত হলে দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না।

ভীতি : অপরিচিত পুরুষ

পছন্দ : গানের ফাংশন

নিতান্ত প্রিয়জন : এই মুহূর্তে কেউ নয়। মাঝে-মাঝে শুধু নির্মোক রায়ের স্ত্রী মালিনীর সঙ্গে গল্প করেন।

সুহাসিনী দেবী দেখলেন একটি লোক তার খুব কাছে এসে পড়েছে। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে—একবার যেন বান্ধবী

মালিনীর চিঠি নিয়ে কী একটা বীমাসংক্রান্ত ব্যবসায়িক প্রস্তাব এনেছিল।

সুহাসিনী দেবী লোকটিকে পত্রপাঠ বিদায় করেছিলেন—"ইনসিওরেন্স প্রপোজাল পাঠাবার লোক পেলেন না। তেতাল্লিশ বছরের সংসার না-করা মেয়ে—ওসব ছাইভস্ম নিয়ে আমি কী করবো? আমাদের তো ভবিষ্যৎ নেই। কে ওসব খাবে?"

লোকটা নাছোড়বান্দা, এখনও বোধহয় আশা ছাড়েনি—এখনও মাঝে-মাঝে চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছে। তার বক্তব্য, পৃথিবীতে এমন একটিও মানুষ নেই যে ভবিষ্যৎকে ডোন্টকেয়ার অর্থাৎ অবহেলা করতে পারে।

দু'জনে চোখাচোখি হতেই জীবনলাল গদগদ হয়ে সুহাসিনীর দিকে এগিয়ে এলেন। পরবর্তী সংলাপ এইরকম :

জীবনলাল : নমস্কার। আরে আপনি?

সুহাসিনী : আর বলবেন না। হঠাৎ অফিসে কে একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাঠালো। অমুক সেন আর তমুক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার ইচ্ছে হয় প্রায়ই—কিন্তু আগে এসে লাইন লাগিয়ে টিকিট কাটার হাঙ্গামা সহ্য করতে পারি না। তাই হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম, শুধু কে যে টিকিট পাঠালো এখনও বুঝলাম না।

জীবনলাল : ওটা তো সামান্য ব্যাপার—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে? আপনার অফিসের কত লোক কত প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে রয়েছে।

সুহাসিনী : আপনিও ফাংশনের ভক্ত?

জীবনলাল : ঠিক ভক্ত নয়—কিন্তু যে-লাইনে আছি তাতে এসব জায়গায় না-এসে উপায় নেই। ফিউচার খদ্দেরদের হাতের কাছে পাওয়া যায়।

সুহাসিনী (হাস্য) : আপনি এক একটা কথা যা বলেন!

জীবনলাল : গান কেমন শুনছেন? কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সুহাসিনী [ফোঁস করে উঠলেন] : অসুবিধে হবার তো কথা ছিল না। এমন সুন্দর হল, এমন চমৎকার সীট, এমন নামকরা আর্টিস্ট। কিন্তু কপাল দোষে বাঁ দিকের সীটের লোকটি—যেন আমার ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস এসেছেন। দুটো পোটাটো চিপস খাচ্ছিলাম—দুপুরে টিফিন হয়নি। লোকটা এমনভাবে তাকালো যেন ক্লাশ থেকে বার করে দেবে।

জীবনলাল [খালি সীটের নম্বরটি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন] : সে কি! এরকম তো হবার কথা নয়। পাবলিক হল—এখানে যার যা খুশি তাই করবে।

সুহাসিনী : রাগের আসল কারণটা ওঁর হাত ব্যাগ—ভেবেছিলেন ব্যাগটি আমার সীটে রেখে সিংগল টিকিটে ডবল সীট উপভোগ করবেন।

জীবনলাল [সভয়ে] : আপনার সঙ্গে কোনো বচসা হয়েছে নাকি?

সুহাসিনী : হয়নি এখনও—হলে উনিই আফসোস করবেন। আমরা পাঞ্জাবের প্রবাসী বাঙালি। আমরা ভাঙি তো মচকাই না। কোনো অচেনা পুরুষকে আমি তোয়াক্কা করি না।

জীবনলাল : এ তো বেশ মুশকিলে পড়া গেলো! আপনি কী সীট বদলাবেন আমার সঙ্গে?

সুহাসিনী : মোটেই না! তা হলে তো লোকটা আরও আস্কারা পেয়ে যাবে। আমি যাই—আরও কিছু পোটাটো চিপস কিনে আনি।

সুহাসিনী দেবী ঝকঝকে টাঙ্গাইল শাড়িটি সামলে নিয়ে হলের বাইরে চলে গেলেন। আর তার পরের মিনিটেই ইন্দুমাধব নিজের সীটে ফিরে এলেন।

প্রতিশোধের আগুন মনের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে, তবুও ইন্দুমাধবকে দেখে জীবনলাল ব্যবসায়িক কারণে এক গাল হেসে ফেললেন।

ইন্দুমাধব : জীবনবাবু, আপনারও গানবাজনার শখ? সারাদিন বিজনেসের পিছনে ঘুরেও রসকস থাকে আপনাদের?

জীবনলাল [জিভ কেটে] ফাংশানগুলো আমাদের লক্ষ্মী—কত লোক এখনও আমাদের কোম্পানির ইনসিওরেন্স স্কীমের সুযোগ পায়নি তা চোখের সামনে দেখতে পাই, ভরসা বেড়ে যায়।...যাক, আপনার কোনো অসুবিধে...

ইন্দুমাধব : সৌজন্য টিকিটে গান শুনতে এসেছি—কোনো হাঙ্গামার কথা নয়—কিন্তু ব্যাচেলরের পোড়া কপাল—পাশের জাঁদরেল মহিলাটির স্বামীর কথা ভাবছি আমি।

জীবনলাল : স্বামীর কথা ভাববার সুযোগ নেই। আমি ওঁকে একটু চিনি— মিস সুহাসিনী সেন। কনফার্মড হেড অ্যাসিসটেন্ট, গভরমেন্ট অফ ইন্ডিয়া...এবার বোধহয় সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন...

ইন্দুমাধব : সারাক্ষণ মুড়মুড়—যেন আমাকে খাটো করবার জন্যে...

জীবনলাল : একে রোজগেরে, তায় আইবুড়ো মহিলা— একটু গোঁ হয়...আপনি বরং...। জীবনলাল এবার সীট পাল্টাবার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না।

ইন্দুমাধব জানালেন এখন সরে গেলে মহিলা ভাববেন হেরে পালিয়েছে—হেরে যাওয়াটা আমাদের বাজে-শিবপুরের শ্যামদের অভিধানে নেই।

ফাংশনের শেষে ইন্দুমাধবের দেখা মেলেনি। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডের কাছে জীবনলাল ও সুহাসিনীর আবার দেখা হয়ে গিয়েছে! সুহাসিনীর মুখে তখন বিজয়িনীর দম্ভ—দেড় প্যাকেট পোটাটো চিপস চর্বণ করেছেন, কেউ বাধা দিতে পারেনি!

সুহাসিনী : এতো পোটাটো চিপস হোল লাইফে খাইনি! ভদ্রলোককে শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে এই যা। সেকেন্ড হাফে দু'একবার আড়চোখে তাকিয়ে ভদ্রলোক ভিতরে-ভিতরে ফুঁসতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তাই যখন কণিকার গান শুরু হলো তখন কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে পোটাটো চিপস চেবানো বন্ধ রাখলাম।

বিজয়িনী সুহাসিনী এবার হেসে ফেললেন : আজ বাড়ি গিয়ে ভদ্রলোক বউ ঝি-এর ওপর একচোট নেবেন। মেজাজখানা যা হয়ে থাকবে।

জীবনলাল : একটু ভুল হয়ে গেলো, সুহাসিনী দেবী। ওঁকে একটু চিনি আমি। উনি অফিস সুপার ইন্দুমাধব শ্যাম, চিরকুমার।

অরিজিন্যাল বাজে-শিবপুরের, এখন চেতলায় নিজস্ব বাটি নির্মাণ করেছেন। সব ভাল, খুব গুছনো লোক, কিন্তু নিজের জীবন সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই—ওই ইনকাম লেভেলে মাত্র দু'হাজার টাকার জীবন বীমা ভাবা যায় না! ভাল প্রপোজাল দিতে গিয়ে বিতাড়িত হলাম—ব্যাচেলরদের নাকি লাইফ রিস্ক নেই।

বাড়িতে এসে ইন্দুমাধব প্রেক্ষাগৃহের অপ্রিয় অভিজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। "এদেশে মেয়েরা কালে কালে কী হচ্ছে?"

নির্মোকের স্ত্রী মালিনী বলেছে, "এ আপনাদের কী অন্যায়! বাইরে বেরিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো এক প্যাকেট পোটাটো চিপস খাবে মেয়েরা তাতেও আপত্তি।"

"খাবার স্থান কাল পাত্র ভেদ আছে," বলতে গেলেন বিরক্ত ইন্দুমাধব।

সাহিত্যিক নির্মোক বললেন, "অন্য দেশ হলে প্রচণ্ড রাগের পর হয়তো ওই প্যাকেট থেকে তোমাকেও চিপস ভাগ করে খেতে দেখা যেতো। কিন্তু ইন্দুমাধব, তোমাকে তো ছোটবেলা থেকে জানি ব্যাপারটা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।"

ইন্দুমাধব কিন্তু নরম হলেন না, পরের দিনই সংবাদপত্রে চিঠি পাঠালেন ফাংশনে সিগারেটের সঙ্গে পোটাটো চিপসের বিক্রি নিষিদ্ধ করার সাজেশন দিয়ে।

চিঠিটা যথাসময়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো এবং দু'একদিনের মধ্যে একটি তপ্ত প্রতিবাদ পত্রও প্রকাশিত হলো।

পোটাটো চিপসকে সমর্থনের পর, পুরুষদের ব্যাগ নিয়ে বক্রোক্তি—ফাংশনে এখন পুরুষদের সঙ্গে প্রায়শই যা দেখা যায় তা হলো সুবিশাল ট্রাংক—অ্যাটাচি কেস নয়! ঝাড়া হাত পা হয়ে গানের আসরে এলে ক্ষতি কী? পত্রলেখিকা : সুহাসিনী সেন।

প্রসঙ্গের অবতারণা হলে নির্মোক রায় বললেন : সামান্য ব্যাপারে এতো উত্তেজিত হবার প্রয়োজন নেই। ট্রামে বাসে বা কোনো সদনে কারও পাশে পুনর্বার বসবার সম্ভাবনা ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন। সুতরাং একবার কার সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে তা নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাথা ঘামানোর মানে হয় না।

নির্মোক রায় ম্যাথামেটিকসের ছাত্র—যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। তাই কয়েক সপ্তাহ পরে ইন্দুমাধব যখন অফিস মেলে আবার একটি অনুষ্ঠানের টিকিট পেলেন তখন তিনি কোনোরকম চিন্তিত হলেন না।

এবারে অন্য সভাগার—বিষয় একটি বিখ্যাত নৃত্যনাট্য। এই নাটকটি বেশ কয়েকবার দেখেছেন ইন্দুমাধব, কিন্তু বিনামূল্যে আবার দেখবার লোভ দমন করতে পারলেন না।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান গৃহে নিজের আসনটি খুঁজে পেয়ে বসতে গিয়ে ইন্দুমাধবের মাথা ঘুরে গেলো। পাশের সীটেই কাকে দেখেছেন তিনি? সেই মহিলাটি না? যে-মহিলা সেদিন ওইভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেজাজটা নষ্ট করে দিল, ইন্দুমাধবের বক্রদৃষ্টিকে কোনোরকম তোয়াক্কা করলো না। এবার শাড়ির রঙ পাল্টেছে—আজ একখানা ময়ূরকণ্ঠী রঙের কটকী তাঁত পরেছে

এই মহিলা, কিন্তু সেন্টের গন্ধ যে একই তা বুঝতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এক মুহূর্ত সময় লাগলো না।

বিরক্ত ইন্দুমাধব আড়চোখে খোঁজ করতে লাগলেন, আজও মহিলার কোলে পোটাটো চিপসের কোনো প্যাকেট আছে কিনা। ও-পক্ষ থেকেও বোধহয় পর্যবেক্ষণ চলছিল, কারণ দুটি তীর্যক দৃষ্টি হঠাৎ মাঝপথে হেড-অন সংঘর্ষ বাধিয়ে বসলো!

স্বস্তির নিশ্বাস নিলেন ইন্দুমাধব—আজ পোটাটো চিপস বা চীনেবাদাম কিছুই নেই। তার বদলে দু' টাকা দামের একটি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান স্মরণিকা কটকী শাড়ির ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে।

কিন্তু ইন্দুমাধবের মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। কী করে ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন এই অঘটন ঘটলো? এর পিছনে কি কোনো রহস্য আছে? না, ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়? এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, বিভিন্ন রহস্যকাহিনী গোগ্রাসে গেলবার প্রাচীন অভ্যাস আছে ইন্দুমাধবের।

আর সুহাসিনী দেবীর অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়—কুসুমিকা কর নামক বজ্রাদপী এক মহিলা পুলিশ এস-আই-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা। কলকাতার দুষ্টু পুরুষ সমাজের নারী নিগ্রহের নানা সুপরিকল্পিত কাহিনী কুসুমিকার মাধ্যমে সুহাসিনীর সুপরিচিত।

এই মুহূর্তে সুহাসিনীর মনে একটি মাত্র প্রশ্ন : কেমনভাবে এই দুর্বিনীত পুরুষটি আজ আবার ঠিক পাশের সীটটি সংগ্রহ করলো? কুসুমিকা, তুমি এখন কোথায়? কুসুমিকা এখন কাছে থাকলে সুহাসিনী অবশ্যই একটু স্বস্তিবোধ করতেন।

হল-এ তিল ধারণের জায়গা নেই। এক হাজার লোক তো

হাতের গোড়ায় রয়েছে, সুতরাং ভয় কী? নারীর আর্তস্বরে সাড়া দিতে কলকাতার নাগরিকদের তুলনা নেই—এ কথা বহুবার বহু জায়গায় লক্ষ্য করেছেন কুসুমিকা। সুতরাং কিছুতেই ভয় পেয়ে নিজেকে আরও দুর্বল করবেন না সুহাসিনী।

ইন্দুমাধব শুধু অঙ্কের দিক থেকে একই নারীর পাশে, একই মাসের মধ্যে, আসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরন্তর বিবেচনা করে চলেছেন। না, 'ল অফ প্রোব্যাবিলিটি' ছাড়াও অন্যকোনো অঘটন হয়তো কাজ করছে। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান এমন কিছু কঠিন নয়—কারণ রহস্যের অন্যপ্রান্ত তো পাশের সীটেই অবস্থান করছেন।

ইন্দুমাধব ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে, জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু যদি না মনে করেন, এ-টিকিট আপনি কোথায় পেলেন?"

সামান্য প্রশ্নের উত্তরে এবার বিস্ফোরণের পালা। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে পুলিশ সাব-ইনসপেকটর কুসুমিকা অপরিচিত পুরুষ বিতাড়নের যে গোপন শিক্ষাটি দিয়েছেন তার প্রথম কথাই হলো : কোনোরকম পাত্তা দেবে না। প্রথম সুযোগেই রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করতে হবে।

সুহাসিনী প্রবল আক্রোশে গোলাবর্ষণ করলেন, "তাতে আপনার দরকার?" নড়েচড়ে বসতে গিয়ে তাঁর কোলের প্রোগ্রাম-পুস্তিকা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইন্দুমাধব এক মুহূর্ত অসহায়ভাবে বসে রইলেন। যা অপমান হবার তা তো হয়েছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা যেভাবে তাকাচ্ছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে বইটি পড়ে যাওয়ার জন্যে

ইন্দুমাধবকেই তিনি সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করছেন।

ইন্দুমাধব এবার ঝুঁকে পড়ে বইটি সীটের তলা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে অঘটন ঘটালেন। তাঁর চশমাটি ছিটকে পড়লো। ফ্রেমটা যে এতো লুজ হয়ে পড়েছে তা খেয়াল ছিল না।

সুহাসিনীর বইটি যদিও উঠে এলো, কিন্তু ইন্দুমাধবের চশমার খোঁজ নেই। ঠিক সেই সময় প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিভে গেল।

এমন বেখাপ্পা অবস্থায় ইন্দুমাধব কখনও পড়েননি। বিরক্তিতে সমস্ত দেহ জ্বলছিল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মধুর নারীকণ্ঠ শোনা গেল, "ভাববেন না। একটু অপেক্ষা করুন, চশমা পেয়ে যাবেন।"

বেচারা ইন্দুমাধব চশমা ছাড়া সম্পূর্ণ অসহায়। "আমি যে কিছুই দেখতে পাই না।" করুণভাবে স্বীকার করলেন তিনি।

ইন্দুমাধবের কাতরোক্তিতে তৎক্ষণাৎ ফল হলো। পট করে পাশের সীটের সঙ্গিনীর হাতে ছোট্ট একটি টর্চ জ্বলে উঠলো এবং অচিরেই সেই টর্চ ইন্দুমাধবের হাতে সরে এলো এবং স্বয়ং সুহাসিনী ঝুঁকে পড়ে অক্ষত অবস্থায় ইন্দুমাধবের চশমা উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন।

চশমা ফিরে পেয়েই খুশি ইন্দুমাধব। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর কোনো অপ্রিয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে চান না তিনি।

একটু পরেই পাশের সীটে আবার হাতব্যাগ খোলার শব্দ—সেলাফেন প্যাকেটে পোটাটো চিপস-এর সরব উপস্থিতি ইন্দুমাধবকে নিরাশায় ভরিয়ে তুললো। কিন্তু কাকে বিরক্তি

দেখাবেন ইন্দুমাধব?

বিরতির সময় দ্বিগুণ আওয়াজ করে সুহাসিনীর আলুভাজা সেবন চলেছে। ইন্দুমাধব মেজাজটা হাল্কা করবার জন্যে একবার হলের বাইরে ঘুরে এলেন।

কী আশ্চর্য! আজও আবার জীবনলাল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। "আপনি কি কোনো ফাংশন বাদ দেন না?" জিজ্ঞেস করলেন ইন্দুমাধব।

বিনয়ে বিগলিত জীবনলাল বললেন, "এক একজনের এক একটা বাতিক জন্মে যায়—বুঝতেই পারছেন।"

ইন্দুমাধবের সঙ্গে পুনর্বার অন্তরঙ্গ হবার এই সুযোগটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন জীবনলাল।

"লাইফের রিস্ক সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা, মিস্টার শ্যাম।" শান্ত ও দার্শনিকভাবে প্রশ্ন করলেন জীবনলাল।

ইন্দুমাধব ঝটিতি উত্তর দিলেন, "ফোগলার যেমন দাঁত তোলার ভয় নেই. বন্ধ্যার যেমন পুত্রশোকের দুশ্চিন্তা নেই, তেমনি ব্যাচেলারের লাইফ রিস্ক নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ভগবান প্রত্যেক অভাগাকে কিছু স্পেশাল সুবিধে দিয়েছেন, বুঝলেন মিস্টার চ্যাটার্জি।"

কোনোরকম তথ্যের মধ্যে গেলেন না ঝানু সেলসম্যান জীবনলাল। "কেমন দেখলেন?" শুধু কথার কথা জিজ্ঞেস করলেন ইন্দুমাধব।

"শুধুই দেখছি, গান কানে আসছে না—শুনছি কেবল পোটাটো চিপস চিবনোর শব্দ। সভাগারে ওই জিনিসটা নিষিদ্ধ

না-হলে এদেশের গানবাজনার উন্নতি হবে না!"

, একখানা সিগারেট শেষ করে ইন্দুমাধব যখন নিজের সীটে ফিরলেন তখন পোটাটো চিপসের প্যাকেট শেষ। পাশের সীটে প্রায় শ্মশানের নীরবতা! চশমাটি চোখ থেকে খুলে আলোর দিকে ধরে দেখতে লাগলেন ইন্দুমাধব।

বেচারার চশমাটা ফাটলো কি না কে জানে! একটু মায়া হচ্ছে সুহাসিনীর।

চশমা পরীক্ষায় ব্যস্ত ইন্দুমাধবের এবার বিস্মিত হবার পালা। নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। পাশের সীটের দুর্বিনীতা মহিলা বলছেন, "আপনি যেন কী জানতে চাইছিলেন তখন?"

অভিমানহত ইন্দুমাধব চুপ করেই রইলেন। সরল মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তার উত্তরে ঝাঁঝালো কথা শুনেছেন।

প্রশ্ন রিপিট করতে হলো না। সুহাসিনী বললেন, "টিকিট কিনিনি--- আপিসে ডাকে ফ্রি পেয়েছি।"

"এ্যাঁ। আমারও তো একই অবস্থা। আপিসের ঠিকানায় কমপ্লিমেন্টারি এসেছে।"

"কী আশ্চর্য! কোন আপিস?"

প্রশ্নের উত্তরে ইন্দুমাধব গড় গড় করে সব বলে গেলেন এবং তার পরিবর্তে পাশের সীট থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পেলেন।

"আপনার চশমার কিছু হয়নি তো?" সুহাসিনীর প্রশ্ন।

"হলেও কিছু এসে যায় না—পাল্টাবার সময় হয়েছে," ইন্দুমাধব তখনকার মতো পরিস্থিতি রক্ষা করলেন।

শোয়ের শেষে বাড়ি ফেরার পথে জীবনলালের মনে হলো ওঁদের দু'জনকে একই সঙ্গে বাস স্ট্যান্ডের কাছে মিনিবাসের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখলেন।

দু' সপ্তাহ যায়নি। আবার একটি বিখ্যাত হলের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ডাকে আসছে। ইন্দুমাধব এবার রীতিমত চিন্তিত।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা না-করে তিনি পারলেন না। "এ-রকম ভূতুড়ে ব্যাপারে কখনও পড়েছো? একই লোকের পাশে একবার নয় দু'বার তোমার সীট পড়ছে?"

নির্মোক রায় বাস্তববাদী গল্প লেখক। বললেন, "একটা পর্যন্ত চান্স মিটিং গল্পে বরদাস্ত করা যায়—কিন্তু তার থেকে বেশি সাক্ষাৎকার এখন হিন্দী সিনেমাতেও সাহস করছে না।"

"কিন্তু চান্স ছাড়া আর কী? পরপর দু'বার দুটো বিভিন্ন হলে দুটো আলাদা শোতে একই পার্টির পাশে আমার সীট পডলো। ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন চান্স! কিন্তু আবার একটা টিকিট এসেছে। আবার যদি...আমার ভয় হচ্ছে..."

"অযথা বাজে ভাবনাচিন্তা করছো," সাহস দিলেন নির্মোক রায়। "স্ট্যাটিসটিকস-এর ফর্মুলা অনুযায়ী ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন এমন হতে পারে না।"

হতে পারে না বটে, কিন্তু কেন জানি না মনোবল পাচ্ছেন না ইন্দুমাধব। ইন্দুমাধব এখন বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করবেন না। মনে সন্দেহ থাকলে টিকিটটা ছিঁড়ে ফেললেই পার্ট চুকে যায়। কিন্তু প্রাণ ধরে তাও পেরে উঠছেন না ব্যাচেলর ইন্দুমাধব। পরিবর্তে আর একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে যাচ্ছে।

সেই অনুযায়ী ইন্দুমাধব বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং রবীন্দ্রসদনের অ্যাডভান্স বুকিং কাউন্টার থেকে একখানা সিংগল টিকিট কেটে নিলেন। কমদামের এই টিকিটে সীট নাম্বার অন্য টিকিট থেকে বেশ দূরে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হলেন ইন্দুমাধব।

নির্ধারিত সন্ধ্যায় একটু দেরিতেই রবীন্দ্রসদনে এলেন ইন্দুমাধব শ্যাম। ডবল টিকিটে সিংগল প্রবেশ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে এই প্রথম—কিন্তু উপায় কী?

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন চান্স—কিন্তু ওইটুকু চান্স নেবেন না ইন্দুমাধব। পয়সা খরচ করা টিকিটে নতুন সীটে বসে ইন্দুমাধব ছটফট করছেন, ইচ্ছে একবার গিয়ে পঞ্চম রো-এর 'ডি' মার্কা সীটখানা দেখে আসেন—এবং লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন পাশের সীটে কে বসে আছেন।

অন্ধকার হবো-হবো। ইন্দুমাধব আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। পিছনের সীট থেকে বেরিয়ে গুটি-গুটি সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। পঞ্চম রো-তে এসে পড়েছেন ইন্দুমাধব—যা সন্দেহ করেছেন ঠিক তাই! দু'খানি সীট পাশাপাশি খালি পড়ে রয়েছে। সমস্ত সীটে লোক বোঝাই শুধু দু'খানা পাশাপাশি সীট খাঁ খাঁ করছে!

যা ভয় পেয়েছিলেন তা হলে তাই, আলাদা টিকিট কেটে তা হলে ভালই করেছেন ইন্দুমাধব। কিন্তু মনের মধ্যে তবু কীরকম একটু মুচড়ে উঠলো। ইন্দুমাধবের সীটখানা না হয় খালি থাকুক, কিন্তু পাশের সীটখানা খালি কেন?

কী হলো ওখানে? কী হতে পারে? ওই ভদ্রমহিলা কি ইচ্ছে

করেই একই ভয় পেয়ে আজ এলেন না? না দ্বিতীয় আসন খালি থাকাটা নেহাতই কাকতালীয়। রহস্যসন্ধানে অপারগ ইন্দুমাধব ধীরে ধীরে নিজের অন্য আসনের দিকে ফিরে চললেন।

একটু পরে জীবনলাল চ্যাটার্জিকেও পাঁচ নম্বর সারির কাছাকাছি দেখা গেলো। যেন কিছুই জানেন না এইভাবে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। পাশাপাশি দু'খানা সীট খালি দেখে তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এমন তো কথা ছিল না। একটু আগেই তো সুহাসিনী সেনকে বেশ সাজগোজ করেই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন তিনি।

জীবনলালের মুখ শুকনো দেখে হলের অন্য প্রান্তে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? ওরকম মুখ বেজার কেন? পকেট-টকেট মারা গেল নাকি?"

বিরক্ত জীবনলাল মিনতি করলেন, "এখন জ্বালিও না ভাই—রুজি রোজগারের ব্যাপার। খুবই চিন্তায় আছি।"

জীবনলাল পঞ্চম সারি থেকে বিদায় নেবার একটু পরেই সুহাসিনী দেবী পা টিপে টিপে সেখানে হাজির হলেন। পুলিশের লেডি এস আই কুসুমিকার পরামর্শমতো সুহাসিনী অন্য একটি টিকিট কেটে অন্যত্র বসেছেন। কিন্তু কৌতূহল নিবারণে অসমর্থ হয়ে একবার পঞ্চম সারিটি দেখতে এসেছেন। সুহাসিনীর সীট খালি থাকবেই, কিন্তু পাশের সীটটাও খাঁ খাঁ করছে দেখে হঠাৎ সুহাসিনীর বুকের ভিতরটা হা-হা করে উঠলো।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। ইন্দুমাধব আজ মন দিয়েই নজরুলগীতি শুনছেন। কোথাও কোনো বাধা নেই—কিন্তু অস্বস্তি

বাড়ছে ইন্দুমাধবের। মনে হচ্ছে পোটাটো চিপসের একটু আধটু ব্যাকগ্রাউন্ড আওয়াজ থাকলে খুব একটু কিছু অসুবিধে হতো না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, একটু পরে মানসকর্ণে ইন্দুমাধব শুনতে লাগলেন—কে যেন তাঁর ঠিক পাশে বসেই কুড়মুড় কুড়মুড় করে মুচমুচে আলুভাজা চিবোচ্ছে।

বিরক্তভাবে তাকাতে গিয়ে ইন্দুমাধব দেখলেন কাছাকাছি কোথাও আলুভাজা নেই—সব শ্রোতাই গানে বিভোর হয়ে রয়েছেন।

চোদ্দ নম্বর সারিতে বসে-থাকা সুহাসিনী সেন-এর বিব্রত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই আজ। দু'পাশেই দুই মধ্যবয়সিনী মহিলা—তাঁরা এক মনে গান শুনছেন। সুহাসিনী তখন মানসনেত্রে শুধু পাঁচ নম্বর সারির দু'খানা শূন্য আসন দেখতে পাচ্ছেন আর ভাবছেন, দ্বিতীয় আসনটিতে কে অনুপস্থিত আজ?

ঝোঁকের বশে ব্যাগের মধ্যে আজও এক প্যাকেট পোটাটো চিপস রেখেছিলেন সুহাসিনী—কেউ কোনো কাজে বাধা দিলে সুহাসিনীর মেজাজ ঠিক থাকে না, সেই কাজটা করবার জন্য গোঁ বেড়ে যায়। কিন্তু এখন মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠছে সুহাসিনীর—কী ভেবে পোটাটো চিপসের প্যাকেটটা টুক করে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপরও মাথাটা কেমন করছে, গানের একটা কলিও মাথায় ঢুকছে না।

এদিকে ইন্দুমাধবও শান্তিতে সীটে বসতে পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যেই পা টিপে টিপে হলের বাইরে বেরিয়ে এলেন। একটা সিগারেট ফুঁকলেন, ভেন্ডারকে দেখে হাঁক পাড়লেন।

তারপর হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একুশ নম্বর সারির কাছে উপস্থিত হলেন ইন্দুমাধব। কিন্তু ওঁর পা দুটো ওই সারিতে ঢুকতেই রাজি হলো না। ইন্দুমাধব পা টিপে-টিপে অন্ধকারের মধ্যে পাঁচ নম্বর সারির দিকে এগিয়ে গেলেন— নম্বরটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ফাইভ 'ডি'। পাশের সীটে কেউ আসুক না আসুক যে কোনো সময়ে ফাইভ ডি-তে বসবার অধিকার অবশ্যই তাঁর আছে।

অন্ধকারের মধ্যে সীটটি সবেমাত্র অধিকার করেছেন ইন্দুমাধব, হঠাৎ বুঝতে পারলেন পাশের সীটটি আর খালি নেই। অন্ধকারের মধ্যে কিছু আন্দাজ করার প্রয়োজন হলো না—চেনা সেন্টের গন্ধ নাসিকারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ইতিমধ্যেই ইন্দুমাধবের মস্তিষ্কে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে।

সুহাসিনী একটু আগেই কোন এক দুর্নিবার আকর্ষণে পাঁচ নম্বর সারিতেই উঠে এসেছেন। পোটাটো চিপসের প্যাকেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

সুহাসিনীর মনে হলো, পাশের ভদ্রলোকের হাতে কী যেন মাঝে মাঝে খড় খড় করে উঠছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এবার সুহাসিনীর অবাক হবার পালা। সুহাসিনী বুঝলেন, ভদ্রলোক আপনমনে একটা পোটাটো চিপসের প্যাকেটকে অত্যন্ত সাবধানে আদর করছেন।

ওদিকে স্টেজে তখন প্রেমময় গীতিনাট্য দারুণ জমে উঠেছে। সুহাসিনী জানেন, ইন্দুমাধববাবু কিছুতেই আজ প্রথম কথা বলবেন না। ফিস ফিস করে সুহাসিনী প্রশ্ন করলেন, "এতো দেরিতে?"

মুগ্ধ ইন্দুমাধব মিষ্টি করে খুব লজ্জার সঙ্গে বললেন, "এই একটু

দেরি হয়ে গেলো।" যেন দেরি করে এসে তিনি সত্যিই ভীষণ অপরাধ করেছেন।

উসখুস উসখুস করছেন ইন্দুমাধব শ্যাম। কিছু একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন। বোকার মতো তিনি একবার বলে বসলেন, "আপনার পোটাটো চিপস?"

বেশ রাগ হচ্ছে সুহাসিনীর? সত্যি কথাটা কিছুতেই তিনি প্রাণ খুলে বলতে পারবেন না। সুহাসিনী বললেন, "হাতেই ছিল, অন্ধকারে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলো।"

"পড়ে গেছে তো কী হয়েছে! এই নিন, আর একটা," এই বলে পোটাটো চিপসের নতুন প্যাকেটটা ইন্দুমাধব এগিয়ে দিলেন নির্বাক নিস্তব্ধ সুহাসিনী সেনের দিকে।

এর পরের ঘটনা অতি সামান্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দুমাধব শ্যাম ও সুহাসিনী সেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিজেদের তালিকাভুক্ত করেছেন। সব সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গিয়েছে, শুধু ওই কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের রহস্যটুকু ছাড়া।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের মতে ওটা নিতান্তই আকস্মিক—ভবিতব্যের ইচ্ছা! কিন্তু লেডি এস আই কুসুমিকা কর-এর সন্দেহ অন্য—তার ধারণা ইন্দুমাধব অবশ্যই সুহাসিনীকে অন্য কোথাও দেখেছিলেন এবং সব জেনেশুনেই এই যুগল কমপ্লিমেন্টারি সীটের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করেছিলেন।

এবিষয়ে নববিবাহিতা সহধর্মিণীর সন্দেহ যখন তুঙ্গে এবং স্বয়ং ইন্দুমাধব শ্যাম যখন নিজেই রহস্য উন্মোচনে অসমর্থ সেই সময় জীবন-বীমা প্রতিনিধি জীবনলাল চ্যাটার্জি বাড়িতে সশরীরে

আবির্ভূত হলেন।

জীবনলালকে দেখে ইন্দুমাধব একটু বিরক্ত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একগাল হেসে জীবনলাল বললেন, "'লাভের সঙ্গে সারাজীবন' এই তো আমাদের কোম্পানির পলিসি।"

"মানে?" বিরক্ত ইন্দুমাধব অনাহুত অতিথির দিকে তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন।

মাথা চুলকে জীবনলাল উত্তর দিলেন, "মানে আর কি—উইথ প্রফিট হোল লাইফ! পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে পলিসির কথা আপনার ভাবাই উচিত নয়।"

ইন্দুমাধব পত্রপাঠ জীবনলালকে বিতাড়নের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সীমন্তে মোটা সিঁদুর লাগিয়ে বসবার ঘরে সুহাসিনীর প্রবেশ। "আরে জীবনবাবু যে! সেই তো রবীন্দ্রসদনে দেখা হলো।"

কোনো কথা শুনলেন না সুহাসিনী শ্যাম। মিষ্টিমুখ না করিয়ে আজ ছাড়বেন না জীবনলালকে।

চেতলার বিখ্যাত চমচম এগিয়ে দিতে দিতে সুহাসিনী মৃদু হেসে বললেন, "আপনাকে আমার সাক্ষী হিসেবে দরকার হতে পারে। আমার বান্ধবী পুলিশের কুসুমিকা কর অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে। আমাদের সন্দেহ মিস্টার শ্যাম আগে কোথাও আমাকে দেখেছিলেন এবং তার পরেই হল-এ পাশাপাশি সীট..."

বেচারা ইন্দুমাধব দুর্বল প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কোনোরকম পাত্তা পেলেন না। জীবনলালকে সুহাসিনী শ্যাম বললেন, "কুসুমিকা হয়তো আপনার স্টেটমেন্টও নেবে।"

জীবনলাল এবার করজোড়ে রহস্য উন্মোচন করে বললেন, "মিস্টার শ্যামকে আপনি অযথা শাস্তি দেবেন না। মিস্টার শ্যাম যেদিন আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনই কাগজে পড়লাম— জাপানে বীমা কোম্পানির এজেন্টরা হেভি ইনসিওর করানোর প্রত্যাশায় গোপনে ঘটকালি করে। আমারও গোঁ চেপে গেল।...মিস্টার শ্যামের ক্ষেত্রে কোনো গোপন রহস্য নেই—পাশাপাশি সীট দেখে ফাংশনের টিকিটগুলো আমিই পাঠিয়েছি—উপায় ছিল না—বিজনেসের লোভে..."

মুখ লাল করে ইন্দুমাধব রেগেমেগে জীবনলালকে আবার বাড়ি থেকে বিদায় করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুহাসিনী শ্যাম হুঙ্কার ছাড়লেন, "ওঁর কোনো কথায় কান দেবেন না, জীবনবাবু—এ বাড়ি এখন ওঁর একার নয়। আপনি প্রপোজাল ফর্ম লিখে ফেলুন—ফিফটি থাউজেন্ড রুপিজ 'জীবনসাথী' উইথ প্রফিট হোল লাইফ।"
